নানা চোখে

ঋষি-বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র

সম্পাদনায়

দেবব্রত ভট্টাচার্য
অজয় চক্রবর্তী

পুথিপত্র
৯ এ্যাণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

সমাজ ও সভ্যতা স্বাভাবিক এবং সাধারণ গতিতে চলে; কিন্তু দেখা যায় যে, দীর্ঘকালের ব্যবধানে হঠাৎ এমন দু'একজন লোকের জন্ম হয় যাঁরা সাধারণের ব্যতিক্রম, যাঁরা প্রতিকূল বা অনুকূল পরিবেশের অপেক্ষা রাখেন না, যাঁরা লতাগুল্মের মধ্যে বনস্পতির মত উঁচু, যাঁরা নিজেদের পরিপ্রেক্ষিত নিজেরাই সৃষ্টি করেন, যাঁরা স্বয়ংসিদ্ধ। তেমনই এক বিরল প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তখন আমাদের দেশে পশ্চিমীধারায় বিজ্ঞানচর্চার কোনও পরিবেশ ছিল না। বিলাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে আসার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি স্বকীয় চেষ্টায় সামান্যমাত্র সুযোগের সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের উপর এমন উচ্চ-মানের গবেষণা করেন যা এখনও বিস্ময়কর। বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, তিনি গবেষণার এই ক্ষেত্রে মার্কনিরও পূর্বসূরী। তিনি নিজেই নিজের ধারার সৃষ্টিকর্তা, ধারক ও বাহক। পরবর্তী কালে উদ্ভিদ বিজ্ঞানে তাঁর অবিশ্রান্ত গবেষণা একটি উচ্চমানের কীর্তির দাবী রাখে। তাঁকে বায়োফিজিক্সে প্রথম ও প্রধান পুরুষ অনায়াসেই বলা চলে। বহু বাধা, বহু বিপত্তি এবং বহু ঈর্ষার অবরোধকে অতিক্রম করে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সহজ ছিল না, কিন্তু তবুও প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের জোরে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন, ভাবতেও আশ্চর্য লাগে!

বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানও অত্যন্ত উচ্চমানের। প্রবন্ধ লেখক হিসেবে তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সমগোত্রীয়। ভাবের গভীরতা এবং প্রকাশভঙ্গির উজ্জ্বলতায় প্রবন্ধকার হিসাবে তাঁর আসন চিরস্থায়ী হয়ে আছে। তিনি বাংলা তথা ভারতের গৌরব। এরকম অনন্য প্রতিভাধারীর সৃষ্টিকর্মের গভীর আলোচনা আমাদের মানসিক উন্নতির সহায়ক হবে। এই পুস্তকে বহু বাঙ্গালী গুণিজন ও বিদগ্ধ সাহিত্যিকরা সেই আলোচনা করে আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রতি তাঁদের এবং জাতির শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এই পুস্তকের একটি ছোট ভূমিকা লেখার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থ বোধ করছি। আচার্য জগদীশচন্দ্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দিরের বর্তমান ধারক হিসেবে আমি আমার সহকর্মীদের এবং আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে সকল লেখকদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শ্রীশশাঙ্কচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
অধ্যক্ষ, বসু বিজ্ঞান-মন্দির

আমাদের কথা

এ গ্রন্থের পরিকল্পনা করেছিলাম এক যুগ আগে। মনে পড়ছে, ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের এক গ্রীষ্মের দুপুরে রোদে-ভাজা হতে হতে জিপে করে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতন। উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ জানানো। দেখা করেছিলাম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীর, অধ্যাপক শ্রীসমীর ঘোষ এবং বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীভূদেব চৌধুরীর সঙ্গে। তাঁরা সবাই আমাদের উৎসাহিত করেছেন, সাগ্রহে লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমরা ফিরে এলাম কোলকাতা, আমাদের পেছন পেছন ডাকযোগে দু'টো প্রবন্ধ এসে হাজির হলো—একটি অধ্যাপক সতীশচন্দ্র খাস্তগীরের কাছ থেকে, অন্যটি অধ্যাপক সমীর ঘোষের কাছ থেকে। দু'টো লেখা হাতে আসায় আমরা আরও প্রবন্ধ সংগ্রহের জন্য পথে নামলাম। অনেকের কাছেই আমরা লেখা দেবার অনুরোধ নিয়ে গিয়েছিলাম, তাঁদের অনেকেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সবার কাছ থেকে শেষ অব্দি লেখা পাওয়া যায় নি। কয়েকটি বিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ নেবার জন্য আমরা গিয়েছিলাম জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি কথায় কথায় বলেছিলেন, চেষ্টা করে দেখো। তবে লেখা জোগাড় করা বড়ো শক্ত কাজ। **'Cultural Heritage of India'** বই-এর সম্পাদনা করতে গিয়ে এ ব্যাপারে আমার যে-অভিজ্ঞতা হয়েছে তা খুব উৎসাহজনক নয়। লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি যত সহজে মেলে লেখা তত সহজে মেলে না। লেখা সংগ্রহের কাজে নেমে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের কথার যাথার্থ্য আমরা উপলব্ধি করেছিলাম। একই দরজায় বহুবার করাঘাত করতে হয়েছে, শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে ফিরেছি। এমন ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে। ফলে মাঝে মাঝে উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। আর, এরকম নৈরাশ্যজনক সময়েই ১৯৭২-এর শেষ দিকে আমাদের একজনকে কিছুদিনের জন্য যেতে হলো দেশের বাইরে। কাজেই, বইটির ব্যাপারে সব কাজ স্থগিত রইলো। যে-ক'খানা প্রবন্ধ সংগৃহীত হয়েছিল সেগুলো রইলো ফাইলবন্দী হয়ে। দু'বছর পর আবার নতুন উদ্যমে প্রবন্ধ সংগ্রহে বেরোলাম। ইতিমধ্যে অবশ্য আর একটা সমস্যা দেখা দিল। যাঁরা লেখা দিয়েছিলেন তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই অধৈর্য হয়ে বার বার আমাদের কাছে জানতে চাইছিলেন, কবে বইটি প্রকাশিত হবে। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা নিজেরাও তখন তা জানতাম না। টেমার লেন-এর জনৈক প্রকাশক এ গ্রন্থ প্রকাশে আগ্রহী ছিলেন। তাঁরই প্রেরণায় এ বইটির পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের লেখা-সংগ্রহ

অভিযান শুরু হবার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর প্রকাশনা সংস্থায় তালা পড়লো। সে-তালা আজও খোলে নি। কাজেই, যাঁরা লেখা দিয়ে জানতে চাইছিলেন কবে বই বেরোবে, তাঁদের আমরা সুনির্দিষ্ট কোন কিছু বলতে পারি নি। সঙ্গত কারণেই তাঁদের অনেকে বিরক্ত হয়ে লেখা ফেরত চেয়েছিলেন। অনেককে আমরা লেখা ফেরতও পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। অবশ্য আমরা সেসব লেখার কপি রেখে দিয়েছিলাম। আশা ছিল, যদি কখনো বইটা বেরোয় তখন লেখাগুলো কাজে লাগবে।

আমাদের তাগিদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য অনিচ্ছায় চাঁদা দেবার মতোই অনেকে আমাদের লেখা দিয়ে ফেললেন। কিন্তু সে-সব লেখা পাবার পর আর এক সমস্যা দেখা দিল। লেখাগুলো পড়ে দেখলাম, নামী নামী লেখকদের মধ্যে অনেকে এমন লেখা দিয়েছেন যা ছাপালে সেগুলো তাঁদেরই 'স্থায়ী লজ্জা' হয়ে থাকবে। তাই কয়েকজন বিখ্যাত লেখকের লেখা পেয়েও আমরা তাঁদের লেখা শেষ অব্দি ছাপাখানায় পাঠাই নি।

যাঁরা এ বই-এর ব্যাপারে আমাদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ নেই। উৎসাহ পেয়েছিলাম শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীরের কাছ থেকে, বনফুলের কাছ থেকে, শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রীর কাছ থেকে। এঁরা আজ আমাদের মধ্যে নেই। এ ছাড়া, বর্তমান সংকলনের জন্য লেখা দিয়ে যাঁরা গত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীপরিমল গোস্বামী এবং শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। দুঃখ রয়ে গেল, এঁদের হাতে আমরা এ বই তুলে দিতে পারলাম না।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি কবিতা লিখেছিলেন শ্রীবিষ্ণু দে। কবিতাটি বোধ করি 'সেই অন্ধকার চাই' কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কবিতাটি পড়ে আমাদের ভালো লেগেছিল। কবিকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম আমাদের সংকলনের জন্য বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের উপর একটি কবিতা লিখে দেবার জন্য। উত্তরে কবি লিখে-ছিলেন, "... চিঠি পেয়ে কয়েকদিন ভাবলাম। লেখা তো আমার ক্ষেত্রে হয়ে যায়, না হলে নিরুপায় থাকি।" ...ভেবেছিলাম আমাদের সংকলন প্রকাশের আগে আর একবার কবিকে অনুরোধ করবো। কিন্তু আমাদের সে-সাধও পূরণ হয় নি।

শেষ পর্যন্ত যাঁদের সাহায্য এবং সহযোগিতায় বইটি বের করা সম্ভবপর হলো তাঁদের মধ্যে আছেন বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের অধ্যক্ষ ডঃ শশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য, জগদীশ বসু অছি পরিষদের সদস্য অধ্যাপক দেবব্রত বসু এবং বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রাগারের শ্রীদিবাকর সেন। এখানে শ্রীসেন-এর সহযোগিতার কথা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি উদ্যোগী হয়ে এ সংকলনের জন্য বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ জোগাড় করে দিয়েছেন। প্রবন্ধটি

সম্পর্কে তাঁর নানা মূল্যবান পরামর্শেও আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। আমাদের অকৃত্রিম সুহৃদ শ্রীমণীন্দ্র ঘটকও নানাভাবে এই গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে আমাদের সাহায্য করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পত্রিকা থেকে দুটো লেখা পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দেওয়ায় আমরা সাহিত্য পরিষদের সেক্রেটারির নিকট কৃতজ্ঞ।

সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর অসুস্থতা সত্ত্বেও এই সংকলনের জন্য লেখা দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করেছেন। এজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। শ্রীঅচ্যুতানন্দ সাহা বইটির প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রীচন্দ্রনাথ দে, বইটির ছাপার কাজে যাঁরা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীসমরেন্দ্র সাহা, শ্রীনরেশ দাস, শ্রীস্বদেশ ঘোষ, শ্রীতাপস সাহা এবং শ্রীদুলাল বক্সি। এঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

বিজ্ঞান-আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবন, দর্শন, ব্যক্তিত্ব, বিজ্ঞান-কৃতি এবং সাহিত্য-কৃতি সম্পর্কে এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি আচার্যের মূল্যায়নে যদি সামান্য ভূমিকাও নিতে পারে তা হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

দেবব্রত ভট্টাচার্য
অজয় চক্রবর্তী

যাঁরা লিখেছেন

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইতেছি। তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইলাম। তিনি একাধারে কবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক তো ছিলেনই আধ্যাত্মিক জগতের রহস্যময় জগতেও প্রবেশ করিয়াছিলেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করিতেন এই বিরাট বিশ্বের সবই সচ্চিদানন্দের বিস্ময়কর প্রকাশ। সামান্য গাছের মধ্যেও যে বেদনা-বোধ আছে তাহা তিনি যন্ত্রযোগে প্রমাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল সবই চিন্ময়। তাঁহার মধ্যে প্রাচীন যুগের ঋষির পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে। তাঁহার 'অব্যক্ত' আধুনিক উপনিষদ। পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম জানাই, শত শত প্রণাম।

বনফুল

আচার্য জগদীশচন্দ্রের দুষ্প্রাপ্য একটি ছবি

আচার্য জগদীশচন্দ্র : কবি ও মনীষী

ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

আচার্য জগদীশচন্দ্র একাধারে রস-স্রষ্টা কবি, মননশীল মুনি ও সত্যদ্রষ্টা ঋষি। তাঁর ভেতর জিজ্ঞাসুর অতন্দ্রিত জ্ঞান-সাধনা, প্রত্যক্ষবাদী বা প্রমাণ-নির্ভর বৈজ্ঞানিকের কঠোর বিজ্ঞান-চেতনা ও আত্মসমাহিত যোগীর দিব্যানুভূতি ত্রিধারার মতো মিলিত হয়েছে। জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনাবলী জেম্‌স্ জীনসের (James Jeans) রচনাবলীর মতোই কাব্যগুণ-মণ্ডিত ও কখনো কখনো হাস্যরস-সম্পৃক্ত, প্রবল সত্যনিষ্ঠা, প্রখর অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, মাতৃভাষার প্রতি মমত্ব-বোধ এবং ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় রয়েছে তাঁর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধসমূহে। অজন্তার পর্বতগুহার চিত্রাবলীতে শিল্পী জগদীশচন্দ্র দেখতে পেয়েছেন একদিকে কারুকার্যের পরাকাষ্ঠা, অপর দিকে শাশ্বত ভারতের ধ্যানমূর্তি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অন্তরের সাযুজ্য ছিল। যথার্থ কবি ও সত্যজিজ্ঞাসু বৈজ্ঞানিকের যোগসূত্র কোথায়, আর পার্থক্যই বা কোথায়, সে সম্পর্কে আচার্য জগদীশচন্দ্র ও তাঁর জীবন-দেবতার নির্দেশেই বিজ্ঞানের 'বন্ধুর' পথে যাত্রা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের মধ্যে যে-সকল পত্র-বিনিময় হয়েছে, সেগুলিও বাংলা পত্র-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

এ যুগে ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক গবেষকগণকে আচার্য জগদীশচন্দ্রের মতো স্বদেশপ্রেমিক, স্বজাতি-বৎসল অথচ মানবদরদী হতে হবে, শাশ্বত ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাবান অথচ বিশ্বের নাগরিক হতে হবে, প্রবল আত্ম-প্রত্যয়সম্পন্ন অথচ প্রপন্ন হতে হবে, কর্মসাধনায় অনলস অথচ অহংবুদ্ধিশূন্য হতে হবে,—টেনিসনের 'ইউলিসিসের' মতোই তাঁদেরও জীবনের ব্রত হবে সংগ্রাম করা, অন্বেষণ করা, আবিষ্কার করা, আর কোনো অবস্থাতেই ভাগ্যের কাছে নতি স্বীকার না করা—তা হলেই সেই দিব্যধামবাসী পুরুষের আশীর্বাদ তাঁদের ওপর অজস্র ধারে বর্ষিত হবে।

'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগতের' কথা আলোচনা করতে গিয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করছেন—

'অধিক বিস্ময়কর কাহাকে বলিব? বিশ্বের অসীমতা কিংবা (মানবরূপী) এই সসীম ক্ষুদ্র বিন্দুতে অসীম ধারণা করিবার প্রয়াস—কোন্‌টা অধিক বিস্ময়কর?'

পুনশ্চ—'জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব! একথা সর্ব সময়ের জন্য ঠিক নয়। যে শক্তি আদিম জীববিন্দুকে মনুষ্যে উন্নীত করিয়াছে, যাহার উচ্ছ্বাসে নিরাকার মহাশূন্য হইতে এই বহুরূপী জগৎ ও তদ্বৎ বিস্ময়কর জীবন উৎপন্ন হইয়াছে, আজিও সেই মহাশক্তি সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। ঊর্ধ্বাভিমুখেই সৃষ্টির

গতি। আর সম্মুখে অন্তহীন কাল এবং অনন্ত উন্নতি প্রসারিত।' (অব্যক্ত, পৃঃ ১৭)

'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন' এই সংকল্প নিয়ে বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিজয়াভিযান চালিয়েছে, ফলে, মানুষ আজ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। বহু বৈজ্ঞানিকের সাধনা আপাতত ব্যর্থ হলেও কারো সাধনাই একেবারে নিষ্ফল হয় নি। 'মন্ত্রের সাধন' প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্র বলেছেন—

'যাঁহারা ভীরু তাঁহারাই বহু ব্যর্থ সাধনা ও মৃত্যুভয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। বীরপুরুষেরাই নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুভয়ের অতীত হইতে সমর্থ হন।' (অব্যক্ত. পৃঃ ৩৭)

'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' প্রবন্ধে তত্ত্বদর্শী পৌরাণিকের কল্পনা, ক্রান্তদর্শী-কবির প্রজ্ঞাদৃষ্টি ও সংস্কারমুক্ত অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তের যে সমন্বয় ঘটেছে, তা আমাদিগকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে। ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে যাত্রা করে নব্যতান্ত্রিক জগদীশচন্দ্র উপলব্ধি করলেন, 'যিনি শিব, তিনিই রুদ্র, যিনি রক্ষক, তিনিই সংহারক, এই মহাচক্র প্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ পরম্পরের পার্শ্বে স্থাপিত।' জগদীশচন্দ্রের জিজ্ঞাসা—

'যে যায়, সে তো আর ফিরে না, তবে কি সে অনন্ত কালের জন্য লুপ্ত হয়? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি?' (তুলনীয়—মৃত্যু তাহাদের নির্বাণ না তিরোধান?—ঐহিক অমরতা: কালীপ্রসন্ন ঘোষ।)

জগদীশচন্দ্র দিব্যকর্ণে শুনতে পেয়েছেন—

'আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই। দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে চাই।'

কবি জগদীশচন্দ্রের এই অনুভূতি বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের নিকট প্রমাণ-লব্ধ সত্য।

আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর জন্মভূমিতে সাহিত্য সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে যে-মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেছিলেন, তাতে তিনি দেখিয়েছিলেন, কবি ও বৈজ্ঞানিকের পন্থা ভিন্ন হলেও 'উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে' যাত্রা করেছে। বর্তমান যুগ বিশেষজ্ঞের যুগ বলে এ যুগে অশেষবিৎ পণ্ডিতের অভাব ঘটেছে, তাই পাশ্চাত্ত্য জগতে জ্ঞানের রাজ্যে ভেদবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে এবং সত্যের পূর্ণ মূর্তি দর্শনে বাধা জন্মাচ্ছে। ভারতবর্ষ কিন্তু চিরদিন বৈচিত্র্যের ভেতর ঐক্যেরই সাধনা করেছে। জগদীশচন্দ্র বলেছেন—

'বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিক দেখা, এ কথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে,

সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই, জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।' (অব্যক্ত, পৃঃ ৮৭)

আচার্য জগদীশচন্দ্র আমাদের দেশের তরুণ বৈজ্ঞানিকগণকে নিজের মাতৃ-ভূমিতে অবস্থান করে মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। যাঁরা মনে করেন, আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণ-বিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন—

'অবসাদ ঘুচাও। দুর্বলতা পরিত্যাগ করো। মনে করো, আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন, সেই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কর্মভূমি। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না, দ্রুতবেগে খ্যাতি লাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়।......এ সমস্ত দুর্বলতার বাধা আমাদের পক্ষে কখনই চিরসত্য নহে। যাহারা অমরত্বের অধিকারী তাহারা ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই। আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্র ভেদ করিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উত্থানবেগ একেবারে পরিসমাপ্ত হয় নাই, পুনরায় একদিন তাহা আকাশ স্পর্শ করিবেই করিবে।' (অব্যক্ত, পৃঃ ৯৫-৯৬, ৯৯)

জগদীশচন্দ্রের এইসব উক্তি থেকে তাঁর প্রবল আত্মপ্রত্যয় ও ভারতের অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

'বঙ্গমাতা'কে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননি!
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ কর নি।'

কিন্তু কখনো কখনো বঙ্গজননীর আর একটি রূপও দেখা গিয়েছে, সে মূর্তি সন্তানের মঙ্গলকামনায় বজ্রের চাইতেও কঠোর,—আচার্য জগদীশচন্দ্র সেই তেজোদৃপ্তা মূর্তিটিও লক্ষ্য করেছেন। তিনি বাংলার গৌরব শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের উল্লেখ করে বলেছেন, মাতার আদেশেই—

'বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর'।

(সত্যেন্দ্রনাথ : আমরা)

এ যুগের বাঙালীকে আবার সেই মনুষ্যত্বের সাধনায় দীক্ষিত হতে হবে। জগদীশচন্দ্র বলেছেন—

'স্বপ্নের দিন চলিয়া গিয়াছে, যদি বাঁচিতে চাও, তবে কশাঘাত করিয়া নিজেকে জাগ্রত রাখো।' (অব্যক্ত, পৃঃ ১২৪)

রবীন্দ্রনাথের মতো জগদীশচন্দ্রও বিশ্বাস করেছেন, বাঙালীকে মানুষ করে তোলার শ্রেষ্ঠ উপায়—'লোকশিক্ষার শুষ্কপ্রায় ধারাগুলির (যেমন কথকতা, মেলা-স্থাপন) পুনরুজ্জীবন। সমাজে যারা উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত, লাঞ্ছিত অথচ যাদের নিরলস পরিশ্রম, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও আত্মত্যাগের ফলে আমরা সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করছি, তাদের প্রতি মমত্ব-বোধ যতদিন জাগ্রত না হবে, ততদিন আমাদের দেশের কল্যাণ নাই। আর সর্বোপরি আমাদের আলস্য, স্বার্থপরতা ও পরশ্রীকাতরতা বর্জন করতে হবে।'

জগদীশচন্দ্র বাল্যকালেই তাঁর পিতৃদেবের কাছে স্বদেশ-প্রেম ও মনুষ্যত্বের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি প্রথম মাতৃভাষায় প্রকাশ করেছিলেন এবং সাধারণের সমক্ষে তার প্রমাণ প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু তিনি এদেশের তথাকথিত সুধীবৃন্দের স্বীকৃতি লাভ করেন নি। তাই তিনি বিদেশী ভাষা ও বিদেশী পণ্ডিতদের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তিনি গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন—

'আমাদের স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ও বিদেশের হল-মার্কা না দেখিতে পাইলে কোনো সত্যের মূল্য সম্পর্কে একান্ত সন্দিহান হইয়া থাকেন।' (অব্যক্ত, পৃঃ ১৩৭)

পুনশ্চ—'বৈজ্ঞানিক সত্যকে অশ্বমেধের যজ্ঞীয় অশ্বের মতো সমস্ত শত্রু-রাজ্যের মধ্য দিয়া জয়ী করিয়া আনিতে না পারিলে যজ্ঞ সমাপ্ত হয় না।' (অব্যক্ত, পৃঃ ১৩৭)

জগদীশচন্দ্রের চিন্তায় তাঁর মাতৃদেবীর প্রভাবও অল্প নয়। তান্ত্রিক সাধকের কথার প্রতিধ্বনি করেই জগদীশচন্দ্র বলেছেন:

'মাতৃস্নেহে দুইটি রূপ দেখা যায়, উভয়েই আশ্রিতের রক্ষা হেতু। একটি মমতাপন্না করুণাময়ী, অন্যটি সংহাররূপিণী শক্তিময়ী।' (অব্যক্ত, পৃঃ ১৪১)

'বসু বিজ্ঞান মন্দিরে'র প্রতিষ্ঠা আচার্য জগদীশচন্দ্রের অবিস্মরণীয় কীর্তি। সেই মন্দির দেবচরণে নিবেদন করে তিনি বলেছিলেন—

'আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য পরীক্ষা দ্বারা নির্ধারিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়। ……কি সেই মহাসত্য যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও আরাধনা কোনো উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না, তখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে।' (অব্যক্ত, পৃঃ ১৪২-১৪৩)

আচার্য জগদীশচন্দ্রের মতে বিজ্ঞানচর্চার লক্ষ্য লোককল্যাণ, যথার্থ বৈজ্ঞানিককেও গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শই গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেছেন—

'যদি কেহ কোনো বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন।' (অব্যক্ত, পৃঃ ১৪৪)

'বিজ্ঞান-প্রচারে ভারতের দান' সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

'বিজ্ঞানও সার্বভৌমিক, তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন কি কোনো স্থান আছে যাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে? তাহা নিশ্চয়ই আছে। বর্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রসার বহু বিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রতীচ্য দেশে কার্যের সুবিধার জন্য তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। দৃশ্য জগৎ অতি বিচিত্র এবং বহুরূপী। এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে, তাহা বোধগম্য হয় না। সতত চঞ্চল প্রাণী, আর এই চিরমৌন অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য দেখা যায় না। আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্নরূপে সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড়, উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে।' (অব্যক্ত, পৃঃ ১৫০)

জগদীশচন্দ্রের মতে যথার্থ বিজ্ঞান-সাধকের লক্ষ্য দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা, দধীচির মতো পরার্থে আত্মদান। এরূপ সাধকদের উদ্দেশ্যে জগদীশ-চন্দ্র উদাত্ত কণ্ঠে জ্ঞানের সাধনায় অগ্রসর হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন—

'জীবন-সম্বন্ধে একটি মহাসত্য এই যে, যেদিন হইতে আমাদের বাড়িবার ইচ্ছা স্থগিত হয়, সেই দিন হইতেই জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধে একই কথা। যেদিন হইতে আমাদের বড়ো হইবার ইচ্ছা থামিয়াছে, সেদিন হইতেই আমাদের পতনের সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, সঞ্চয় করিতে হইবে এবং বাড়িতে হইবে। তাহার জন্য কি করিয়া প্রকৃত ঐশ্বর্য লাভ হইতে পারে একাগ্র চিত্তে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে।' (অব্যক্ত, পৃঃ ১৫৯)

জগদীশচন্দ্র যেন ভগবদ্গীতার বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই বলেন—

'সেবা দ্বারা, ভক্তি দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা মানুষ এই স্থানে উপনীত হয়। তোমরাও তাহার একটি পথ গ্রহণ করো। জীবন ও তাহার পরিণাম, এই জগৎ ও অপর জগৎ তোমাদের সাধনার লক্ষ্য হউক। নির্ভীক বীরের ন্যায় জীবনকে মহাহবে নিক্ষেপ করো।' (অব্যক্ত, পৃঃ ১৬১)

জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক রচনার আর একটি প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর পরিহাস-রসিকতা। এ বিষয়ে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গেই তাঁর সাদৃশ্য আছে। তিনি এক সময়ে তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রসমূহের সংস্কৃত নামকরণ করে-ছিলেন, যেমন বৃদ্ধিমান, কুঞ্চনমান, শোষণমান ইত্যাদি। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের উচ্চারণ-বিকৃতির জন্যেই তিনি পরে ইংরাজি নামের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, যেমন 'বৃদ্ধিমান' যন্ত্রের নাম হয়েছিল 'ক্রেস্কোগ্রাফ'। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

'হিরণ্যকশিপুকে দিয়া বরং হরিনাম উচ্চারণ করানো যাইতে পারে, কিন্তু ইংরেজকে বাংলা কিংবা সংস্কৃত বলানো একেবারেই অসম্ভব। এজন্যই আমাদের হরিকে হারী হইতে হয়। এই সকল দেখিয়া কলের 'বৃদ্ধিমান' নামকরণের ইচ্ছা একেবারে চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধিমান হইতে বারডোয়ান হইত। তার চেয়ে বরং ক্রেস্কোগ্রাফই ভালো।' (অব্যক্ত, পৃঃ ১৭৭)

বিজ্ঞানের রাজ্যে জগদীশচন্দ্র ছিলেন আত্মসমাহিত যোগী। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—'যোগশ্চিত্ত বৃত্তিনিরোধঃ'। এই চিত্তবৃত্তি নিরোধের ফলেই মানুষ অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে পারে। ধ্যানযোগী জগদীশচন্দ্রও তাঁর সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন—

'মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যাহা দেখি নাই কিংবা শুনি নাই, চিত্তসংযম করিয়া তাহা দেখিয়াছি অথবা শুনিয়াছি। ইহাতে মনে হয় ইচ্ছানুক্রমে এবং বহুদিনের অভ্যাস বলে অনুভূতি-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।' (অব্যক্ত, পৃঃ ১৮৪)

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-সাধনার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বহিঃপ্রকৃতির ওপর জয়লাভ করে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি। এ সাধনা কিন্তু সর্বাংশে সফল হয় নি। অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ দেখতে পাচ্ছে: যে পরিমাণে তার সুখের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে তার দুঃখের মাত্রাও তার চাইতে বহুগুণ বেড়ে গেছে। স্বামীজী বলেছেন—

'As you increase your happiness in arithmetical progression, you thereby increase your misery in geometrical progression.'

ভারতের ঋষিগণ ও যোগিগণ কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতি জয়েরই সাধনা করেছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন—যে আত্মজয়ী, সেই বিশ্বজয়ী। ('জিতং জগৎ কেন মনো হি যেন'—শংকরাচার্য)। আচার্য জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক হয়েও ছিলেন ভারতীয় ভাবধারারই উত্তরাধিকারী। তাই তিনি অন্তঃপ্রকৃতি-জয়ের সার্থকতা উপলব্ধি করে বলেছেন—

'মানুষ কেবল অদৃষ্টেরই দাস নহে, তাহারই মধ্যে এক শক্তি নিহিত আছে যাহার দ্বারা সে বহির্জগৎ নিরপেক্ষ হইতে পারে। তাহারই ইচ্ছানুসারে বাহির ও ভিতরের প্রবেশদ্বার কখনও উদ্ঘাটিত কখনও অবরুদ্ধ হইতে পারিবে। এইরূপে দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার উপর সে জয়ী হইবে। যে ক্ষীণ বার্তা শুনিতে পায় নাই, তাহা শ্রুতিগোচর হইবে, যে লক্ষ্য সে দেখিতে পায় নাই, তাহা তাহার নিকট জাজ্বল্যমান হইবে। অন্যপ্রকার সে বাহিরে সর্ব বিভীষিকার অতীত হইবে। অন্তররাজ্যে স্বেচ্ছাবলে সে বাহিরের ঝঞ্ঝার মধ্যেও অক্ষুব্ধ রহিবে।' (অব্যক্ত পৃঃ ১৯১-১৯২)

আচার্য জগদীশচন্দ্র দার্শনিক সক্রেটিসের মতো তাঁর অন্তর-পুরুষের অমোঘ

সুস্পষ্ট নির্দেশ শ্রবণ করে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। তিনি সেই অদৃশ্য পুরুষের নিকট পরম শ্রদ্ধাভরে যুক্তকরে বলেছেন—'করিষ্যে বচনং তব,' তোমার যা হুকুম আমাকে তামিল করতেই হবে। 'হাজির' প্রবন্ধে রহস্যবাদী বা আলোকপন্থী (মিষ্টিক) জগদীশচন্দ্র বলেছেন—

'বুঝিতে পারিতেছি, বাহির ছাড়া ভিতর হইতেও হুকুম আসিয়া থাকে। মনে করিতাম, আমার ইচ্ছাতেই সব হইয়াছে। আমি কি এক? একটু মন স্থির করিলেই দুইয়ের মধ্যে যে সর্বদা কথা চলিতেছে, তাহা শুনিতে পাই। ইহারাই আমাকে চালাইতেছে।' (অব্যক্ত, পৃঃ ১৯৫)

আবার কখনো তিনি অন্তর-পুরুষের কঠিন স্বর শুনতে পেয়েছেন—'আমার নাম হুকুম, তোমার নাম তামিল।' লাভালাভ-বিচারের অধিকার তোমার নাই। এ যেন ভগবদ্গীতার সেই বাণী—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'

ভারতের ঋষিগণ ধ্যানদৃষ্টিতে যে সত্য আবিষ্কার করেছিলেন, আচার্য জগদীশচন্দ্র তাকেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এদিক দিয়েই জগদীশচন্দ্র ভারতের ঐতিহ্যের ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। ঋষিগণ দেখেছিলেন,—জড়জগতে, উদ্ভিদজগতে এক অখণ্ড প্রাণের লীলা সর্বত্রই চলেছে, যাকে আমরা 'জড়' বলি, সেখানেও চলেছে প্রাণেরই স্পন্দন। উদ্ভিদের যে সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে, সে কথা একদিন ভগবান মনুও দ্বিধাহীন ভাষায় প্রচার করেছেন। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে—

'তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতা কর্মহেতুনা।
অন্তঃ সংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ সমন্বিতা ॥'

এই উদ্ভিদজগৎ, এই বনস্পতি। এই ওষধি। সকলই কর্মফলে তমোগুণে বেষ্টিত হয়ে রয়েছে, এদের অন্তরে চেতনা আছে, সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা চৈতন্যবান সত্তাকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। এ শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত করতে না পারলে শুধু শাস্ত্রের দোহাই দিলে বৈজ্ঞানিকেরা তা মানবেন কেন?

এইজন্যে জগদীশচন্দ্র প্রধানত পদার্থবিজ্ঞানী হয়েও প্রাণবিজ্ঞানের একটি গূঢ়তম সত্যকে আবিষ্কার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, জড়ে ও উদ্ভিদে, উদ্ভিদে ও জীবে, জীবে ও মনুষ্যে আমরা যে পার্থক্য দেখিতে পাই, তা মাত্রাগত, কিন্তু অভিব্যক্তির শেষ স্তরে যে মনুষ্যের উদ্ভব হয়েছে, একমাত্র সেই মানুষই অমৃতত্ব লাভের অধিকারী।

জগদীশচন্দ্র ছিলেন একাধারে কবি ও বৈজ্ঞানিক, ধ্যানযোগী ও জ্ঞানযোগী, তাই 'ভারতাত্মার বাণীমূর্তি'।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

যে-কয়েকজন প্রতিভাপন্ন মনীষী জগতের সভায় ভারতকে বিশিষ্টতা দান করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু অন্যতম। কবির কাব্য যেমন কবির জীবন থেকে অভিন্ন, বিজ্ঞান তেমনি জগদীশচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে সংযুক্ত। বিজ্ঞানের গবেষণা কাকে বলে ভারতবাসী যখন তা কিছুই জানত না, সেই সময়ের নানা প্রতিকূল অবস্থায় তিনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্যানুসন্ধান করেছিলেন এবং বহু বাধা ও বিঘ্ন সত্ত্বেও অসাধারণ শক্তি, মেধা ও ধৈর্যের বলে অনেক নতুন তথ্য ও তত্ত্বের আবিষ্কার করে জগতের জ্ঞান-সম্পদ বর্ধিত করেছিলেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই সত্য ও জ্ঞানের সাধনায় প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যে কেটেছিল—আচার্য জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এই সত্যানুসন্ধানী পুরুষের সংগ্রামময় জীবনের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন—

> "মনে আছে একদা যেদিন,
> আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,
> ঈর্ষা কণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,
> ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণ অকারণ রণে
> হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। সেই দুঃখই তোমার পাথেয়,
> সেই অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়।"

জীবনের শেষে জগদীশচন্দ্রের অব্যবসায় ও কর্মশক্তির জয় হয়েছিল—বিজ্ঞান-জগতে সর্বত্রই তাঁর খ্যাতির জয়শঙ্খ অনবদ্যভাবে বেজে উঠেছিল।

জগদীশচন্দ্র ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাঢ়িখাল গ্রামের ভগবান-চন্দ্র বসুর পুত্র। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ৩০-এ নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর কর্মস্থল ফরিদপুরে জগদীশচন্দ্রের শৈশব অতিবাহিত হয়। ভগবানচন্দ্র অতিশয় তেজস্বী ও শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। নানা কার্যের ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি বালক জগদীশচন্দ্রের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন। শহরে তখন দুটি বিদ্যালয় ছিল—একটি গভর্নমেণ্ট-চালিত ইংরাজী বিদ্যালয়, অন্যটি বাংলা বিদ্যালয়। ভগবানচন্দ্র তাঁর পুত্রকে বাংলা বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, দেশের সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়ের বালকদের সঙ্গে নিজের মাতৃভাষার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করলে প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন সহজ ও স্বাভাবিক হয়। বাল্যের এই শিক্ষার গুণেই জগদীশচন্দ্রের সমগ্র জীবনে তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও দেশাত্মবোধ নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা বিদ্যালয়ের শিক্ষান্তে, নয় বৎসর বয়সে বালক জগদীশচন্দ্র কলিকাতা হেয়ার স্কুলে ও পরে সেণ্ট জেভিয়ার্স

বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। শেষোক্ত বিদ্যালয়ের থেকেই তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে সেখানকার কলেজ বিভাগে উচ্চশিক্ষা আরম্ভ করেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ জগদীশচন্দ্রের ছাত্রজীবনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। লাফোঁর শিক্ষা দেবার প্রণালী ও ব্যাখ্যা করবার ক্ষমতা সুন্দর ছিল—ক্লাশে তিনি নিপুণতার সাথে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করতেন। এরূপ এক পদার্থবিদ্‌ শিক্ষকের কাছে জগদীশচন্দ্রের হাতে-খড়ি হয়। কলেজে পাঠের সময় তিনি একবার আসামের জঙ্গলে শিকারে গিয়েছিলেন—সেখান থেকে তিনি এক দুরন্ত জ্বর রোগ নিয়ে ফেরেন। এই রোগে তিনি কয়েক বৎসর বেশ কষ্ট পেয়েছিলেন। বি.এ. পরীক্ষায় সেইজন্য তিনি কৃতিত্বের কোন পরিচয় দিতে পারেন নি। ডিগ্রি পাবার পর পিতামাতার অবস্থার উন্নতির আশায় জগদীশচন্দ্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য ইংলণ্ডে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পিতা পুত্রকে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য লণ্ডনে প্রেরণ করেন। লণ্ডনে এসেও তাঁর আগের জ্বর রোগ থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার গুরুতর পরিশ্রমের জন্য তাঁর অসুখ আরও বেড়ে যায়। ফলে, জগদীশচন্দ্র চিকিৎসা-বিদ্যা ছেড়ে কেম্ব্রিজে ন্যাচারেল সায়েন্স ট্রাইপস (Natural Science Tripos) পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হন। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্রের জীবনে এক সম্পূর্ণ নতুন জীবনের সূচনা হয়। কেম্ব্রিজে ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে বিজ্ঞানের অনেক বিখ্যাত অধ্যাপকের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হয়। লর্ড র‍্যালির নিকট তিনি পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করেন। এই প্রতিভাশালী ইংরেজ বিজ্ঞানীর নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার ভিতকে পাকা করে দিয়েছিল। প্রাণী-বিজ্ঞানে মাইকেল ফস্টার, ফ্রান্সিস বাল্‌ফুর প্রভৃতি তাঁর শিক্ষক ছিলেন। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভিনে ও ফ্রান্সিস ডারউইন-এর কাছে তিনি উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। ট্রাইপস পরীক্ষা পাশ করে জগদীশচন্দ্র লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি. ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। বিদেশে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি পঁচিশ বছর বয়সে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

দেশে ফিরে জগদীশচন্দ্র বসু কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই কাজ তিনি সহজে পান নি। ইংলণ্ডে বাস-কালে তাঁর ভগ্নীপতি স্বনামধন্য আনন্দমোহন বসুর বিশিষ্ট বন্ধু অধ্যাপক ফসেট বড়লাট লর্ড রিপনের নিকট এক পরিচয়-পত্র পাঠিয়েছিলেন। লর্ড রিপনের নির্দেশমতে জগদীশচন্দ্রকে প্রথমে অস্থায়িভাবে অধ্যাপকের পদ দেওয়া হয়। সে সময় ভারতীয় অধ্যাপকদের বেতনের পরিমাণ ইংরেজ অধ্যাপকদিগের বেতনের তুলনায় অনেক কম ছিল। অস্থায়ী পদের জন্য জগদীশচন্দ্রের বেতন তারও অর্ধেক ধার্য হয়। প্রতিবাদস্বরূপে তিনি তিন বৎসর এই অর্ধেক বেতনের টাকা গ্রহণ করেন নি—এমনি তাঁর তেজস্বিতা

ও মনের জোর ছিল। কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেব ও শিক্ষা-বিভাগের ডিরেকটার তিন বৎসর পরে জগদীশচন্দ্রের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে স্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন এবং পুরো বেতনে প্রথম তিন বছরের সমস্ত টাকা মঞ্জুর করেন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজেই তিনি অধ্যাপকরূপে কাজ করেছিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজেই জগদীশচন্দ্র প্রথম গবেষণার কাজ আরম্ভ করেন। তাঁর ৩৫ বছরের জন্মদিনে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জীবন বিজ্ঞানের জন্য উৎসর্গ করবেন বলে তিনি সংকল্প করেন এবং এর এক বছরের মধ্যেই তাঁর এক মৌলিক নিবন্ধ লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বেতারবার্তা পাঠাতে হলে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি করতে হয়। অধ্যাপক বসু মহাশয় বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে এই সময়ে অনেক গবেষণা করেন। এই সব গবেষণার জন্য রয়েল সোসাইটি জগদীশচন্দ্রকে অর্থ সাহায্য করে এবং এ থেকেই তাঁর গবেষণার মূল্য নিরূপিত হতে পারে। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান ডি.এস্‌সি. উপাধি তিনি তখন পেয়েছিলেন। তখন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় সামান্য টিনের মিস্ত্রীর সাহায্যে জগদীশচন্দ্র তাঁর যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে যেসব আবিষ্কার করেন, পৃথিবীর বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা তার যথেষ্ট সুখ্যাতি করেন। ইংলণ্ডে লর্ড কেলভিন, ও ফরাসী দেশের অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের সভাপতি কর্নু (Cornu) এই সময়ে জগদীশচন্দ্রকে পত্র লিখে অভিনন্দিত করেছিলেন। ইউরোপের বিজ্ঞানীদের প্রশংসাবাদ শুনে ভারত গভর্নমেণ্ট কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ২৫০০ টাকা দেবার বন্দোবস্ত করেন। এই অপর্যাপ্ত অর্থ নিয়ে সপ্তাহে ২৬ ঘণ্টা ক্লাশ করবার পর, নিজের গবেষণাগারে প্রথম শ্রেণীর গবেষণার কাজ জগদীশচন্দ্র বসুর মতই একনিষ্ঠ জ্ঞানতপস্বীর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এর কিছু পরেই তিনি ভারত গভর্নমেণ্ট-কর্তৃক ন মাসের জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। এই সময়ে লণ্ডনের রয়েল ইনষ্টিটিউশনের শুক্রবারের সভায় আহূত হয়ে আলোক ও তাপ-তরঙ্গের সঙ্গে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে সারূপ্য ও সাযুজ্য বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সম্মুখে অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত করেন। বক্তৃতা সভায় বৃদ্ধ লর্ড কেলভিন জগদীশচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। পরে উপরে ভিজিটার্স গ্যালারিতে বসু মহাশয়ের পত্নীর সহিত করমর্দন করে তাঁর আনন্দ জ্ঞাপন করেন। বেতারবার্তা পাঠাবার প্রেরক-যন্ত্র ও তা গ্রহণ করবার গ্রাহক-যন্ত্র তিনি সেই সময়েই নির্মাণ করে দেখিয়েছিলেন। Societe & Physique-কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি প্যারিসেও তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন। এই বিজ্ঞান-সভার 'অনারারি' সভ্য হিসেবেও তিনি মনোনীত হয়েছিলেন। বার্লিনের অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের সভাতেও জগদীশচন্দ্র

বক্তৃতা করেছিলেন। জার্মানির বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

বেতারের প্রেরক-যন্ত্রে জগদীশচন্দ্র সেই সময়েই ওয়েভ গাইডের (Wave guide) প্রবর্তন করেন। আধুনিক কালে অতি-হ্রস্ব (ultra-short) বিদ্যুৎ-তরঙ্গের কথা সকলেই শুনেছেন—ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী প্রায় চার মিলিমিটারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তাঁর প্রেরক-যন্ত্রে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। এর বহু বছর পরে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার নিকল্‌স (Nichols) ও টেয়ার (Tear) এবং অন্যান্য বিজ্ঞানী এর চেয়েও কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করেছিলেন। অবশ্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সমান বিস্তারের ছিল না। এ ধরনের বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে ক্রমবিলীয়মান বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বলা হয়। বেতারের গ্রাহক-যন্ত্রে সেকালে সংসক্তক (coherer) নামে একটি যন্ত্রিকার ব্যবস্থা থাকত। প্যারিসের অধ্যাপক ব্র্যানলি (Branly) এই সংসক্তক যন্ত্রিকাটি প্রথম তৈরী করেন। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত বিজ্ঞানী অলিভার লজ (Oliver Lodge) প্রভৃতি এবং ভারতবর্ষের জগদীশচন্দ্র এই যন্ত্রিকাটির অনেক উন্নতি সাধন করেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণার বিষয়ে কিছুই গোপন করেন নি। লণ্ডনের "ইলেকট্রিক এঞ্জিনীয়ার" পত্রিকা এতে বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। ব্যবসায়ীরা তাঁর সঙ্গে অর্থকরী বন্দোবস্তের চেষ্টা করে অনেকবারই বিফল মনোরথ হয়েছিল। জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের গবেষণাগারে অবস্থিত তাঁর বেতার-প্রেরক-যন্ত্র থেকে তাঁর নিজের বাড়িতে স্থিত গ্রাহক-যন্ত্রে বেতার সংকেত পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য এর পূর্বেও বেতার সংকেত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছিল। এই সম্পর্কে ইংলণ্ডের হিউজ (Hughes), ইতালির প্রসিদ্ধ বেতার বিজ্ঞানী মার্কনি (Marconi) ও অন্য কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

য়ুরোপে তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার পর দেশে ফিরে এসে জগদীশচন্দ্র পূর্ণ উদ্যমে আবার নতুন নতুন গবেষণায় মন দিলেন। "On a self-recovering coherer", "On electrical touch and molecular changes produced in matter by electrical waves", "Artificial retinal binocular alteration of vision", "On the strain theory of photographic action" প্রভৃতি অনেক তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ তিনি লণ্ডনে রয়েল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। এই সময় থেকেই জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হল বলা যেতে পারে। "Response of the living and nonliving" সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা তাঁকে জড়-বিজ্ঞান ও প্রাণী-বিজ্ঞানের মধ্যপথে এনে উপস্থিত করেছিল।

১৯০০-খ্রীস্টাব্দে ভারত গভর্নমেণ্ট আবার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে ইংলণ্ডে

প্রেরণ করেন। এই বৎসর প্যারিস ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ফিজিসিস্টস-এর সভায় জগদীশচন্দ্র তাঁর নতুন গবেষণার ফল উপস্থাপিত করেন। 'ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স'-এর সভা সে-বছর ব্র্যাডফোর্ডে হয়। সেখানেও তিনি তাঁর গবেষণার বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সবাই তাঁর যান্ত্রিক কৃতিত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে প্রাণী- ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে ঘোর সংশয় ও সন্দেহের ভাব পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল। বহু বৎসর জগদীশচন্দ্রকে এই সংশয়-প্রসূত বিরুদ্ধ ভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর গবেষণার সুবিধার জন্য একটি উচ্চাঙ্গের বীক্ষণাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র ভারত গভর্নমেণ্টকে বহুবার জানিয়েছিলেন—তাঁর গুণমুগ্ধ বড় বড় বিজ্ঞানী বিলাত থেকে ঐ মর্মে ভারত গভর্নমেণ্টকে আবেদনপত্রও পাঠিয়েছিলেন। লর্ড কার্জন যখন বড়লাট তখন এই বীক্ষণাগার নির্মাণের আগে তিনি জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সম্বন্ধে বিলাতের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মতামত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। এই সময়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকেরা জগদীশচন্দ্রের গবেষণার অনেক প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ বিরুদ্ধতা করেছিলেন। ফলে, বীক্ষণাগার নির্মাণের কথা চাপা পড়ে যায়—কেবল ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন।

উদ্ভিদ- ও প্রাণী-বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার মূল্য নির্ণয় করা বর্তমান লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, যে-সব যন্ত্রের সাহায্যে তিনি গবেষণা চালিয়েছিলেন, তার শিল্পকুশলতা ও পরিকল্পনা অসাধারণ। গাছের ক্রমোবৃদ্ধি—উদ্ভিদ-জগতের চেতনার সাড়া তাঁর যন্ত্রগুলিতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নিভু́লভাবে লিপিবদ্ধ হতে পারে। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত 'নেচার' (Nature) পত্রিকায় অধ্যাপক ডবলিউ. এইচ. ব্র্যাগ, অধ্যাপক এফ. ডবলিউ. অলিভার, লর্ড র‍্যালি, অধ্যাপক বেলিস্‌, অধ্যাপক এফ. জি. ডোনান্‌ প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের মতামত প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, জগদীশচন্দ্রের ক্রেস্‌কোগ্রাফ (Crescograph) যন্ত্রের 'ম্যাগনিফিকেশন' ১০ লক্ষ থেকে ১ কোটি। এর অর্থ যে, এই গাছ বাস্তবিক যতটুকু বাড়ে তার ১০ লক্ষ থেকে ১ কোটি গুণ বড় করে ঐ যন্ত্রে দেখা যায়। এই বিশেষ যন্ত্রটিই শুধু যদি জগদীশচন্দ্র নির্মাণ করে যেতেন, তাতেই তাঁর অনেক সুখ্যাতি হতে পারত। লজ্জাবতী লতা ও ফরিদপুরের সন্ধ্যায় নুয়ে পড়া আশ্চর্য খেজুর গাছের কথা অনেকেই পড়েছেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের চেতনা রাজ্যের অনেক তথ্য ও তত্ত্ব জানতে পেরেছিলেন। অ্যাসেণ্ট অফ দি স্যাপ ইন প্ল্যাণ্টস (Ascent of the sap in plants), ফেনোমেনন্‌ অফ ইরিটেবিলিটি ইন প্ল্যাণ্টস (Phenomenon of irritability in plants) প্রভৃতি সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের

বহু শ্রমসাপেক্ষ গবেষণা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ও তাঁর প্রণীত পুস্তকাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে য়ুরোপ ও আমেরিকায় তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য আবার তাঁর আমন্ত্রণ আসে। রয়েল ইনস্টিটিউশন ও রয়েল সোসাইটি অফ মেডিসিন-এর সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। ভিয়েনা ও প্যারিসেও তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়। আমেরিকায় ফিলাডেলফিয়া, নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, হার্ভার্ড প্রভৃতি স্থানে তিনি তাঁর গবেষণার ফল বিদ্বজ্জনের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। সর্বত্রই তিনি অভিনন্দিত হয়েছিলেন। বিলাত থেকে ফিরে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। গভর্নমেণ্ট তাঁর বহুবর্ষব্যাপী অধ্যাপনা ও গবেষণার পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের 'এমেরিটাস্ প্রোফেসর' (Emeritus Professor) নিযুক্ত করেন। অবসর গ্রহণের অল্পদিন পরেই গভর্নমেণ্ট তাঁকে 'নাইটহুড' ও পরে সি. এস. আই. উপাধি দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

বহুদিন থেকেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু গবেষণার জন্য উপযোগী প্রতিষ্ঠান গড়তে চেয়েছিলেন—অধ্যাপকের কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পর থেকেই তাঁর সমস্ত মন এই দিকে নিয়োজিত হয়েছিল। নালান্দা ও তক্ষশীলার ভগ্নস্তূপ দেখে দেশের প্রাচীন বিদ্যাপীঠের আদর্শ তাঁকে অভিভূত করেছিল। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ৩০-এ নভেম্বর, তাঁর ৫৯তম জন্মদিনে কলিকাতার আপার সার্কুলার রোডে (বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) তাঁর নিজের বাসভবনের পাশেই বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের (বোস রিসার্চ ইনস্টিটিউট) প্রতিষ্ঠা দিবসে তিনি বলেছিলেন—"I dedicate this Institute, not merely laboratory but a temple."

বিজ্ঞান-মন্দিরের মহান আদর্শের উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন—"Not in matter but in thought, not in possession, nor even in attainments but in ideals is to be found the need of immortality. Not through material acquisition but in general diffusion of ideals and ideas can the true empire of humanity be established."

এই আদর্শবাদ ছাত্রসমাজকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক ছাত্র বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসে বিজ্ঞানসেবাব্রতে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সুখের বিষয় এই যে, এই বিজ্ঞান-মন্দির পরিচালনার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট অর্থ সাহায্য করে আসছেন। রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চাঙ্গের গবেষণা এই প্রতিষ্ঠানে নতুন করে আরম্ভ হয়। বসু বিজ্ঞান-মন্দির ব্যতীত দার্জিলিং-এর পাহাড়ে ও গঙ্গার ধারে ফলতায় জগদীশচন্দ্র গবেষণার জন্য গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের আয়ের অধিকাংশই বিজ্ঞানের সাধনায় ব্যয়িত হয়েছে।

বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠার দু'বছর পরে জগদীশচন্দ্র আবার বিলাত যান। এতদিন যাঁরা তাঁর গবেষণায় সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, এবার তাঁদের অনেকের মনেই তিনি বিশ্বাস জন্মাতে পেরেছিলেন। এবার তাঁর বক্তৃতাদি শুনে প্রাণী ও উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা পর্যন্ত তাঁকে প্রচুর সমাদর করেছিলেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে ব্লুম্স্বেরি স্কোয়ারে জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগারে অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সমাগম হয়। এই সময় থেকেই দেশেবিদেশে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এল. এস. ডি. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করেন। জগদীশচন্দ্র বসুই ভারতীয়দের মধ্যে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির তৃতীয় 'ফেলো'। এই সম্মান জড় ও প্রাণী-বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার স্বীকৃতি বলা যেতে পারে। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি যেসব সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত ছিলেন, ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে মনে হয় বিজ্ঞান জগৎ তার অনেকখানি অসন্দিগ্ধ চিত্তে স্বীকার করে নেয়।

বিজ্ঞানের সাধনায় জগদীশচন্দ্র বসু বহুবার বিদেশে গিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষের নানা স্থানে তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন। তিনি ভারতের তীর্থে তীর্থে ঘুরে ভারতের মূলগত ঐক্য হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। ভারতপ্রেমিক ও ভারতপথিক ছিলেন তিনি। ভারতের শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য তাঁর মনে প্রেরণা জাগিয়েছিল। বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের অভ্যন্তরে যে-সব চিত্রের সমাবেশ আছে তা দেখে বোঝা যায়, তিনি শুধু শিল্পপ্রাণ ছিলেন না, তাঁর মন একান্তই ভারতীয় ছিল। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে বসু পরিবারের হৃদ্যতা ছিল। একবার ভারত তীর্থ পর্যটনে নিবেদিতা বসু পরিবারের সঙ্গিনী ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানে সাফল্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ চিঠিপত্রে ও কবিতায় কতই না প্রশস্তি লিখে গেছেন।

ইংলণ্ডে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজার নিকট থেকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে জগদীশচন্দ্রের গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁর রচিত অনেক সুন্দর বাংলা প্রবন্ধ আছে। তাঁর কতকগুলি রচনা 'অব্যক্ত' নামক পুস্তকে ছাপা হয়েছে। বহু বৎসর তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে নভেম্বর মাসের প্রথমে জগদীশচন্দ্র গিরিডিতে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে সস্ত্রীক বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে ২৩-এ নভেম্বর স্নানাগারে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। দেশের দুর্ভাগ্য, তাঁর আর জ্ঞান ফিরে আসে নি। এমনি অলক্ষিতে ও আকস্মিক ভাবে জগদীশচন্দ্রের কর্মবহুল জীবনের পরিসমাপ্তি হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৭৯ হয়েছিল।

পরিশেষে জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহধর্মিণীর উল্লেখ না করলে এই জীবনকথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিখ্যাত সমাজসংস্কারক দুর্গামোহন দাশের

অন্যতমা কন্যা শ্রীমতী অবলাকে জগদীশচন্দ্র বিবাহ করেন। দুর্গামোহন দাশ দেশবরেণ্য চিত্তরঞ্জন দাশের পিতা ভুবনমোহন দাশের সহোদর ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে শ্রীমতী অবলা বসুর নানা প্রচেষ্টার কথা সকলেরই বিদিত। ইনিও বহু বৎসর হল গত হয়েছেন। জগদীশচন্দ্রের জীবনের সব কাজে ও চিন্তায় তাঁর সহধর্মিণীর সক্রিয় সহযোগিতা ও সহানুভূতি জগদীশচন্দ্রের জীবনের সম্পূর্ণতা দান করেছিল—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মের শতাধিক বর্ষ পরে আজ আমরা তাঁরই উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

দারজিলিংয়ে—জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে

রমেশচন্দ্র মজুমদার

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু যখন একজন বিশ্ববিখ্যাত বিরাট বৈজ্ঞানিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন আমি তখন ছাত্র, এবং অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে কেবল দূর থেকে দাঁড়িয়েই তাঁকে দেখতাম। অনেক দিন পর যখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়েছি তখন আমি দারজিলিংয়ে একটি বাড়ি ক্রয় করেছি, যেটি তাঁরই দারজিলিংস্থিত বাসগৃহের ঠিক নীচে। তাঁর বাড়িতে আমি প্রায়ই যেতাম এবং গভীর মনোযোগ সহকারে তাঁর বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা ও পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে নানা কথা শুনতাম। লেডি বসুও সাধারণত তাঁর সঙ্গে দারজিলিংয়ে যেতেন এবং জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে আমাকে অনেক কথাই বলতেন। ঐ সকল কথার মধ্যে আজো একটি কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। লেডি একদিন বলেন যে, খেতে খেতে ওঁর মাথায় গবেষণা-সংক্রান্ত হঠাৎ যদি কোন একটা ব্যাপার এসে গেল তো অমনি ডাইনিং রুম পরিত্যাগ করে সোজা laboratory-তে গিয়ে উপস্থিত হন।

জগদীশচন্দ্র তাঁর কথাবার্তায় ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল মনের মানুষ। একদিন তিনি আমার কাছে জানতে চান, যে মহিলাটিকে তিনি প্রায়ই আমার সঙ্গে বেড়াতে দেখেন, তিনি কে? লেডি বসু রীতিমত চটে উঠে জগদীশচন্দ্রকে বললেন, 'আরে, উনি তো ওঁর স্ত্রী, আমাদের বাড়িতে তো উনি একদিন এসেছিলেন', এবং জগদীশচন্দ্রও যে তাঁকে দেখেছেন সে কথাও মনে করিয়ে দেন। লেডি বসুর এ কথা শুনে জগদীশচন্দ্র আমায় বলেন, 'আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছি সে জন্য আমায় ক্ষমা করবেন।' এতে আমরা দু'জনেই হাসতে লাগলাম।

স্যার জগদীশ একবার আমার দারজিলিংয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। এবং আমায় বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ এক সময় এই বাড়িতেই থেকে গেছেন। তারপর আমার বসার ঘরের একটি জানলা দেখিয়ে বললেন যে, কবি প্রায়ই এই জানলাটির ধারে বসে চুপচাপ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

জগদীশচন্দ্রের প্রস্তাব অনুসারেই আমি ছোট্ট একখানি নোটিশ বোর্ডে 'মহান কবি রবীন্দ্রনাথ এখানে বাস করেছিলেন,' এইটুকু লিখে ঘরের বাইরে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম।

লজ্জাবতীর সাড়া

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

লজ্জাবতী লতা আমাদের দেশের সর্বত্রই পরিচিত। এই উদ্ভিদের পাতাগুলি এতই স্পর্শকাতর যে, সামান্য একটু স্পর্শ বা আঘাতে পাতার লম্বা ডাঁটাটা নীচের দিকে নুইয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই পাতাগুলি সম্পূর্ণরূপে মুড়ে যায়। কিন্তু আঘাত-জনিত উত্তেজনা কেমন করে দূরবর্তী স্থানে অত দ্রুতগতিতে সঞ্চালিত হয়ে বোঁটার (Pulvinus) পতন ও পত্রপুঞ্জের সঙ্কোচন ঘটায়, কেমন করে লজ্জাবতী সাড়া দেয় প্রত্যেকেরই সে কথা জানবার কৌতূহল অদম্য। আচার্য জগদীশচন্দ্র লজ্জাবতী লতার এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বিভিন্ন উপায়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করেছিলেন। কোন কারণে উত্তেজিত হলেই লজ্জাবতীর বোঁটার স্ফীত স্থানগুলি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নীচের দিকে বেঁকে যায়, ফলে পাতার ডাঁটাটি নুইয়ে পড়ে এবং পরক্ষণেই পাতাগুলি মুড়ে যায়। পরীক্ষার ফলে বুঝা গেল বোঁটার নীচের দিকে কতকগুলি বিশেষ ধরনের কোষ রয়েছে। বোঁটার পাতলা সেকশান কেটে সেগুলিকে হিমাটক্সিলিন ও স্যাফ্রানিক নামক রঞ্জক পদার্থে ডুবিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেল, বোঁটার ঐ বিশেষ কোষগুলি লাল রঙে রঞ্জিত হয়েছে। কিন্তু 'কর্টেক্সের' কোষগুলি কোন রঙই গ্রহণ করে নি। এগুলিকেই তিনি সক্রিয় পদার্থ বা Active bodies বলেছেন। সামান্য কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হলেই এই পদার্থগুলি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এবং তার ফলেই পাতার পতন ঘটে। শারীরতাত্ত্বিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হলো যে, প্রাণিদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন এক খণ্ড মাংসপেশী সংলগ্ন স্নায়ুসূত্রের দূরবর্তী প্রান্তে কোন উত্তেজনার সৃষ্টি করলে সেই উত্তেজনার প্রবাহ যেমন স্নায়ুসূত্রের সাহায্যে পরিচালিত হয়ে মাংসপেশীতে সাড়া জাগায়, লজ্জাবতী লতার ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনই পত্রসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন কাণ্ডের দূরবর্তী স্থানে উৎপন্ন উত্তেজনাপ্রবাহ বিশেষ কোষশ্রেণীর সাহায্যে সঞ্চালিত হয়ে পাতার বোঁটা অর্থাৎ পালভাইনাসে উপনীত হলেই পাতা মুড়ে সাড়া দিয়ে থাকে। তা ছাড়া, প্রাণিদেহে যেমন বিষাক্ত পদার্থ অবসাদক বা শৈত্য প্রয়োগে উত্তেজনা প্রবাহ বন্ধ করা যায়, স্পর্শকাতর উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও তেমনি ক্লোরোফর্ম, ইথার, বিষ ও শৈত্য প্রয়োগে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে উত্তেজনায় সাড়া দেবার পদ্ধতির এরূপ সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই জগদীশচন্দ্র এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, প্রাণিদেহের মতো অঙ্গ সঞ্চালনক্ষম উদ্ভিদদেহেও উত্তেজনাপ্রবাহ পরিচালিত হয়ে সাড়া দেবার ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে তোলে।

কিন্তু রিকা (১৯১৬) এবং পরবর্তী অপর কয়েকজন গবেষক প্রকাশ

করেন যে, Mimosa Pudica-নামক লজ্জাবতী লতার ডাঁটা, কাণ্ড প্রভৃতি থেঁতো করে রস নিংড়ে নিয়ে লজ্জাবতী লতার কর্তিত স্থানে প্রয়োগ করলে যথারীতি পাতা মুড়ে সাড়া দেয়। তা ছাড়া, গাছ লজ্জাবতীর (Tree mimosa বা Mimosa spegazzinni) পাতা সমেত অগ্রভাগের খানিকটা কেটে নিয়ে জলপূর্ণ সরু কাচনলের সাহায্যে পুনরায় কর্তিত স্থানে মুড়ে দিলে কিছুক্ষণ পরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তখন কর্তিত স্থানের নীচের অংশটাতে উত্তপ্ত লৌহশলাকার ছেঁকা দিলে অনেক ক্ষেত্রেই উপরের অংশের পাতাগুলিকে মুড়ে যেতে দেখা যায়। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, আহত স্থানে নির্গত এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ রসস্রোতে পরিবাহিত হয়ে পাতার পালভাই-নাস অর্থাৎ বোঁটার উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং তার ফলেই পাতা মুড়ে সাড়া দিয়ে থাকে। কাজেই দেখা যায়, লজ্জাবতী সাড়া দেবার ব্যাপারে জগদীশচন্দ্র যেখানে উত্তেজনাপ্রবাহ পরিচলনের কথা বলেছেন, রিকা প্রমুখ গবেষকরা কিন্তু উত্তেজক পদার্থের পরিবহণকেই এজন্য দায়ী করেছেন।

যা হোক, রিকার পরীক্ষায় গাছ লজ্জাবতীতে উত্তেজক পদার্থের অস্তিত্বের বিষয় আবিষ্কৃত হবার পর স্নো (১৯২৪-২৫) সাধারণ লজ্জাবতী লতার (Mimosa Pudica) অনুরূপ উত্তেজক পদার্থের সন্ধান পান। এই ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে ক্রমশ আরও অনেক গবেষণা-কর্মী এই পদার্থটির পৃথকীকরণ এবং রাসায়নিক গঠন নির্ধারণের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। মোলিস (১৯২১) বলেন, পদার্থটি ফেনোলিক ধর্মীয়, এবং সাধারণ লজ্জাবতীর (Mimosa Pudica) অঙ্গ সঞ্চালন ক্ষমতার কোন সম্পর্ক নেই, যেহেতু অঙ্গসঞ্চালনক্ষম উদ্ভিদ গাছ লজ্জাবতী থেকে এরূপ কোন পদার্থ নির্গত হতে দেখা যায় না। কিন্তু জেনী রেন্‌জ (১৯৩৬) একরকম নতুন পদার্থের সন্ধান পান এবং পদার্থটির নাম দেন Mimosin। ফিটিং, নিয়েনবার্গ, ট্যানবক (১৯৩৭) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা জেনী রেন্‌জকে সমর্থন করেন। কিন্তু আমাদের গবেষণাগারে লজ্জাবতী-লতার কর্তিতাংশ মূল উদ্ভিদের সঙ্গে পুনঃসংযোজনের পর একদিকে মাইমোসিন প্রয়োগ করে কোন সাড়াই পাওয়া যায় নি। এর পরে আরও অনেক গবেষণা-কর্মী লজ্জাবতীর রস থেকে সক্রিয় পদার্থ পৃথকীকরণ এবং তার রাসায়নিক গঠন নিরূপণের জন্য কাজ চালিয়ে গেছেন; কিন্তু এ স্থলে সেসব বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নয়। তবে এই সম্বন্ধে বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মাঝা-মাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত কতকগুলি পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। কয়েকটি পরীক্ষায় কৌতূহল উদ্রেকের ফলে ঐ সময়ে লজ্জাবতী লতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত হয়েছিলাম। প্রথমেই রিকা এবং স্নো-কর্তৃক অনুষ্ঠিত পরীক্ষার অনুরূপ লজ্জাবতী লতার কর্তিতাংশে জলপূর্ণ সূক্ষ্ম কাচনলের সাহায্যে পুনঃসংযোজিত করে তার এক দিকে জলন্ত কাঠির সাহায্যে আঘাত দিয়ে দেখা গেল, মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে ঈষৎ সাড়া দেবার

মতন লক্ষণ দেখিয়েছে। কিন্তু তাতে সময় লেগেছিল ৪০ মিনিট থেকে ২ ঘণ্টারও উপর। একে ঠিক সাড়া দেওয়া বলা যায় না।

লজ্জাবতী লতার ওপর দিকের কর্তিতাংশ ক্ল্যাম্পের উপর বসিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আনবার পর লজ্জাবতীর বোঁটা ও ডাঁটার কর্তিত স্থান থেকে নির্গত রস নিয়ে ক্ল্যাম্পে বসান কাণ্ডের কর্তিত স্থানে প্রয়োগ করেও কোন সাড়া পাওয়া যায় নি।

পৃথক টবে বসান দুটি পৃথক লতার ডগার দিক কেটে দুটির কর্তিত স্থানে পরস্পরের উপর চেপে জুড়ে দেওয়া হল। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবার পর জ্বলন্ত কাঠির ছেঁকা দেওয়া সত্ত্বেও অপর অংশের সাড়া দেবার কোন লক্ষণ দেখা যায় নি।

দুটি কাণ্ডের কর্তিত স্থান দুটি পরস্পরের কাছাকাছি এনে (কয়েক মিলিমিটার দূরত্বে) এক ফোঁটা জল দিয়ে সংযোগ করে দেখা গেছে, তাতেও এক দিকে উত্তেজনার সৃষ্টি করলে অপরদিকে তা পরিচালিত হয় না।

বোঁটা সমেত লজ্জাবতীর দুটি পাতা কেটে নিয়ে জলপূর্ণ সরু একটি U-টিউবের দুই দিকে বসিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবার পর একদিকের পাতায় উত্তাপ প্রয়োগ করতেই পাতাগুলি মুড়ে গিয়ে সাড়া দেয়। কিন্তু অপর পাতাটির মধ্যে কোন পরিবর্তনই দেখা যায় না।

এর পর লজ্জাবতীর পাতা, ডাঁটা ও কাণ্ড থেঁতো করে সংগৃহীত রস কাণ্ডের কর্তিত স্থান এবং বোঁটায় প্রয়োগ করে দেখা গেল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাতা সঙ্কুচিত হয়ে সাড়া দেয়।

কিন্তু কচি আমপাতা, জামরুল ও জামপাতা প্রভৃতির রস প্রয়োগ করবার ফলেও লজ্জাবতীর পাতাগুলি পরিষ্কারভাবে সাড়া দিয়ে থাকে।

লজ্জাবতীর ডাঁটা ও পাতা থেঁতো করে রস থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সর্বশেষ যে-পদার্থ পাওয়া গেল, লজ্জাবতীর সাড়া জাগাতে তাকে খুবই সক্রিয় মনে হল। কর্তিত স্থানে সামান্য একটু রস প্রয়োগ করলেই লজ্জাবতী সঙ্গে সঙ্গে পাতা মুড়ে সাড়া দেয়। জল মিশিয়ে হাল্কা করে প্রয়োগ করলেও সাড়া দেবার ব্যাপারে তার কোন তারতম্য দেখা যায় না। ক্রমশ জল মিশিয়ে ডাইলিউসনের মাত্রা অসম্ভব রূপে বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও দেখা গেল তাতে সাড়া জাগাবার ক্ষমতা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। ভেবে-চিন্তে কোনই হদিস পাওয়া গেল না। অবশেষে মনে হল, অত উঁচু ডাইলিউসনের সক্রিয় পদার্থের পরিবর্তে শুধুমাত্র পরিস্রুত জল প্রয়োগ করতেই পাতাগুলি মুড়ে গিয়ে সাড়া দিল। অসংখ্যবার পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছি, প্রায় ৯০ ভাগ ক্ষেত্রেই জল প্রয়োগে লজ্জাবতী অভ্রান্ত ভাবে সাড়া দিয়ে থাকে। এর পরে লজ্জাবতী লতার সাড়া দেবার রহস্য উদ্‌ঘাটনে হয়তো নতুন করে ভাবতে হবে।

তীর্থযাত্রী

নির্মলকুমার বসু

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ঋষি এবং কবি প্রায় সমার্থবাচক শব্দ। যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা, যাঁহার নিকট প্রকৃতি বা বিশ্বভুবনের মর্ম অনাবৃত হয়, তিনিই ঋষি, তিনিই কবি। বর্তমান জগতে অন্যান্য বিদ্যা অপেক্ষা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। সাধারণ জগৎবাসীর নিকটে বিজ্ঞান অঘটনঘটনপটীয়সী বিদ্যার আকারে সমাদর লাভ করিলেও প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের নিকটে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির সমাদর সম্পূর্ণ অন্য কারণে ঘটিয়া থাকে। মানুষ নানা উপায়ে সত্যলাভ করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বর্তমান জগতে অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বিজ্ঞানী বস্তুজ্ঞানের উপরে বিশেষভাবে নির্ভর করেন, এবং সেই জ্ঞান তিনি বহুবিধ নিরীক্ষণ ও পরীক্ষার সহায়তায় সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, তথ্যের সংগ্রহমাত্র বিজ্ঞান নহে। এমন কি সংগ্রহের মূলেও যদি সজাগ মন এবং তীক্ষ্ণ কল্পনাশক্তির প্রয়োগ না থাকে, তাহা হইলে তথ্য-সংগ্রহের কর্ম ইষ্টকস্তূপ সংগ্রহের মত নিরর্থক হইতে পারে। উৎকৃষ্ট বহু ইষ্টক সংগ্রহ করিলেই তাহা মন্দির হয় না, মন্দিরের গঠন স্বতন্ত্র; অবশ্য উৎকৃষ্ট মন্দির নির্মাণের জন্য উৎকৃষ্ট ইষ্টকের প্রয়োজন হয়।

উপরি-উক্ত ভূমিকা নিবেদন করিবার কারণ হইল, বহু শতাব্দীর দাসত্বের ফলে একপ্রকার দুর্বল মনোভাব আমাদের ভারতবর্ষে বুদ্ধিজীবনের উচ্চতম স্তরে পর্যন্ত যেন কায়েমী হইয়া বসিয়া গিয়াছে। স্বাধীনতা অর্জনের পরেও যেন তাহা ছাড়িয়াও ছাড়িতেছে না। ইউরোপ বা আমেরিকায় বৈজ্ঞানিকগণ সমাজের নানা জীবন্ত সমস্যা লইয়া পর্যালোচনা করেন। শিল্পে, বাণিজ্যে, মনুষ্যসমাজে বহুবিধ সমস্যার উদয় ঘটিয়া থাকে, ওই সকল দেশের বৈজ্ঞানিকগণ ইহার যথাযথ সমাধানের চেষ্টা করিয়া স্বাধীন ও মৌলিক জিজ্ঞাসাকে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। বর্তমান কালে ইউরোপের বহু স্থানে এবং আমেরিকায় পাখির ভাষা, মৌমাছির ভাষা প্রভৃতি লইয়া যেমন সম্পূর্ণ নূতন ধরনের গবেষণাকার্য আরম্ভ হইয়াছে, এমনই মানুষের মনের গূঢ় ক্রিয়াদির বিষয়েও অভিনব উপায়ে নিরীক্ষণ বা পরীক্ষাদির সূচনা দেখা দিয়াছে। ফলে নূতন নূতন অপ্রত্যাশিত সত্যের অধিকার লাভ ঘটিতেছে।

অভাগা ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহই যে মৌলিক, স্বাধীন প্রশ্নের অবতারণা বা পরীক্ষা-পদ্ধতির উদ্ভব করেন নাই, এমন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যাঁহাদের পক্ষে ইহা সত্য তাঁহাদের সংখ্যা ইউরোপের তুলনায় অসম্ভব রকমের অল্প বলিয়া মনে হয়। ভারতের বাহিরে

অপর দেশে কোথায় কে কি কাজের দ্বারা সুনাম অর্জন করিয়াছে, তাহারই ভারতীয় সংস্করণ বা পুনরাবৃত্তির যত নমুনা দেখা যায়, তাহার পর্বতস্তূপের অন্তরালে মৌলিক গবেষণা প্রায় অদৃশ্য হইয়া থাকে। বহুদিনের পরাধীন দেশে এরূপ অনুকরণপ্রিয়তা বা দাসসুলভ মনোভাবের অস্তিত্ব একান্ত অস্বাভাবিক নয়। বিজ্ঞানে যে অনুকরণের স্থান নাই তাহাও নহে; বস্তুত একই পরীক্ষা পৃথিবীর নানা স্থানে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর দ্বারা অনুকৃত হইলে তবেই আমরা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারি। কিন্তু যে কথা আমাদের বারংবার স্মরণ রাখা কর্তব্য তাহা এই যে, বিজ্ঞানী নিজের পারিপার্শ্বিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন এবং যদি কোন সমস্যা জীবনের স্তর হইতে উদ্ভূত না হইয়া থাকে তবে তাহার সমাধান বহুক্ষেত্রে নিষ্ফল অনুকরণে পর্যবসিত হয়।

মানুষের মুক্তি হয় মনে এবং মুক্ত অথবা মুক্তিকামী মন লইয়া যখন বিজ্ঞান-সেবী নিজের চারিপার্শ্বে পর্যবেক্ষণ করেন তখন তাঁহার মনে হয়তো এমনই সকল প্রশ্নের উদয় হয় যাহার উত্তর সন্ধান করিতে গিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক সত্যের সম্পূর্ণ নূতন দুয়ার উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন। আমাদের দেশে যে স্বল্পসংখ্যক বৈজ্ঞানিক এই পথে যাত্রা করিয়াছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

তিনি প্রথমে পদার্থবিদ্যা অধিকার করেন। কিন্তু সেই পদার্থবিদ্যার মধ্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের গতি সম্বন্ধে এমন সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন এবং তাহার উত্তর সংগ্রহ করিতে গিয়া এমন বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করিলেন যে, একদিক দিয়া বলিতে গেলে জগতের প্রথম বেতার-বার্তাবহ যন্ত্র তাঁহারই উদ্ভাবনী শক্তির বলে নির্মিত হইল।

বিজ্ঞানে যাঁহারা উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত এমন কি, জীববিজ্ঞান প্রভৃতির মত আপাতপৃথক শাস্ত্রের ব্যবধান উত্তরোত্তরই মুছিয়া যায়। আচার্য জগদীশচন্দ্র জীবনব্যাপী অনুসন্ধানের দ্বারা উদ্ভিদ এবং প্রাণী, এমন কি, জীব ও জড়ের মধ্যে সীমারেখা সত্য সত্যই নির্ধারণ করা যায় কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, কয়েকজন সুদক্ষ বাঙালী কারিগরের সাহায্যে তিনি এমনই সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণ করিতে সক্ষম হইলেন, যাহার দ্বারা উদ্ভিদের জীবনের গতি বা হৃদয়-স্পন্দন আমাদের নিকট আলোকরেখার গতির আকারে বা উদ্ভিদের নিজের লিখিত বিন্দুসমষ্টির রূপ ধরিয়া হস্তলিপির মত প্রতিভাত হইল।

যন্ত্রের উদ্ভাবনে তাঁহার যেমন মৌলিকতা দেখা যায়, চিন্তার রাজ্যে ভয়শূন্য মনে নূতন নূতন দুঃসাধ্য বা প্রায় অসম্ভব প্রশ্নের উত্তর সন্ধানেও তাঁহাকে তেমনই লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়। মনে উত্থিত কোন প্রশ্নকেই তিনি হেলায় ফেলিয়া দিতে চাহিতেন না। দুর্গম পথে নূতনতর সন্ধানে যাত্রা করা তাঁহার নিকট যেন চিত্তের আমোদ যোগাইত।

বৈজ্ঞানিকের জাতি নাই, ইহা সচরাচর আমাদের ধারণা। কিন্তু বিজ্ঞানীও তো মানুষ, এবং যাহাকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ "স্থানীয়তা' বলিয়াছেন, সেই স্থানীয়তা গুণ বৈজ্ঞানিকের মনকেও যে সমৃদ্ধ করিতে পারে ইহা মনে না করিবার কোন হেতু নাই। যে জগদীশচন্দ্র পদার্থবিদ্যার মত সংস্কার-বিহীন শাস্ত্রের সাধনায় রত ছিলেন, তাঁহার আরও একটি দিক ছিল।

রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের পরম বন্ধু ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাও জগদীশ-চন্দ্রের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর একজন বিশিষ্ট সভ্যা ছিলেন। এবং ইঁহারা দুই জনেই ভারতীয় সংস্কৃতির যে দুই বিশিষ্ট স্রোতোধারাতে অবগাহন করিয়াছিলেন, জগদীশচন্দ্র তাঁহাদের সঙ্গগুণেই হউক অথবা স্বীয় স্বাধীন ভারতপ্রেমের বশেই হউক ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সেই বহুমুখী স্রোতোধারায় অবগাহন করিয়া শুদ্ধ, সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন। উপনিষদে যে-বাণী মুখরিত হইয়াছে, যাহার মূল তথ্য হইল ইহাই যে 'সেই একই বহু হইয়াছেন', জগদীশচন্দ্র স্বীয় বিজ্ঞান-সাধনার মধ্যে নিরীক্ষণ এবং পরীক্ষার দ্বারা জড়ে ও জীব-উদ্ভিদে এবং প্রাণি-জগতে তাহারই সত্যতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজ্ঞান স্থানীয়তা গুণে সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিল।

ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, আচার্য জগদীশচন্দ্র সত্যকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জড় ও জীবের সম্পর্কে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বিষয়ে এমন সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন যাহার মৌলিকতা বিস্ময়কর এবং যে-কারণে তাঁহাকে ইউরোপের বিজ্ঞানজগৎ দ্রুত সম্মানের আসন দান করিতে ইতস্তত করে নাই।

ভারতীয় সংস্কৃতির যে গূঢ়তত্ত্বে জগদীশচন্দ্র অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সঞ্চয়ের একটি উপায় তাঁহার ছিল তীর্থদর্শন। যৌবনে বিবাহের কিছুকাল পর হইতেই তিনি ভারতের তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া-ছিলেন এবং তাহার ফলে উত্তরোত্তর তাঁহার অন্তরে গভীর হইতে গভীরতর উপলব্ধি এই স্বকীয়তা গুণে সমৃদ্ধশালী হয়।

মানুষকে তিনি প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। হয়তো সেই কারণে প্রকৃতি তাঁহার নিকট অপরাপর সকল তীর্থ অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিল। কাশ্মীর অথবা নৈনীতালের পর্বত ও হিমনদী দর্শন অথবা মায়াবতী বা কেদার-বদরীর যাত্রা তাঁহাকে যে-ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহার তুলনা হয় না। আচার্যের হৃদয়মন্দিরে হিমালয়ের জন্য একটি পবিত্রতম স্থান নির্দিষ্ট ছিল। দার্জিলিঙেই হউক অথবা অন্যত্রই হউক, তিনি এক এক বার প্রকৃতির রূপে, তাহার বিশালতায় অবগাহন করিয়া চিত্তের মধ্যে প্রশান্তি লাভ করিয়া আসিতেন।

কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নানা ভাষাভাষী, ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে অগণিত তীর্থযাত্রী একই সৌন্দর্য ও একই মন্ত্রের কেদারবদরীর পথে চলিয়া

প্রবাহশীল এক অবিভক্ত নরস্রোতের যে-আকার ধারণ করে, সেই মানবতীর্থে প্রকৃতির প্রিয়রূপ ভাগীরথীর মতই আচার্যের নিকট অপর এক আধ্যাত্মিক লোকের দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া দিত। সমগ্র ভারতবর্ষ সমগ্রতার বা অখণ্ডতার রূপ লইয়া এক নূতনভাবে তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিত।

মানুষের প্রতি আকর্ষণের মূলে জগদীশচন্দ্রের মনে অবস্থিত মানবীয়তার ভাবও অনেকাংশে দায়ী। হিন্দুধর্মের আনুষ্ঠানিক আচারের ভারে মানবীয়তা বহুলাংশে নিষ্পেষিত হইয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের মধ্যে আমরা তাহা শুদ্ধতর এবং স্পষ্টতর রূপে অবলোকন করিতে পারি। বুদ্ধের করুণা এবং মৈত্রী, তাঁহার সত্যলাভের জন্য দুর্জয় তপস্যার আকর্ষণ যত সহজে মানুষের চিত্তকে স্পর্শ করে হিন্দুধর্মের মরমিয়া সাধনা তত সহজে সাধারণ মানুষের চিত্তকে হয়তো আকর্ষণ করে না। আচার্য জগদীশচন্দ্র শুধু যে বুদ্ধদেবের সিদ্ধিলাভের ভূমি বজ্রাসনের অধিষ্ঠান বুদ্ধগয়ায় যাত্রা করিয়াছিলেন তাহা নহে, যে-রাজগৃহের সহিত বুদ্ধের জীবন-কাহিনী অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সেখানেও গমন করিয়াছিলেন।

হিন্দুর পূজা ব্যক্তিগত ব্যাপার। সংঘ বলিতে বৌদ্ধধর্ম যাহা বুঝায়, উত্তরকালে হিন্দুধর্মের সংগঠনে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান রচিত হইলেও বৌদ্ধ ইতিহাসেই তাহার সমধিক প্রকাশ পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির পশ্চিমাঞ্চলে কার্লি, অজন্তা, কেনহেরি প্রভৃতি স্থানেও যেমন আচার্যদেব আকৃষ্ট হন, বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশীলা বা নালন্দার প্রতিও তাঁহার আকর্ষণ তেমনই সহজ-বোধ্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। ভগবান বুদ্ধের ধর্মসংগঠনের আকর্ষণে জগদীশ-চন্দ্র বিভিন্ন কালে সাঁচী হইতে সিংহল পর্যন্ত যাত্রা করিয়াছিলেন।

সংস্কারকামী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে গুরু নানক এবং শিখধর্মও তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। বিহারে অবস্থিত গুরুগোবিন্দ সিংহের জন্মস্থান যেমন তিনি দর্শন করেন তেমনই লাহোর ও অমৃতসরে গমন করিয়া অন্য শিখ-গুরুগণের দ্বারা পবিত্রীকৃত ভূমিও তিনি স্পর্শ করিয়া আসেন।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, সংস্কারবাদী হইয়াও আচার্য জগদীশচন্দ্র হিন্দুধর্মের মন্দিরকে উপেক্ষা করেন নাই। পুরী, কোনারক বা ভুবনেশ্বরে অথবা বোম্বাই শহরের অনতিদূরবর্তী এলিফ্যাণ্টা দ্বীপে অবস্থিত অপরূপ ভাস্কর্য এবং ইলোরার স্থাপত্য হয়তো শুধু শিল্পগুণেই তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকিবে, কিন্তু অন্যান্য এমন বহু তীর্থই তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন যেখানে তাঁহার সংস্কারবাদী শিক্ষিত আধুনিক মন কুসংস্কার বা আচারের আতিশয্যে হয়তো বিরক্ত হইবার কথা। নর্মদা তীরে মান্ধাতার ওংকারেশ্বরের মন্দিরে নিজের সৌন্দর্য বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু স্থানটি পরম রমণীয়। কিন্তু তাঞ্জোর, মাদুরা, শ্রীরঙ্গম প্রভৃতি স্থানের সম্পর্কে এ কথা বলা চলে না। মন্দির এ সকল স্থানে সুন্দর সন্দেহ নাই, কিন্তু অলংকারের আতিশয্যে সেগুলি এমনই ভারাক্রান্ত

যে, স্পর্শকাতর মন লইয়া সেখানে রসোপভোগ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। অথচ বিভিন্ন স্থানে আচার্য জগদীশচন্দ্রই এ সকল তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন।

বিচিত্র এই যে, আচার্যের মন হয়তো এমনই উচ্চকোটিতে আরোহণ করিয়াছিল, ভারতের মাটি ও মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজ তাঁহার চিত্তে এমনই এক প্রেমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, কুসংস্কারের স্তূপের দ্বারা পরাহত হইয়া ভারতীয় সাধনার অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান হইতে বিরত হন নাই। পাংশুর দ্বারা আবৃত কাষ্ঠখণ্ড হইতে ধূম উত্থিত হইলে যেমন অন্তর্নিহিত অগ্নির অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়, ভারতের হিন্দু মন্দির ও তীর্থের মধ্যে জগদীশচন্দ্র তেমনই সত্য পদার্থের অস্তিত্বের কিছু প্রমাণ পাইয়া থাকিবেন। এবং সেইজন্যেই অবহেলায় বা অনাদরে সেগুলিকে পরিহার করিয়া শুধু শিল্পরসের সন্ধানও করেন নাই।

কথিত আছে, শ্রীরঙ্গমের মন্দির দর্শনকালে পুরোহিতগণ যখন তাঁহাকে বিমানের অভ্যন্তরে, গম্ভীরায় মূল মূর্তি দর্শনের জন্য আহ্বান করেন তখন জগদীশচন্দ্র তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন, তিনি সনাতনী হিন্দু নহেন, সংস্কারপন্থী হওয়ায় নিষিদ্ধ আচারের দ্বারা তিনি নিয়ম লঙ্ঘনও করিয়াছেন। উত্তরে পুরোহিতগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, মন্দিরের গম্ভীরায় প্রবেশ করিতে বাধা নাই, কেননা তিনি তো সাধু বা সন্ন্যাসী শ্রেণীর লোক।

পুরোহিতরা ঠিক চিনিয়াছিলেন। যে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের শাসনকে স্বীয় কাব্যশক্তির দ্বারা বা ঋষিজনোচিত দৃষ্টিশক্তির বলে গভীরতর ও উজ্জ্বলতর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনিই স্বীয় 'স্থানীয়তা'কে বা ভারতপ্রেমকে আশ্রয় করিয়া আনুষ্ঠানিক সর্ববিধ গণ্ডী এমন ভাবেই লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, অবশেষে ভারতের প্রচলিত ভাষায় 'অনিকেতন' সন্ন্যাসীর ভূমিতে আরোহণ করেন; যখন স্থান এবং কালের ব্যবধান নিরাকৃত হইয়া তাঁহাকে প্রেমে সর্ব মানবের সহিত এক অখণ্ডসূত্রে গ্রথিত করিয়া দেয়, তাহাই আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনব্যাপী সাধনার সর্বোচ্চ বিভূতির প্রকৃষ্টতম প্রমাণ।

[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুমতিক্রমে 'পরিষদ পত্রিকা' হইতে পুনর্মুদ্রিত]

জগদীশচন্দ্রের রচনা

অজিত দত্ত

মনস্বিতার একটি লক্ষণ এই যে, তা এক মহৎ জীবনদর্শনে গিয়ে পরিণতি লাভ করে। এখানে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকের পথ একই। বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্র পদার্থ নিয়ে গবেষণা করতে করতে পদার্থের অতীত এমন এক অতীন্দ্রিয় ভাবজগতের সন্ধান পেয়েছিলেন যে-জগৎ কবির জগৎ ও সাহিত্যিকের জগৎ বলেই সাধারণ মানুষ ধারণা করে থাকে। কবি ও সাহিত্যিকের সঙ্গে অন্তরের ঐক্য উপলব্ধি করেছিলেন বলেই জগদীশচন্দ্র তাঁর 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' প্রবন্ধে বলতে পেরেছিলেন "বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে।...বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের সীমায় পৌছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন।"

কিন্তু কেবল কবিজনোচিত দার্শনিকতা নয়, তাঁর রচনাবলীর এমন একটি গুণ আছে, যা তাদের সাহিত্যরূপে চিহ্নিত করেছে। অবশ্য জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনার সংখ্যা অত্যল্প। একখানি মাত্র গ্রন্থ, 'অব্যক্ত' তাঁর রচনার নিদর্শন রূপে বর্তমান। কিন্তু তাঁর সাহিত্য-কৃতিত্বের সাক্ষীরূপে, আমার মনে হয়, তাঁর পত্রাবলীকেও গণনা করা উচিত। কেননা, রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠিগুলিতে কেবল জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য-প্রীতি ও সাহিত্য-বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাই নয়, সেগুলির মধ্যে তাঁর বাংলা রচনায় এমন একটি সহজ সারল্য ও অন্তরঙ্গ রচনাভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় যা গদ্যলেখক মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষিত।

সত্য বটে, জগদীশচন্দ্র বাল্যাবধি সাহিত্য-সাধনা করেন নি। সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞানের দুরূহ দুর্জ্ঞেয় বহু জিজ্ঞাসায় তাঁর মন এমন পরিপূর্ণ হয়েছিল যে, সাহিত্য রচনার অবকাশ তিনি অল্পই পেয়েছেন। তবু তাঁর 'অব্যক্ত' নামক গ্রন্থে যে-সাহিত্য-কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তা আলোচনার যোগ্য। সাহিত্যের বিশেষ চর্চা না করেও জগদীশচন্দ্র তাঁর যে-কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন তা কেবল-মাত্র আন্তরিক প্রেরণা দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। এ প্রেরণাও তাঁর প্রতিভার একটি লক্ষণ। 'অব্যক্ত' গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ 'হাজির'-এ জগদীশচন্দ্র নিজেই এই প্রেরণার কথা বলেছেন—

"এখন বুঝিতে পারিতেছি, বাহির ছাড়া ভিতর হইতেও হুকুম আসিয়া থাকে।...কোনদিন লিখিতে শিখি নাই, কিন্তু ভিতর হইতে কে যেন আমাকে

শিখাইতে আরম্ভ করিল। তাহারই আজ্ঞায় 'আকাশ-স্পন্দন' ও অদৃশ্য আলোক বিষয়ে লিখিলাম।"

'অব্যক্ত' কুড়িটি প্রবন্ধের সমষ্টি। তার মধ্যে প্রথমটি অবতরণিকা-স্বরূপ, ছয়টি প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা, দুটি উদ্ভিদ-জীবন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা এবং একটি বৈজ্ঞানিক রহস্য। 'মন্ত্রের সাধন', 'বোধন', 'মনন ও করণ'ও 'দীক্ষা' প্রবন্ধগুলি বিজ্ঞানের দুরূহ সাধনায় নিষ্ক্রিয় বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করার প্রেরণাময় প্রবন্ধ। 'হাজির' প্রবন্ধের উল্লেখ পূর্বেই করেছি। বাকি পাঁচটি প্রবন্ধের মধ্যে একটি এক ঐতিহাসিক বীরত্বের বিবরণ, দুটি সাহিত্য সম্মিলনী ও সাহিত্য পরিষদে পঠিত সাহিত্য সম্বন্ধীয় আলোচনা, একটি বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে জগদীশচন্দ্রের নিবেদন ও একটি ভারতীয় নারীর সহজাত মহত্ব ও বর্তমানে নারীর দুর্দশা সম্বন্ধে গভীর সমবেদনাময় ক্ষুদ্র রচনা।

এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রীতির একটি অন্তঃসলিল প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। পরাধীনতার গ্লানি, তৎকালীন বাংলা ও বাঙালীর অবনত অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা এবং ভগ্নোদ্যম অলস বাঙালী যুবককে বৃহত্তর কর্মে উদ্বুদ্ধ করার প্রেরণা জগদীশচন্দ্রের সকল প্রবন্ধেরই মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তৎকালীন মনীষীমাত্রই এই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। কেননা, এ কথা তখন তাঁরা স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে, স্বাধীনতা ভিন্ন প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হতে পারে না।

এই দেশপ্রেম এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস জগদীশচন্দ্রের সকল রচনায় সুস্পষ্ট। যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি কি শুধু পদার্থজগতের বাইরের রূপই দেখলেন? এই বস্তুজগতের অন্তরালে জীবনের যে গভীরতর স্বরূপ প্রচ্ছন্ন তা কি কেবল দার্শনিক ও কবিরই উপলব্ধ? ভাবের দিক থেকে জগদীশচন্দ্রের মধ্যে এই দুই সত্তার যে মিলন সাধিত হয়েছিল তা তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে'র মধ্যে প্রকট। এটি একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ কিন্তু পড়বার সময় যে-কোনো পাঠকের পক্ষে এটিকে ভাবব্যঞ্জনাময় সাহিত্য-প্রবন্ধ বলে ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক।

"নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতিবৃহৎ ভাস্বর জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে, তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগদিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা? এই জটা পৃথিবীব্যাপিণী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত করিতেছে।

শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানসচক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র প্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয়-রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।"

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যা দেখেছিলেন তাকে সাহিত্যরূপে পরিবেশন করার ক্ষমতা জগদীশচন্দ্রের ছিল বলেই তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে রচনা-সৌন্দর্যের জন্যও আমরা শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারি না।

'অব্যক্ত' গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিই বস্তুত জগদীশচন্দ্রের রচনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করে। 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ' আর একটি প্রবন্ধ যা ভাষার স্বচ্ছতায়, প্রকাশের ঋজুতায় ও অলংকরণে সাহিত্যরূপে গণ্য হবার যোগ্য।

"এক মহাশক্তি জগৎ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; প্রতি কণা ইহা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট; এ মুহূর্তে যাহা দেখিতেছি, পরমুহূর্তে ঠিক তাহা আর দেখিব না। বেগবান নদীস্রোত যেরূপ উপলখণ্ডকে বার বার ভাঙ্গিয়া অনবরত তাহাকে নূতন আকার প্রদান করে, এই মহাশক্তিস্রোতও সেইরূপ দৃশ্যজগতকে মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এই স্রোত অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার বিরাম নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই।···

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রতি জীবনে দুইটি অংশ আছে। একটি অজর, অমর; তাহাকে বেষ্টন করিয়া নশ্বর দেহ। এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।"

উপরের উদ্ধৃতিটি কেবলমাত্র বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বব্যাখ্যা নয়, এখানে বিজ্ঞান সাহিত্য ও দর্শন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

'মুকুল'-এ প্রকাশিত ছোটদের জন্য সহজ ভাষায় যে বিজ্ঞানালোচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যেও জগদীশচন্দ্রের রচনা-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। তা ছাড়া, তাঁর রচনা যে তিনি কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি; ইতিহাস, নারীর মহিমা প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়েই প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তাতেই মনে হয় যে, তাঁর রচনায় সাহিত্যগুণ তো ছিলই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনেরও একটি সাহিত্যিক দৃষ্টি ও সাহিত্যিক ঔদার্য ছিল যা বিজ্ঞানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত ছিল।

যে সৌন্দর্য ও রসোপলব্ধি সাহিত্য রচনার প্রেরণাস্বরূপ এবং মনের যে বিশেষ গঠন কবিকে কবি ও শিল্পীকে শিল্পী করে তোলে, জগদীশচন্দ্রের তা সহজাত ছিল। সেজন্য বিজ্ঞান-সাধনায় নিমগ্ন থেকেও এই অসাধারণ পুরুষ রবীন্দ্রনাথের রচনার মহত্ত্ব বহু তথাকথিত সাহিত্যিক ও সমঝদারের আগেই পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁর এই ভিন্ন পথচারী বন্ধুর সাহিত্য-সংবেদনশীল হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় জানতেন বলেই নিজের সকল রচনা এঁকে না দেখিয়ে তৃপ্তি পেতেন না। বিলাত-প্রবাস-কালে কর্মব্যস্ত জগদীশচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের গল্প কবিতা কী আনন্দ, কী প্রেরণা বহন করে নিয়ে যেত, জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলীতে তার বহু পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত দেখবার জন্যে জগদীশচন্দ্রের আগ্রহ

ছিল কী গভীর! একটি চিঠিতে জগদীশচন্দ্র লিখেছেন, "যদি কেহ আপনার কবিতা হইতে বঞ্চিত হয় তাহাদিগকে করুণার পাত্র মনে করি। আর যাহারা আপনার লেখা হইতে জীবন নবীন ও পূর্ণতর করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের আশীর্বচন কি আপনার নিকট পৌছে না? আমি তো কখন কখন আপনার ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত ভুলিয়া যাই। কোন কোন স্বর শুনিয়া মনে হয়, একি একজনের কথা, না, এই দুঃখসুখময় সময়ের অগণিত অশান্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস?" আর একখানি চিঠিতে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন, "তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে আর থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তরজমা এ দেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। ··· এবার যদি তোমার নাম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিব।"

উপরের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে কেবল জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য-প্রীতি নয়, তাঁর রচনার আন্তরিকতা এবং সহজ সাবলীল ভঙ্গিটিরও পরিচয় পাওয়া যায়। বিলাতের নিশ্ছিদ্র কর্মব্যস্ততার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলিই ছিল তাঁর আনন্দ ও প্রেরণাস্বরূপ। এ কথা জগদীশচন্দ্রের চিঠিপত্রে বার বার উল্লিখিত হয়েছে। বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্রের অন্তরের যোগ সাহিত্যের সঙ্গে কত নিবিড় ছিল, এই চিঠিপত্রগুলি তার নিদর্শন।

জগদীশচন্দ্রের কর্মময় জীবন ও রচনা আলোচনা করলে তাঁর তিনটি প্রধান আকর্ষণ অতি স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। এই তিনটি বিজ্ঞান, স্বদেশ ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম, অতি গভীর ভালোবাসা। বিজ্ঞানের সাধনায় যিনি আজন্মকাল বহু দুঃখ ও অশান্তি সহ্য করেছেন, সত্য অন্বেষণে ব্যাঘাত ঘটবে আশঙ্কা করে যিনি ক্রোড়পতি ব্যবসাদারের কাছে বহু মূল্যেও তাঁর যন্ত্রের পেটেণ্ট বিক্রি করতে সম্মত হন নি, তাঁর বিজ্ঞান-প্রেমের কথা আলোচনা করা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রেম ও সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় তাঁর রচনাগুলি না পড়লে পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কি তাঁর চিঠিপত্রে, কি তাঁর রচনায় ও অভিভাষণগুলিতে, একদিকে যেমন গভীর স্বদেশপ্রেম জাজ্বল্যমান, অপর দিকে তেমনই তাঁর সাহিত্য-প্রীতি ও রচনার সৌন্দর্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত।

মনের যে বিশেষ গঠন, ভাব ও ভাবনার যে বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা, ভাষার উপর যে সহজ প্রভুত্ব সাহিত্যিককে সাহিত্যিক করে তোলে, তার কোনটারই অভাব জগদীশচন্দ্রের ছিল না। কিন্তু তিনি সাহিত্যের সেবা অপেক্ষা বিজ্ঞানের সাধনাকেই জীবনের প্রধান কর্তব্য বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। তবু, সেই অতলান্ত সাধনার ফাঁকে তিনি আমাদের জন্য যতটুকু সাহিত্য পরিবেশন করে গিয়েছেন, তার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুমতিক্রমে 'সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা' হইতে পুনর্মুদ্রিত।]

আচার্য জগদীশচন্দ্রকে যেমন দেখেছি

আশুতোষ গুহঠাকুরতা

বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণা ও বিভিন্ন মতবাদ বিবৃত করে তাঁর জীবদ্দশায় ও তিরোধানের পরে বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এস্থলে তাঁর পুনরুক্তি না করে মানুষটিকে খুব কাছে থেকে দীর্ঘ দিন দেখে মনে যে-স্মৃতি অঙ্কিত রয়েছে সে সম্বন্ধেই কিছু বলবার চেষ্টা করব।

সাধারণত বৈজ্ঞানিকের প্রতিষ্ঠা শিক্ষিত সমাজেরও খুব অল্প অংশের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকে; কিন্তু জগদীশচন্দ্র ছিলেন তার ব্যতিক্রম, দেশের জনসমাজের প্রায় সর্বস্তরেই তিনি পরিচিত ছিলেন। ছোটবেলায় দেখেছি, গ্রামের চাষাভূষা শ্রেণীর লোকের কাছেও তিনি অপরিচিত নন এবং তাঁর সম্বন্ধে তাদের মধ্যে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আসার পর দেখেছি শুধু বাংলাদেশেই নয়, অন্য প্রদেশের সাধারণ লোকের স্তরেও তাঁর প্রতিষ্ঠা ব্যাপ্ত হয়েছে। কালীঘাট দর্শনোপলক্ষে অন্য প্রদেশ থেকে যেসব যাত্রীর দল কলকাতায় আসত তাদেরও কলকাতায় অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থানের তালিকায় বসু বিজ্ঞান মন্দির অন্তর্ভুক্ত থাকত এবং এখানে এসে 'গাছের প্রাণ' যে আবিষ্কার করেছেন তাঁর দর্শনের জন্য আকুতি জানাত। তখনকার দিনের ছাত্রসমাজ তাঁকে দেখতে ও তাঁর বক্তৃতা শুনতে অদম্য আগ্রহ প্রকাশ করত এবং তাঁর সান্নিধ্যে আসাকে পরম সৌভাগ্য মনে করত।

আমি বসু বিজ্ঞান মন্দিরে প্রবেশ লাভ করি ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে। তখন আচার্যদেব ৬৭ বৎসরে পদার্পণ করেছেন। বয়স হিসাবে তখন তাঁর মধ্যাহ্নদীপ্তি হ্রাস পাবারই কথা, কিন্তু আমাদের চোখে তা ধরা পড়ে নি। তখনও তাঁর উৎসাহ, উদ্দীপনা, কর্মদক্ষতায় কোনরূপ ভাঁটা পড়েছে মনে হত না।

গৌরবর্ণ, নাতিদীর্ঘ দোহারা গঠন, দেহের তুলনায় মাথাটি বেশ বড়, বুদ্ধিদীপ্ত বিশাল চোখ, ভাবগম্ভীর মুখমণ্ডল, এসব মিলিয়ে তাঁর চেহারায় এমন একটি প্রখর ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট ছিল যে, তাঁর কাছে গেলে আপনা হতেই মাথা নত হয়ে আসত।

ইনস্টিটিউটে তখন একমাত্র উদ্ভিদতত্ত্ব নিয়েই গবেষণা চলত। সমস্ত গবেষণাই তাঁর নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হত। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কাজ চলত। তিনি বারে বারে এসে প্রত্যেকের কাছে গিয়ে কার কিরকম কাজ হচ্ছে দেখতেন। কোন কোন বিশেষ পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করলে তিনি তৎক্ষণাৎ তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে চেষ্টা করতেন এবং কাছে দাঁড়িয়ে পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে পরীক্ষার মধ্যে কোন খুঁত আছে কিনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হয়ে নিতেন। ইনস্টিটিউটের কারখানায় গিয়ে বিশেষ

পর্যবেক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতির যেরূপ পরিবর্তন দরকার সেই ভাবে নির্দেশ দিতেন। এই ভাবে দুপুরে দুই-তিন বারে দুই-তিন ঘণ্টা, বিকালেও ঘণ্টাখানেক ইনস্টিটিউটে কাটাতেন, বাকী সময়ে প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি রচনায় ব্যাপৃত থাকতেন।

১৯২৪ থেকে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বছরে তিনি সেই সময়কার গবেষণা-লব্ধ ফল সংবদ্ধ করে পাঁচখানি বৃহৎ পুস্তক রচনা করেন। পাণ্ডুলিপিগুলি বার বার সংশোধন না করে তাঁর তৃপ্তি হত না। এমন কি, ফাইনাল প্রুফের উপরেও তিনি যথেচ্ছ কলম চালাতেন। পাণ্ডুলিপিগুলি ছাপতে দেবার আগে তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক প্রফেসর ভাইনস্‌কে দেখাবার জন্য পাঠাতেন। বইগুলি ছাপা হয়েছে বিলাতের Longmans Green and Co. থেকে। প্রুফ তিনি নিজে দেখতেন। টাইপ করা, ছবি আঁকা প্রভৃতি কাজ অধিকাংশভাবে ভাগা-ভাগি করে তখনকার গবেষণা কর্মীদেরই করে দিতে হত।

এই সময়ে ইনস্টিটিউটে ভিজিটারের ভিড়ও লেগে থাকত। তখনকার দিনে ভাইসরয়, গভর্নর প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষগণ এবং বিলাত থেকে এসে যাঁরা লাটভবনে অতিথি হতেন, তাঁরা প্রায় সকলেই বসু বিজ্ঞান মন্দির পরিদর্শনে আসতেন। এ ছাড়া, দেশবিদেশের বিজ্ঞানী, রাজা-মহারাজা ও অন্য খ্যাতনামা ব্যক্তিরা কলকাতা আসলে তাঁরাও এখানে আসতেন। বিশিষ্ট ভিজিটারদের জন্য বিশেষ ডিমনস্ট্রেশনের ব্যবস্থা হত। তিনি যৌবনোচিত উৎসাহ নিয়ে তাঁদের সব ব্যাখ্যা করে দেখাতেন, আলাপ-আলোচনা করতেন।

আমি আসার পর ৫/৬ বছর তাঁকে এইরূপ কর্মব্যস্ততার মধ্যেই অতিবাহিত করতে দেখেছি। কাজেই তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন ভাববার অবকাশ জোটে নি। এই সময়ের মধ্যে তিনি দুবার বৈজ্ঞানিক সফরে ইউরোপ গেছেন। সেখানে গিয়ে তাঁর অনুপস্থিতিতে গবেষণার কাজ শ্লথ না হয়, এইজন্য আমাদের প্রত্যেকের কাছে নানারূপ নির্দেশসহ নিয়মিত চিঠি দিতেন। আমাদেরও প্রত্যেক মেইলে কাজের রিপোর্ট পাঠাতে হত। তিনি অত কাজের মধ্যেও সেগুলি যে খুঁটিয়ে পড়তেন পরবর্তী চিঠিতেই তা বুঝা যেত। এইরূপ তিনি যখন দার্জিলিং যেতেন তখনও সপ্তাহে একটা করে রিপোর্ট পাঠাতে হত।

১৯৩০-এর পর থেকে তাঁর কর্মব্যস্ততা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ইনস্টি-টিউটে কম আসতে আরম্ভ করেন। অধিক সময় বাড়িতে বিশ্রাম অথবা পড়াশোনায় অতিবাহিত করতে থাকেন। মনে হত তিনি যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ও বার্ধক্যকে স্বীকার করে নিচ্ছেন। একদিন আমাদের স্পষ্টই বললেন, 'আমি আর পারবো না। তোমাদের এবার নিজেদের ভেবে স্বাধীন-ভাবে কাজ করতে হবে।' এ থেকে ইনস্টিটিউট সম্বন্ধে যে তাঁর ভাবনা ও চিন্তা কমে গিয়েছিল তা মনে করার কারণ নেই। আমরা কে কি করছি সর্বদা খোঁজ নিতেন। প্রয়োজনমত আমরা গেলে আলোচনা করতেন, নতুন কোন পর্যবেক্ষণের কথা জানালে বিশেষ উৎসাহিত হয়ে উঠতেন। আমাদের

গবেষণাপত্রগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতেন ; প্রকাশের উপযুক্ত বিবেচনা করলে সেগুলি সংশোধন করে ইনষ্টিটিউটের ট্রানজ্যাকশনে ছাপতেন। প্রতি বৎসর নিয়মিত সময়ে এই ট্রানজ্যাকশন প্রকাশিত হত, এর ব্যতিক্রম ঘটত না। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনষ্টিটিউট পরিদর্শনে আসলে তখনও তিনি এসে নিজে সঙ্গে করে ঘুরিয়ে দেখাতেন। সক্রিয় গবেষণার ক্ষেত্রে থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিলেও, ইনষ্টিটিউটের পরিচালনার দায়িত্ব থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করেন নি এবং এ দায়িত্ব শেষ দিন পর্যন্ত সুষ্ঠু-ভাবেই পালন করে গেছেন।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং পাশ্চাত্য দেশে সেই সভ্যতার বাহকরূপে নিজের পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। বিজ্ঞান-মন্দির রচনায়ও তিনি সেই প্রাচীন আদর্শেরই অনুবর্তী হয়েছিলেন। নালন্দা-তক্ষশীলার ঐতিহ্য বহন করে চলবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরগৃহ নির্মাণেও তিনি নালন্দার স্থাপত্য-রীতি অনুসরণ করেন। মন্দির-গৃহসজ্জায় সংযোজিত হয় নানা মহলীয় প্রাচীন আর্দশের প্রতীক। প্রাচীরগাত্রে গ্রথিত হয়েছে আমলকের চিহ্ন। মন্দিরশীর্ষে স্থাপন করেন পতাকারূপে বজ্র—যে-বজ্র মহাষ দধীচির হোমাগ্নিপূত অস্থিদ্বারা নির্মিত, মহান ত্যাগের প্রতীক। তিনি বহিরাগত পরিদর্শকদের কাছে এই সব প্রতীকের তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করতেন।

বিজ্ঞান-মন্দির রূপায়ণে ও তৎসংলগ্ন উদ্যান রচনায়, তিনি যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অন্তরালে একটি শিল্পীমন সযত্নে লালন করতেন তা প্রকাশ পেয়েছে। উদ্যানের স্থানে স্থানে কৃত্রিম পাহাড়, ঝর্ণা, নদী, হ্রদ কোথাও বা পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র সেতু এবং পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন উদ্ভিদের দ্বারা সজ্জিত করে নানা রম্যদৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। কোথাও কোন অসামঞ্জস্য তাঁর নজরে আসলে তখনই তা পরিবর্তনের আদেশ দিতেন। উদ্যানের কোথাও বা গাছের ওপর একটি ঘর বা মঞ্চ। হরিণ, ময়ুর, সারস ও অন্যান্য নানারূপ পাখি রাখার নানা ব্যবস্থা—এই সব মিলিয়ে সেখানে একটি তপোবনের পরিবেশই সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমানে ইনষ্টিটিউটে স্থানে স্থানে বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণের প্রয়োজন হওয়ায় সে সবের অনেকাংশই অন্তর্হিত হয়েছে।

ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা দিবস ৩০-এ নভেম্বর তিনি একটি বক্তৃতা দিতেন। বিজ্ঞানের বক্তৃতায় এরকম আকর্ষণ আর কখনও দেখি নাই। টিকেট কিনে এই বক্তৃতা শুনতে হত। তার মধ্যে হাজার টাকা পাঁচশো টাকা মূল্যের কয়েকখানি টিকিটও ছিল। ছাত্রদের টিকেটের মূল্য ছিল আট আনা করে। কয়েক দিনের মধ্যেই সব টিকেট শেষ হয়ে যেত। বক্তৃতাকক্ষে যত লোক ধরত অনুরোধ-উপরোধে তার চেয়েও বেশী টিকেটই বিক্রয় করতে হত। তার

পরেও দশ-বারো হাজার লোক রাস্তায় ভিড় করে ঢোকবার চেষ্টা করত। গেট আগলাবার জন্য পুলিন দাস, বিষ্টু ঘোষের দল রাখতে হত।

তাঁর বক্তৃতার বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি খুব কঠিন বিষয়কে সহজবোধ্য করে সাধারণ শ্রোতারও উপলব্ধিতে এনে দিতে পারতেন। মঞ্চের উপর ডিমনস্ট্রেশনের জন্য তাঁর নিজ উদ্ভাবিত বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে নানা এক্স-পেরিমেণ্ট সাজান থাকত। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি খুব সুন্দরভাবে দেখাবার ব্যবস্থার ফলে, বক্তৃতার বিষয়বস্তু বোধগম্য হওয়ার পক্ষে আরও সহজ হত। এজন্যেই তাঁর বক্তৃতা এত আকর্ষণীয় ছিল। বক্তৃতা তিনি খুব যত্ন করে তৈয়ারি করতেন। আনুষঙ্গিক এক্সপেরিমেণ্টগুলিও আগে থেকে এমনভাবে রপ্ত করা হত যাতে নিশ্চিত সাফল্যের সঙ্গে সেগুলি দর্শকের সামনে সম্পাদিত হতে পারে ও কোনরূপ ত্রুটি না ঘটে।

তিনি যখন আলো-আঁধারির মধ্যে আস্তে আস্তে এসে বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করতেন তখন যেন সমস্ত কক্ষ সম্মোহিত হয়ে পড়ত। এত নিস্তব্ধ হয়ে যেত, মনে হত যেন সেখানে একটি পিন পড়লেও তার শব্দ শোনা যাবে। তিনি যে চেঁচিয়ে বক্তৃতা করতেন এমন নয়। তখন মাইকের ব্যবহার হত না। কিন্তু বৃহৎ বক্তৃতা কক্ষের শেষ প্রান্ত হতেও তাঁর বক্তৃতা খুব স্পষ্টভাবেই শোনা যেত। এ বিষয়েও তিনি আগে থেকেই নিঃসংশয় হয়ে নিতেন।

ইনস্টিটিউটের খরচপত্র ও হিসাবরক্ষার ভার তখনকার সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট অবনীনাথ মিত্রের উপর ন্যস্ত ছিল। ইনস্টিটিউটের ব্যয়ভার যথাসম্ভব অল্প টাকায় নির্বাহের নির্দেশই তাঁকে দেওয়া থাকত। এজন্য অনেক সময় তাঁকে ব্যয়কুণ্ঠ মনে হয়েছে। তিনি তখন এখানকার ব্যয়সংক্ষেপ করে একটি স্থায়ী তহবিল গঠনের দিকেই অধিক যত্নবান ছিলেন। কর্মীদের মাসিক ভাতার পরিমাণ সে সময়ের তুলনায়ও খুব কম ছিল। এ নিয়ে তাদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল না এমন নয়। কিন্তু এ বিষয়ে আচার্যদেবকে বিব্রত করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করত। বিশেষ করে সময় সময় তিনি যখন নিজেই বলতেন 'তোমাদের এখন কষ্ট হচ্ছে জানি, ভবিষ্যতে তোমরা যাতে এখানে স্বচ্ছন্দে গবেষণা চালিয়ে যেতে পার আমি সে ব্যবস্থাই করে যাচ্ছি,' তখন কর্মীদের বলার কিছু থাকত না। তারা শান্ত থাকত।

আচার্যদেবের কঠোরতা আচার্য-গৃহিণীর স্নেহস্পর্শেই অনেক পরিমাণে প্রশমিত হত। তিনি এখানকার কর্মীদের মায়ের মতন স্নেহ করতেন, এ তারা অনুভব করত। নানা উপলক্ষে তিনি আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে ভূরিভোজ করাতেন। আমাদের টিফিন ক্লাবেও প্রায়ই নানা সুখাদ্য পাঠিয়ে দিতেন। আচার্যদেবের নিজেরও এ বিষয়ে খুব উৎসাহ ছিল। কোন ভালো রেজাল্ট পেলেই তিনি বলতেন, 'লেডি বোসকে বলে এসো তোমাদের একদিন খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে।' খাওয়াবার সময় নিজে এসে

দেখতেন। 'ও অনেক খেতে পারে, ওকে আরও দাও' বলে তদারক করতেন।

অনমনীয় দৃঢ়তা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি যে সঙ্কল্প গ্রহণ করতেন, সেখান থেকে তাঁকে নড়ান কঠিন ছিল। ইনস্টিটিউটে আমার যোগদানের কয়েক মাস পরেই তদানীন্তন বড়লাট বাহাদুর লর্ড রিডিং ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের প্রাক্কালে কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ পূর্ণ লাহিড়ী মহাশয়কে ইনস্টিটিউটের মধ্যে নিরাপত্তামূলক পুলিশী-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য জগদীশচন্দ্রের কাছে পাঠান। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন ইনস্টিটিউটের মধ্যে তিনি এ ব্যাপারে কোন পুলিশ ঢুকতে দেবেন না। তারা ইচ্ছা করলে ইনস্টিটিউটের বাইরে থাকতে পারে। ইনস্টিটিউটের ভিতরে তিনিই ভাইসরয়ের নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকবেন। টেগার্ট নিজে এসে বুঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি অনড়। তিনি বললেন, এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করলে পরিদর্শন বন্ধ করে দেবার জন্য বড়লাট বাহাদুরের কাছে তিনি অনুরোধ জানাতে বাধ্য হবেন। টেগার্ট তখন অনুপায় হয়ে বললেন, তিনি কখনও ইনস্টিটিউট দেখেন নি, তাঁকে অন্তত সঙ্গে আসার অনুমতি দেওয়া হোক। তার উত্তরে তিনি বললেন যে, এবার বড়লাটের সঙ্গে তাঁকে তিনি পরিদর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করতে অক্ষম, ইচ্ছা করলে তিনি পরে স্বতন্ত্রভাবে একদিন এখানে আসতে পারেন। টেগার্টকে শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়েই ফিরতে হল। তিনি আমাদের সতর্ক করে দিলেন। পশ্চিম দিকের দেয়ালের দিকে আমরা যেন নজর রাখি, পুলিশ আমাদের অপদস্থ করবার জন্য তাদের সাকরেদ দিয়ে ঢিল ফেলতে পারে। নজর রাখবার জন্য ঐদিকে দুজন মালিকে মোতায়েন করা হল।

ইনস্টিটিউটের ভিতরে পুলিশী-ব্যবস্থা ছাড়াই লর্ড রিডিং তাঁর কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য ও তদানীন্তন সেনাধ্যক্ষকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। আমরা গেইটের কাছে আচার্যের পেছনে জড় হয়েছিলাম। তিনি এগিয়ে গিয়ে করমর্দন করে সবাইকে ভিতরে নিয়ে এলেন। আমরা অভিবাদন জানিয়ে যে যার নির্দিষ্ট স্থানে চলে গেলাম। ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন স্থানে ডিমনস্ট্রেশনের ব্যবস্থা হয়েছিল। তিনি একে একে আমাদের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অতবড় লোকের সঙ্গে এই প্রথম করমর্দন করে এবং আমাদের তাঁর উৎসাহব্যঞ্জক কথা শুনে মনে মনে উল্লাস বোধ করছিলাম বৈকি! কিন্তু যা আমাদের সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল সেটি হচ্ছে এই শীর্ষ রাজ-পুরুষের সঙ্গে আচার্যদেবের সমপর্যায়ের বন্ধুর মত ব্যবহার। ইতিপূর্বে এইসব রাজপুরুষদের সঙ্গে আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একত্রে যেসব ছবি চোখে পড়েছে, সে ক্ষেত্রে এক পক্ষের গর্বিত ভাব ও অপর পক্ষের একটু হীনম্মন্যতার ভাবই যেন লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমই চোখে পড়ল।

তিনি শুধু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই ব্যাখ্যা করে বুঝাচ্ছিলেন এমন নয়, ফাঁকে ফাঁকে শাসন-ব্যবস্থায় নানা ত্রুটি ও কুফল সম্বন্ধে অনুযোগ করে নিজের মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে চলেছিলেন। মনে হয়েছিল যেন অতবড় ধুরন্ধর ইংরেজ তাঁর ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। মুখে কোন প্রতিবাদের ভাষা যোগাচ্ছে না। নত মস্তকে সব স্বীকার করে নিচ্ছেন। এর পরে লর্ড আরউইন প্রভৃতি আরও অনেকে এসেছেন। সব ক্ষেত্রেই আচার্যদেবের ব্যক্তিত্বে তাঁদের অভিভূত হয়ে পড়তে দেখেছি। মাথা উঁচু করে কোন প্রতিবাদ করতে দেখি নি। নত মস্তকে তাঁর কঠিন সমালোচনা শুনে গেছেন।

তিনি কখনও সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেছেন বলে জানা নেই। তবে দেশের নানারূপ রাজনৈতিক সমস্যা ও সেই সময়কার নানা আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন এরূপ মনে করা সঙ্গত হবে না। সর্বসাধারণের কাছে ব্যক্ত না করলেও এসব সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতামত নিশ্চয়ই ছিল। শুনেছি, মহামতি গোখেলের মত বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিও জগদীশচন্দ্রের রাজনৈতিক মতামতের উপর বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আমরা দেখেছি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের খ্যাতনামা নেতারা কলকাতায় এলে একবার ইনস্টিটিউট ঘুরে যেতেন। অবশ্য তাঁরা ইনস্টিটিউট দেখবার উদ্দেশ্যে আসতেন না, আসতেন জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে। কি আলাপ-আলোচনা হত তা অবশ্য আমাদের জানবার উপায় ছিল না।

গান্ধীজী প্রথমে কলকাতায় এসে কিছুদিন জগদীশচন্দ্রের অতিথি হয়েছিলেন। গান্ধীজী তখনও দেশে তেমন পরিচিত হয়ে উঠেন নি। গোখেলের মাধ্যমেই উভয়ের পরিচয় ঘটে। শুনেছি সেই সময়কার আলোচনায় কোন কোন বিষয়ে উভয়ে একমত হতে পারেন নি। বিশেষ করে সমস্ত কল-কারখানা বন্ধ করে শুধু চরকার উপর নির্ভর করে দেশের উন্নতি সাধন, হয়তো জগদীশচন্দ্র মেনে নিতে পারেন নি। তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাদের কাছে বলেছিলেন, 'পা দিয়ে যা করতে পারা যায়, আমি হাত দিয়ে তা করতে যাব কেন?' হয়তো সেইসব আলোচনার সূত্র ধরেই তিনি ঐরূপ বলে থাকবেন।

উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য ঘটলেও গান্ধীজীর উপর তাঁর কিছু প্রভাব ছিল, সেটা আমরা জানলাম শ্রীযুক্ত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটি বক্তৃতা শুনে। জগদীশচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকীতে ইনস্টিটিউটে আহূত হয়ে তিনি বক্তৃতায় একটি অপ্রকাশিত ঘটনার উল্লেখ করলেন। একসময় কতিপয় প্রভাবশালী নেতার চাপে গান্ধীজী জাতীয় সঙ্গীতরূপে 'বন্দে মাতরম্'-কে বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নেহেরুজী সুভাষচন্দ্রকে জানালেন, 'কংগ্রেসের আসন্ন বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গৃহীত হতে চলেছে। এখন একমাত্র জগদীশচন্দ্র যদি গান্ধীজীকে এ বিষয়ে একখানা পত্র দেন তবেই এটার রোধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।' সুভাষচন্দ্র শ্রীযুক্ত লেডি বোসের সঙ্গে দেখা করে এ কথা জানালেন।

লেডি বোস তাঁকে আশ্বাস দেন যে, জগদীশচন্দ্রকে দিয়ে তিনি চিঠি দেওয়াবেন। তারপরে জগদীশচন্দ্র চিঠি দিয়েছিলেন কিনা বা কি লিখেছিলেন, তা তিনি কিছু বলতে পারলেন না। তবে দেখা গেল কংগ্রেসের বৈঠকে সেই রিজলিউশন আর তোলা হয় নি।

জগদীশচন্দ্রের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি কিরূপ সুদূরপ্রসারী ছিল, সে পরিচয় আমাদেরও একবার পাবার সৌভাগ্য হয়েছে। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে ইউরোপ সফর থেকে ফিরে এসে কথাপ্রসঙ্গে আমাদের কাছে বললেন, 'চার্চিল ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হবে, এবং তখনই ভারতের মুক্তির সম্ভাবনা দেখা দিবে।' চার্চিল তখন বিলাতের কনজারভেটিভ পার্টির একজন উদীয়মান নেতা ঠিকই, তবে তিনি ভবিষ্যতে বিলাতের প্রধানমন্ত্রীর পদ অধিকার করতে পারেন, সেই সম্ভাবনার কথা তখন কারো মনে উদয় হবার কারণ ঘটে নি। ইংরেজের উপনিবেশগুলিতে শাসনব্যবস্থা আরো কঠোর করে পদানত রাখার সপক্ষে তিনি তখন গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। তিনি সেসব পড়ে এসেছেন। 'ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে রে!' মনে হয় কবির সঙ্গে তিনিও এ বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন। ইতিহাস তাঁর সে দিনের ভবিষ্যৎ-বাণীর সত্যতা প্রমাণ করেছে।

আমাদের দেশের তখনকার দিনের মডারেট ও লিবারেল পার্টির আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির ওপর তাঁর মোটেই শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁদের সম্বন্ধে শ্লেষাত্মক মন্তব্য আমাদের সামনেও তাঁকে করতে শুনেছি।

চরমপন্থীদের ওপর তাঁর একটা সহানুভূতি লক্ষ্য করেছি। একদিন ইনস্টিটিউটে একজন পদপ্রার্থীর নিয়োগের ব্যাপারে প্রোফেসর নাগ এসে জানালেন, 'ছেলেটি ভালো তবে রাজনৈতিক কারণে কিছুদিন জেলে ছিল।' তিনি শুধু মাত্র বললেন, 'ওকেই নেও, ওর ভিতর কিছু আছে বলেই তো ও এগিয়ে গিয়েছিল।'

পুলিনচন্দ্র দাস মহাশয় আন্দামান থেকে মুক্তি পাবার পর আর্থিক কষ্টে দিনযাপন করছিলেন। তিনি জানতে পেরে পুলিনবাবুকে ডেকে লাঠি ও ছোরাখেলা শেখাবার জন্য একটি মাসিক ভাতায় নিয়োগ করেন। আমাদের বলে দিলেন, 'প্রত্যেকে বিকালে লাঠি খেলবে, এতে স্বাস্থ্য ভালো হবে এবং গবেষণার কাজে উৎসাহ বাড়বে। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়েও এরূপ একটা ব্যবস্থা করেছিলেন।

আমরা কয়েকজন খুব যত্ন করেই পুলিনবাবুর কাছে লাঠি ও ছোরাখেলা শিখেছিলাম। তিনি মাঝে মাঝে এসে আমাদের উৎসাহ দিতেন। তখনকার দিনে বিশিষ্ট পরিদর্শকের ক্ষেত্রে, ইনস্টিটিউট পরিদর্শন-সূচীর শেষ অঙ্কে আমার ও আমার সহকর্মী বিনয়কৃষ্ণ দত্তের লাঠি ও ছোরাখেলা দেখানো প্রায় রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল।

এই সময় একদিন টেগার্ট সাহেব ইনস্টিটিউট দেখতে এলেন। তিনি বিকালের দিকে আসেন। আমাদের কারো কারো রাজনৈতিক কারণে পুলিশের খাতায় নাম ছিল। পুলিনবাবু আমাদের লাঠিখেলা শেখান। এসব তাঁর না জানা থাকার কথা নয়। ইনস্টিটিউট দেখবার ছুতো করে নিজের চোখে এসব দেখে যাবার উদ্দেশ্যই হয়তো ছিল। তাঁর জন্য কোন ডিমনস্ট্রেশনের ব্যবস্থা হয় নি। জগদীশচন্দ্র টেগার্ট সাহেবকে সেখানে নিয়ে এলেন। রসিকতা করে বললেন, 'তুমি ওরকম ভাবে তাকাচ্ছ কেন? তোমাদের পুলিশের চোখ বড় খারাপ। এরা সব ভালো ছেলে।' পুলিনবাবুকে দেখিয়ে বললেন, 'ওকে চেন নিশ্চয়ই! তোমাদের দেশে জন্মালে, ইনি হয়তো একজন মস্ত বড় জেনারেল হতেন। নিজের দেশকে ভালোবাসেন বলে তাঁকে তোমাদের হাতে অনেক নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে।' টেগার্ট চুপ করে ছিলেন। মুখে মৃদু হাসি দেখা যাচ্ছিল।

আচার্যদেবকে আমরা সর্বদাই ধোপদুরস্ত সুবেশে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। গ্রীষ্মের সময় কোঁচান সাদা ধুতি ও পাশে বোতাম লাগান খুব মিহি আদ্দির বা সিল্কের পাঞ্জাবী পরতেন। শীতকালে ট্রাউজার ও গলাবন্ধ কোট, মনে হত তিনি যতবার ইনস্টিটিউটে আসতেন প্রত্যেক বারই সদ্য পাট ভাঙা জামা-কাপড় পরে আসতেন। তাঁর বাসগৃহ ও ইনস্টিটিউটের মধ্যে কোন পর্দা ছিল না। আমাদের প্রয়োজন হলে যখন তখন অনুমতির অপেক্ষা না করে তাঁর কাছে চলে যেতাম, তিনিও ডেকে পাঠাতেন। বাড়িতেও তাঁকে সর্বদা ঐরূপ পোশাকেই সজ্জিত দেখতাম। শুধু পোশাক-পরিচ্ছদে নয়, তিনি কোনরূপ অপরিচ্ছন্নতা পছন্দ করতেন না। ল্যাবোরেটারিতেও কোনরূপ অপরিচ্ছন্নতা দেখলে বা কোন কিছু অগোছালো দেখলে রাগ করতেন। বাড়িও সর্বদাই খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখেছি। আসবাবের বাহুল্য ছিল না। যেখানে যেটি প্রয়োজন বা মানানসই সেভাবেই বাড়ি সজ্জিত ছিল। তাঁর ড্রইংরুম অতি সুরুচি-সম্পন্ন প্রাচ্য আদর্শে সজ্জিত থাকত। কোন বিলাতী ছাপ সেখানে ছিল না।

তিনি ধূমপানে খুব অভ্যস্ত ছিলেন। সর্বদাই হাতে সিগারেট থাকত। মধ্যমা ও তর্জনী আঙুলের মধ্যে পাটকিলে বর্ণের দাগ হয়ে গিয়েছিল। কখন সিগারেট পুড়তে পুড়তে শেষ হয়ে আসছে খেয়াল থাকত না। শেষের দিকে ডাক্তাররা তাঁকে ধূমপান কমিয়ে দেবার নির্দেশ দেন। দিনে মাত্র ২/৩টি সিগারেট বরাদ্দ হয়। লেডি বোসের কড়া ব্যবস্থায় কিছুদিন এইভাবে চলত। কিছুদিন বাদেই তিনি লেডি বোসের চোখের অন্তরালে বাড়ির কোন স্থানে গিয়ে সিগারেট খেতে আরম্ভ করতেন। সেই সময় হঠাৎ আমরা গিয়ে পড়লে তিনি খুব অপ্রস্তুত বোধ করতেন এবং ছেলেমানুষের মতো সিগারেটটি পেছনে লুকিয়ে ফেলে, অন্য হাত তুলে আমাদের অন্যত্র অপেক্ষা করতে বলতেন। আমরা এ ব্যাপারে খুব কৌতুক অনুভব করতাম। তিনি সিগারেটটি শেষ করে

আমাদের সঙ্গে এসে কথা বলতেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি আবার স্বঅভ্যাসে ফিরে আসতেন। তখন আর লজ্জা থাকত না। কয়েক বারই সিগারেট খাওয়ার বিরতি ও পুনরারম্ভের সময় ঐরূপ কৌতুকপূর্ণ ব্যবহার লক্ষ্য করেছি।

তিনি ব্রাহ্ম সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। কোনরূপ ধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁর মধ্যে দেখতে পাই নি। ভবানীপুর সম্মিলন সমাজে তাঁকে আমার কয়েকবার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। সেখানে উপাসনাকালে মঞ্চের পার্শ্বে স্বতন্ত্র চেয়ারে সমাহিত অবস্থায় উপবিষ্ট থাকতে দেখেছি। তাঁর দিকে সকলেরই দৃষ্টি আর্কষিত হত এবং মনে হত যেন তাঁর সেই অবস্থার প্রভাব সমস্ত কক্ষে সঞ্চারিত হচ্ছে।

একটা কথা প্রচারিত আছে যে, খ্যাতিমান ব্যক্তিদের খুব কাছে থেকে দেখতে নেই। অর্থাৎ, কাছে থেকে দেখলে সাধারণ মানবিক ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি চোখের সামনে এসে পড়ায় তাঁর উপরে শ্রদ্ধার হানি ঘটতে পারে। আচার্য জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে বলতে পারি যে, দীর্ঘ ১৩ বছর তাঁর সান্নিধ্যে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়ে তাঁর সম্বন্ধে যে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা নিয়ে এসেছিলাম তা কিছুমাত্র হ্রাস না ঘটে অনেক পরিমাণে বৃদ্ধিই পেয়েছিল।

আচার্য জগদীশচন্দ্র

আশুতোষ ভট্টাচার্য

উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে ভারতে প্রথম যাঁরা বিজ্ঞান-চর্চা আরম্ভ করেন, তাঁরা আজকের বৈজ্ঞানিকদের মত কেবল মাত্র গবেষণাগারে নিজেদের বন্দী রেখে আত্মকেন্দ্রিক বিজ্ঞান-অনুশীলনের মধ্যেই নিজেদের নিয়োজিত রাখেন নি, তাঁরা চারদিককার সমাজ ও জীবনের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে মানব-জাতি এবং বাংলা ভাষার সেবার মধ্যেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে আরম্ভ করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা এমন কি, সত্যেন্দ্রনাথ বসু পর্যন্ত নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের এ যুগের যাঁরা ছাত্র তাঁরাও এই প্রেরণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র কেবল মাত্র বাংলা ভাষায় যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তাই নয়, তাঁর মধ্যে যে একটি পরিচ্ছন্ন কবি-মন ছিল, তার ভিতর দিয়েই তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধু সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। প্রকৃতি-জগৎ সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের বিস্ময়ের কথা তাঁর রচিত 'অব্যক্ত' গ্রন্থ-খানির মধ্য দিয়ে যেমন প্রকাশ পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপের মধ্য দিয়ে তেমনই তাঁর শিল্পীসুলভ কবিমনটিও প্রকাশ পেয়েছে। সেদিন রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের মধ্য দিয়ে পরস্পর যে পত্রবিনিময় হত, তাদের মধ্য দিয়েই পরস্পর পরস্পরের নিঃসঙ্গতা দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ, মননশীলতার দিক দিয়ে সেদিন উভয়েই একই স্তরে বাস করতেন, একমাত্র এই দু'জন ব্যতীত সেদিন বাঙালীর সমাজে এমন কেউ ছিলেন না যাঁরা মানসিকতার দিক দিয়ে জীবনের এত উর্দ্ধস্তরে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাঁরা পরস্পরের নিকটতম বন্ধু হয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্রের নিঃসঙ্গ জীবনে রবীন্দ্রনাথের নিকট লিখিত তাঁর পত্রগুলির মধ্যে রবীন্দ্রভাবনার সঙ্গে তাঁর যে অন্তর্মুখী ঐক্য কত গভীর তা বুঝতে পারা যায়।

রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতের অতীত ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, জগদীশচন্দ্রও তাই ছিলেন। যে যুগে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এদেশের সমাজ সাধারণত ভারতীয় সংস্কৃতির সকল বিষয়কেই উপেক্ষা করতেন, সেই যুগে জগদীশচন্দ্রের মত পাশ্চাত্ত্যে শিক্ষিত একজন বুদ্ধিজীবী বৈজ্ঞানিক ভারতীয় প্রাচীন পৌরাণিক গ্রন্থগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করতেন, এই পাঠে যে তাঁর শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল তা তাঁর 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' প্রবন্ধটির ভিতর দিয়ে বুঝতে পারা যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন বাইরে খ্রীস্টান হয়েও অন্তরে অন্তরে হিন্দুই রয়ে গিয়েছিলেন, জগদীশচন্দ্রও বাইরের দিক থেকে ব্রাহ্মসমাজ-

ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অন্তরে অন্তরে যে হিন্দুধর্মের প্রতি কত গভীর অনুরাগী ছিলেন, তা তাঁর উক্ত প্রবন্ধটির ভিতর থেকেও জানতে পারা যায়।

ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য জগদীশচন্দ্র তাঁর যৌবনে ভারতের প্রায় সকল প্রাচীন তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। তখন সর্বত্র আলোকচিত্র-গ্রহণকারী কিম্বা আলোকচিত্র গ্রহণ করবার সরঞ্জাম খুব সহজলভ্য ছিল না, সেইজন্য তিনি সেই উদ্দেশ্যে নিজেই সুবৃহৎ আলোকচিত্র-গ্রহণকারী যন্ত্র বা ক্যামেরা সঙ্গে করে নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে নিজেই আলোকচিত্র গ্রহণ করতেন। 'অব্যক্ত' গ্রন্থখানির মধ্যে তাঁর কয়েকটি চিত্তাকর্ষক ভ্রমণ-কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে, তাদের মধ্যে তাঁর এই সকল অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি তাঁর কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'কে যথার্থ ই একটি প্রাচীন মন্দিরের আদর্শে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মধ্যভারতের প্রাচীন বৌদ্ধকীর্তি সাঁচি স্তূপের তোরণের অনুকরণ করে তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দিরের তোরণ নির্মাণ করেছিলেন, তাঁর অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রাচীন স্থাপত্যের অনুকরণ করেছেন এবং খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর অজন্তার গুহাচিত্রাবলীর অনুকরণে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এর অভ্যন্তরে নানা চিত্রাবলী অঙ্কিত করিয়েছেন।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা একদিন জগতের শীর্ষস্থানে আরোহণ করেছিল, ভারতের বহু প্রাচীন গ্রন্থে এবং ধ্বংসস্তূপে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর সাধনার ভিতর দিয়ে তাকেই পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে চেয়েছিলেন, পাশ্চাত্য ধারাটিকে তিনি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। সেইজন্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ যার মধ্যে কোন কৌতূহলী দৃষ্টি বিস্তার করে তার ভেতর থেকে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করতে অগ্রসর হন নি, জগদীশচন্দ্র সেই ক্ষেত্রেও তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি বিস্তার করেছিলেন। তিনি বৃক্ষের মধ্যেও প্রাণের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং আপাতদৃষ্টিতে যা জড় তার মধ্যেও চৈতন্যের অনুভব করেছিলেন। ভারতবাসীরা বৃক্ষকে একদিন প্রাণবান বলেই পুজো করত। অশ্বত্থ বৃক্ষের পুজো বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে অত্যন্ত ব্যাপক। প্রাচীন ভারতবাসী যদি বৃক্ষকে জড় বলে মনে করত, তবে কোনোদিন তার পুজো করত না, জড়ের উপাসনা যারা করে, তারা অত্যন্ত নিম্নস্তরের লোক। কিন্তু ভারতবর্ষের সংস্কৃতি বহু পূর্বেই বহু উর্ধ্বে স্থান পেয়েছিল। তাই অশ্বত্থ বৃক্ষের প্রাণশক্তি ছিল বলেই তার পুজো করে নিজের মধ্যে সেই প্রাণশক্তি অনুভব করত। ভারতীয় উপনিষদে বৃক্ষলতায় প্রাণের অস্তিত্বের কথা আছে। সেই পথেই প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানকে জগদীশচন্দ্র পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণের পথে নয়। জগদীশচন্দ্র আমাদের নিজেদের সংস্কৃতির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন।

সাহিত্যসাধক বিজ্ঞানী

অজিতকুমার ঘোষ

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু জগতের সমক্ষে নিজের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করতে চিরকাল অক্লান্ত চেষ্টা করে গেছেন, কিন্তু ভাবপ্রকাশের মাধ্যম-রূপে মাতৃভাষার মর্যাদা তিনি বরাবর দিয়েছেন। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, "মানুষ মাতৃক্রোড়ে যে-ভাষা শিক্ষা করে সে ভাষাতেই সে আপনার সুখ-দুঃখ জ্ঞাপন করে।" তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি নিয়ে যখন ভাবনা ও পরীক্ষা শুরু করেন তখন তাঁর সিদ্ধান্তগুলি বাংলা ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তারপর বিদেশে যখন তাঁর দিগ্বিজয় শুরু হল তখন স্বাভাবিক কারণেই তাঁকে ভাবপ্রকাশের জন্যে আন্তর্জাতিক ভাষার শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। কিন্তু দেশে ফিরে এসে তিনি পুনরায় বাংলাভাষায় তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি—তাঁর দীর্ঘ সংগ্রাম, সাময়িক ব্যর্থতা ও অন্তিম জয়ের কথাই ব্যক্ত করলেন। 'অব্যক্ত'-এর প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব-ভাবনার সঙ্গে নিজস্ব আনন্দ-বেদনাময় অনুভূতি মিশিয়ে দিয়েছেন। সেজন্য প্রবন্ধগুলি নীরস বিজ্ঞানের আলোচনা মাত্র হয় নি। সেগুলি তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পন্দনে ও উত্তাপে সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে।

জগদীশচন্দ্র তাঁর সময়ে বিশ্বের সেরা বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম ছিলেন। বিজ্ঞানের পূর্ণতম লক্ষ্যস্থলে তিনি পৌঁছেছিলেন। আমরা তাঁর আলোচনার বিষয় ও ভঙ্গি বিশ্লেষণ করে দেখলাম। বিজ্ঞান-রহস্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়ে বিজ্ঞানকে আর স্বতন্ত্র, একক ও খণ্ডিত মনে হয় না, বরং বিজ্ঞানকে জ্ঞান-রাজ্যের অপর সব শাখার সঙ্গে এক ও অভিন্ন মনে হয়। বিজ্ঞান, কাব্য ও দর্শন তখন এক অখণ্ড ভাবচেতনার অন্তর্গত হয়ে যায়। জগদীশচন্দ্রকে তাই আমাদের মনে হয়েছে বড় কবি, বড় দার্শনিক। জগদীশচন্দ্র বলেছেন, 'বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে।' কবির কথা বলতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র হয়তো তাঁর বন্ধুকবি রবীন্দ্রনাথের কথাই বিশেষ করে ভেবেছিলেন। যা প্রত্যক্ষের অতীত কবি তা তাঁর কল্পনাশক্তির দ্বারা উপলব্ধি করতে পারেন। অরূপ, অসীম ও অনির্বচনীয়কে কবি তাঁর ধ্যানের দ্বারা, সৃষ্টিশক্তি দ্বারা মূর্ত করে তোলেন। বৈজ্ঞানিকও তাঁর দেখাশোনার সঙ্কীর্ণ জগতের মধ্যে তাঁর সাধনাকে সীমাবদ্ধ রাখেন না। জগদীশচন্দ্রের কথায়, "দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন। শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায়, সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন।"

কবি ও বৈজ্ঞানিক যেমন এক বিশেষ স্তরে মিলিত হতে পারেন, তেমনি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকও এক মৌল ও বৃহত্তর ভাবনার জগতে কাছাকাছি চলে আসেন। বৈজ্ঞানিক যখন বলেন, 'শক্তিও অবিনশ্বর।' এক মহাশক্তি জগৎ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ; প্রতি কণা ইহা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট' ; তখন মনে হয় তিনি দার্শনিকের জগতেই প্রবেশ করেছেন। এক সর্বব্যাপী মহাশক্তি অথবা পরম সত্তার অস্তিত্ব প্রাচীন ব্রহ্মবাদীর ধ্যানে ও উপলব্ধিতে প্রকাশ পেয়েছিল। 'সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ। সর্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ'—সেই মহাশক্তিকে তো বৈজ্ঞানিকও সন্ধান করছেন। 'সুতরাং, দেখা যাইতেছে, প্রতি জীবনে দুইটি অংশ আছে। একটি অজর, অমর ; তাহাকে বেষ্টন করিয়া নশ্বর দেহ। এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।' জড়বস্তু নিয়ে যাঁর কারবার সেই বৈজ্ঞানিক এখানে উপনিষৎ ও গীতার মধ্যে উক্ত জীবন-মৃত্যুর রহস্যের মধ্যে যেন প্রবেশ করেছেন।

জগদীশচন্দ্র জড় বৃক্ষলতার মধ্যে প্রাণের সন্ধান পেয়েছিলেন। জড়বস্তুর মধ্যে যখন মানবীয় ক্রিয়া ও অনুভূতির আরোপ করা হয় তখন তা মানুষের আগ্রহ ও বিচিত্র মানসিক প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলে। 'অব্যক্ত'-এর প্রবন্ধগুলির মধ্যে জড়বস্তুর চেতনায়িত ক্রিয়াকলাপ ও মানবিক হৃদয়বৃত্তির বর্ণনার ফলে নীরস বস্তুবিজ্ঞান সরস সাহিত্য হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ 'উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু' নামক রচনাটির উল্লেখ করতে হয়। রচনাটির মধ্যে সন্তানের জন্য জননীর স্নেহ, সর্বস্বত্যাগ ও মৃত্যু গাছের জীবন অবলম্বনে লেখক বর্ণনা করেছেন। লেখক বলেছেন, "মাতার স্নেহই সেই মণি। সন্তানের উপর ভালোবাসাটাই যেন ফুলে ফুটিয়া উঠে। ভালোবাসার স্পর্শেই যেন মাটি এবং অঙ্গার ফুল হইয়া যায়।" মাতার স্নেহরসসিক্ত হয়ে গাছের জীবন এখানে বিজ্ঞানের কৌতূহল ছাড়িয়ে সাহিত্যের রসাস্বাদনার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। প্রাণহীন, নিরুত্তাপ, নিবর্ণ বিজ্ঞানকে ভালোবাসার তাপে, বর্ণে, রসে সরস ও প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। লেখক এক জায়গায় বলেছেন, "আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম, তখন সব খালি খালি লাগিত। তারপর গাছ, পাখি, কীট-পতঙ্গদিগকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছি, সে অবধি তাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, আগে যাহা পারিতাম না।"

'অব্যক্ত' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা যেমন বেশি, গুরুত্বও তেমনি অধিক। কয়েকটি রচনা ভ্রমণ-কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যেমন যুক্তকর, অগ্নিপরীক্ষা, ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে ইত্যাদি। পলাতক তুফান উৎকল্পনা-কেন্দ্রিক রচনা। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং বিভিন্ন সময়ে নানা স্থানে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি পদে বৃত হয়ে যেসব ভাষণ দিয়েছিলেন সেগুলিও এক

বিশেষ শ্রেণীর রচনা-রূপে এই সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ছাত্র-সমাজের প্রতি ভাষণটিও এই শ্রেণীর রচনার অন্তর্গত।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু বিজ্ঞান-সংক্রান্ত তথ্য ও তত্ত্ব, কিন্তু ভাষার প্রাঞ্জলতায়, সহজ প্রকাশভঙ্গির চারুতায় এবং অকপট ব্যক্তিত্বের আন্তরিকতায় প্রবন্ধগুলি সাহিত্যগুণ-মণ্ডিত হয়েছে। দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কিরূপ সাবলীল ভঙ্গিতে প্রকাশ করা যায় তার পরিচয় যেমন পেয়েছি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনায় তেমনি আবার পেলাম জগদীশচন্দ্রের লেখায়। বোধ হয় মৌলিক চিন্তা ও গভীর প্রজ্ঞার ভাষা এমনি সরল হয়। তত্ত্ব বোঝাবার জন্য তিনি অনেক স্থলে সরস গল্পের অবতারণা করেছেন। অদৃশ্য আলোককে কিভাবে একমুখী করা যায় তা বোঝাতে তিনি ঈশপের গল্পের বক ও শৃগালের কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। এর ফলে গল্পরসে মগ্ন শ্রোতা সহজেই তত্ত্বের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন। মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে করতে তিনি আনন্দ-বেদনা স্পন্দিত অনুভূতিময় জগতের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। 'অদৃশ্য আলোক' প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "এই ভীষণ নিনাদের মধ্যেও মনুষ্যকণ্ঠের কত মর্মবেদনাধ্বনি, কত মিনতি, কত জিজ্ঞাসা ও কত রকমের উত্তর শোনা যায়। ইহার মধ্যে কে একজন অবুঝের মতো বার বার একই নাম ধরিয়া ডাকিতেছে—'কোথায় তুমি—কোথায় তুমি?' উত্তর আসিল না—সে আর এই পৃথিবীতে নাই।" বিজ্ঞানের তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে মানবচিত্তের কাতর আকুতির অবতারণা করে লেখক এখানে বুদ্ধির রাজ্য থেকে হৃদয়ের রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। বক্তব্যকে সরস ও সুবোধ্য করবার জন্য লেখক অনেক জায়গায় ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত অনেক কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। আলো একমুখী করবার উপায়-রূপে ফারসী ও জার্মান মহিলাদের কেশের প্রসঙ্গ এনে তিনি বিষয়টিকে শ্রোতাদের কাছে বিশেষ সরস ও আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানকে বীক্ষণাগার থেকে আমাদের দৈনন্দিন জগতের মধ্যে এনে ফেলেছেন। পরিচিত জগতের বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, সংসারজীবনের নানা ধরনের বস্তু ও ঘটনা অবলম্বনে তিনি তাঁর বিজ্ঞানের সব মৌলিক ও দুরূহ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পেয়ে আমরা ক্ষণে ক্ষণে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হয়েছি। মনে হয়েছে বিজ্ঞান জ্ঞান ও সাধনার আরও কোনো শাস্ত্র নয়, তা যেন আমাদের সহজাত জ্ঞানের সামগ্রী, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেন তার উপলব্ধি সম্ভব। ব্যক্তিগত আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনার স্পর্শে জগদীশচন্দ্রের লেখায় বিজ্ঞানের বর্ণহীন বস্তুনিষ্ঠতা অনেক সময় কবির আত্মমুখীন ভাবানুভূতির রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। "কোনো দিনও লিখিতে শিখি নাই, কিন্তু ভিতর হইতে কে আমাকে লিখাইতে আরম্ভ করিল। তাহারই আজ্ঞাতে আকাশ স্পন্দন ও অদৃশ্য আলোক বিষয়ে লিখিলাম।

পরে লিখাইল, উদ্ভিদজীবন মানবীয় জীবনের ছায়ামাত্র।" রবীন্দ্রনাথ জীবন-দেবতা সম্বন্ধে যা বলেছেন এখানে যেন তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। আর এক জায়গায় জগদীশচন্দ্র বলেছেন, "এইরূপে বহুর মধ্যে একত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম।" এখানেও রবীন্দ্রনাথের বহু-ব্যবহৃত উক্তির যেন পুনরাবৃত্তি শুনতে পাই। জড়বিজ্ঞানের সাধনায় মগ্ন থাকলেও জগদীশচন্দ্র প্রত্যক্ষ জগতের উপরে যে সর্বনিয়ন্তা শক্তি রয়েছে তার প্রতি তিনি অটল বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। বার বার তাঁরই পদতলে তিনি তাঁর পরম বিশ্বাস ও ভক্তি নিবেদন করেছেন, "সাফাই করিবার কথা যখন কিছুই নাই, তখন তোমার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত সে কেবল বলিবে—আসামী হাজির।"

জগদীশচন্দ্র শুধু কেবল ভারতের বাইরে নানা দেশে তাঁর বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সম্প্রসারিত করেছিলেন তা নয়, ভারতের অভ্যন্তরেও দূরে ও নিকটে নানা জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন। এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল, কখনো প্রাকৃতিক জগৎ পর্যবেক্ষণ করে নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা, কখনো বিচিত্র মানুষ ও তার ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা, কখনো বা নিছক ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করা। অপরিচিত, দুর্গম স্থানে যাওয়া জগদীশচন্দ্রের একটা নেশা ছিল। তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে পথের বর্ণনা নেই। কিন্তু গন্তব্য-স্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে। শুধু বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা নয়, কোনো মানবিক অথবা বৈজ্ঞানিক রহস্যের আভাস দিয়ে তিনি আমাদের দেখার জগৎ থেকে ভাবনার জগতে নিয়ে গেছেন। 'যুক্তকর' রচনাটির মধ্যে অজন্তার গুহাগুলির ভিতরে যে অমূল্য চিত্রগুলি রয়েছে তাদের কয়েকটি বিশ্লেষণ করেছেন। 'অগ্নিপরীক্ষা' একটি ভিন্ন জাতের রচনা। 'অব্যক্ত'-এর কোনো প্রবন্ধের সঙ্গে এর কিছু মাত্র মিল নেই। লেখক নেপাল সীমান্তে ভ্রমণের সময় এই ঐতিহাসিক কাহিনীটি সংগ্রহ করেছিলেন। একটি দুর্গের মুষ্টিমেয় সৈন্য-বাহিনী ও তাদের পরিবারের লোকেদের অসীম সাহসিক যুদ্ধের লোমহর্ষণ বর্ণনা রয়েছে প্রবন্ধটির মধ্যে। বৈজ্ঞানিক যুদ্ধের রসে এতখানি উত্তেজিত কিভাবে হলেন তা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। প্রতিরোধের প্রতিটি স্তর, গৌরবময় মৃত্যু-বরণের প্রতিটি মুহূর্ত শ্বাসরোধকারী উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। লেখকের বর্ণনা-গুণে একটি অখ্যাত, অজ্ঞাত দুর্গের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে। 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' প্রবন্ধটিতে অ্যাডভেঞ্চারের দুর্দম নেশা, দুর্গম তুষারাবৃত পর্বতের মহৎ সৌন্দর্য এবং বৈজ্ঞানিক রহস্যের সঙ্গে মৌলিক কল্পনাশক্তির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। গঙ্গার উৎপত্তি-স্থল আবিষ্কার করতে গিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যলীলা থেকে কিভাবে পৌরাণিক কাহিনীর উদ্ভব হয়েছে লেখক তা সুন্দর-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। রচনাটির মধ্যে, সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি-সত্তা, সত্যসন্ধানী দার্শনিক সত্তা এবং তত্ত্বাভিলাষী বৈজ্ঞানিক সত্তার আশ্চর্য মিলন ঘটেছে। লেখকের বর্ণনাশক্তি এখানে এক উচ্চাঙ্গের কবিত্বময় রূপ লাভ করেছে। যথা,—

"ক্রমে দেখিলাম স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড উর্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে। যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে 'তিষ্ঠ' বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন্ মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখানি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।"

'পলাতক তুফান' রচনাটি জগদীশচন্দ্রের উদ্ভট কল্পনা এবং রসরচনা সৃষ্টির মৌলিক ক্ষমতার পরিচয় বহন করছে। গম্ভীরপ্রকৃতি জগদীশচন্দ্র যে কিরূপ দক্ষ কৌতুকরচনাশিল্পী ছিলেন তার সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে এখানে। রচনাটির কৌতুকরস রয়েছে পরিহাস-নিপুণ বাগ্ভঙ্গী ও গুরুতর সম্ভাবনার আকস্মিক অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের মধ্যে।

জগদীশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং নানা সম্মেলনে ও প্রতিষ্ঠানে যে-সব আনুষ্ঠানিক ভাষণ দিয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্ব, আশা-নিরাশা এবং উজ্জ্বল আদর্শের চিহ্ন রয়েছে। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানী হয়েও যে সাহিত্যকে কতখানি ভালোবাসতেন তার পরিচয় বারে বারে পেয়েছি তাঁর ভাষণগুলির মধ্যে। উদার ও পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শে তিনি দীক্ষিত ছিলেন। তিনি বলেছেন, "পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া আমি ইহা উপলব্ধি করিয়াছি যে, আমাদের সমুদয় দীক্ষা কেবল মনুষ্যত্বলাভের উদ্দেশ্য মাত্র।" তিনি সর্বত্র আমাদের আত্মশক্তি জাগিয়ে তুলে সকল ভীরুতা ও দুর্বলতা পরিহার করে বীর্যবান ও সংগ্রামশীল হবার জন্যই আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, "সেই শক্তির উচ্ছ্বাসেই জীবনের অভিব্যক্তি। সেই শক্তিতেই মানব দানবত্ব পরিহার করিয়া দেবত্বে উন্নীত হবে।" তিনি আরও বলেছেন, "নির্ভীক বীরের ন্যায় জীবনকে মহা-হবে নিক্ষেপ করো।"

ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে

উমা রায়

'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' নিবন্ধে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর এক নতুন রূপ চোখে ভেসে উঠলো। বিজ্ঞান যেখানে দর্শন হয়ে উঠেছে, তথ্যবিন্যাস যেখানে রসের উপাদান হয়ে উঠেছে এবং গবেষকের ঔৎসুক্য যেখানে নবীনা সৃষ্টির আনন্দ হয়ে উঠেছে সেইখানে জগদীশ বসুর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল এক নতুন ভগীরথরূপে।

সগরসন্তানেরা ভস্ম হয়েছিলেন কপিলের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাতে। এ যুগেও বিজ্ঞানের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাতে ভস্ম হতে চলেছিল মানবমনের স্বপ্নবিহঙ্গেরা। কিন্তু সত্যিই কি তা যায়? এই যে চাঁদের দেশে পৃথিবীর তিনটি মানুষ, চাঁদের বুকে পা দিল তারা; কিন্তু তবু কি চাঁদকে নিয়ে হাজার হাজার বছরের এত কাব্যসুষমা, এত রসালস ভঙ্গিমা, এত অর্ধজাগরণ মোহাবেশ তা কি চাঁদ-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এতটুকু নষ্ট করতে পেরেছে?

তেমনি গঙ্গাকেও ঘিরে আমাদের কত প্রবাদ, কত জনশ্রুতি, কত কাহিনী, কত উপকাহিনী জমে উঠেছে শিশিরবিন্দুর মত কালের পুষ্পদণ্ডে হৃদয়ের পর্ণে পর্ণে।

গঙ্গা হিমালয়দুহিতা, গঙ্গা পতিতোদ্ধারিণী, গঙ্গা বিষ্ণুপদসংহিতা করুণাময়ী, গঙ্গা বিষ্ণুভার্যা, গঙ্গা শান্তনু-প্রেয়সী, গঙ্গা জহ্নু-প্রণয়িনী, গঙ্গা কি নয়? জীবদ্দশায় তাঁর জলবিন্দু স্পর্শে নিয়তই আমরা পবিত্র, মৃত্যুদশায় শুষ্ক কণ্ঠতালুতে তিনি জীবনতৃষ্ণানাশিনী গঙ্গা, আমাদের জন্মান্তরের সংস্কারকে বহন করে নিয়ে চলেছেন আর এক জন্মান্তরের দিকে, সেই সংস্কার থেকে মুক্তি পান না বৈজ্ঞানিক চিত্তও।

সেই জন্মান্তরীণ সংস্কার বালক জগদীশচন্দ্রের নবীন মনেও আশ্চর্যরূপে ক্রিয়াশীল ছিল। তিনি নদীতীরে বসে থাকতেন, জোয়ার-ভাঁটার বারি-প্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ্য করতেন এবং মনে করতেন যেন সেই প্রবাহের প্রাণ আছে। ছোট ছোট তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে আছড়ে পড়তো, তিনি মনে করতেন যেন তারা কথা বলছে, ক্রমে অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে আসতো, সমস্ত শব্দ হতো নীরব, শুধু গঙ্গার তরঙ্গধ্বনি প্রতিধ্বনি জাগাতো বালকের মনে।

সেই ক্ষুদ্র বালকটির মনে যে-সকল চিন্তার উদয় হতো সে-সব কি বালকসুলভ চিন্তা? বালক কি কুলু-কুলু জলধারার মধ্যে অনাদিকালের অনন্ত জিজ্ঞাসার কথা শুনতে পায়? রাইচরণের খোকাবাবুর মতো তরঙ্গিত জাহ্নবী-লীলায় তরলিত জীবনলীলা অবসান কি সকলেই করতে পারে?

বালকের মনে যে জিজ্ঞাসার তরঙ্গ উথলে উঠতো তা সকল মানুষেরই সকল কালের জীবনরহস্যের জিজ্ঞাসা। প্রথমেই বালক জগদীশচন্দ্রের মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছিল, এই যে নদীর অবারিত গতি, এ গতির উৎস এবং শেষ কোথায়? তরঙ্গগুলিকে তো ফিরে আসতে দেখা যায় না, তবে কোথায় যায়? এই প্রশ্ন তো দর্শনের প্রশ্ন। কবি হয়তো বলেন, অজানিতের অন্ধকারের পিছনে চিরজানা যিনি লুকিয়ে বসে আছেন, সব কিছুর শেষ সেইখানে—"সেই তমস পরস্তাৎ", সেই মহান হিরণ্যগর্ভ পুরুষই সকল কিছুর শেষ কথা। এই যে অন্নময় দৃশ্যমান জগতের অবিরাম রূপ পরিবর্তন, এই যে মনোময় জগতের অবিরত রতি পরিণতির বৈচিত্র্য, এই যে প্রাণময় জগতের মহান্ধকার থেকে মুহুর্মুহু জ্যোতির উদয়, এই যে বিজ্ঞানময় জগতের রূপ থেকে অরূপে আর অরূপ থেকে রূপে প্রেমাভিসার—এ সবই তো একেরই ইন্দ্রজালের চাতুরী ও মাধুরী। বলতে পারেন কোন দার্শনিক—এক বলে কিছু নেই, আছে যা, তা হচ্ছে নিতান্তই নির্বাপণ। এই যে মোমের আলোটি জ্বলছে, চোখের সামনে দেখছি, তার তাপে মোম গলে পড়ছে, একটি ফুৎকারেই সেই আলো চিরকালের মতো নিবে যায়। এই যে দেখছি চোখের তারাটি জ্বলছে, জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা, সুখ ও তৃপ্তিতে তা মুহুর্মুহু বিধুর হয়ে উঠছে কালের একটি আয়স দণ্ডাঘাতে নিথর পাথর হয়ে যায়। বালকের মনে অবিরাম চলা তরঙ্গ-গুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই এই প্রশ্নই ওঠে, 'কই, এরা তো ফিরে আসে না—তবে কোথায় সমাপ্তি পায়?'

শুধু যে ফেরে না তা নয়, আসেই বা কোথা থেকে? এ প্রশ্ন ঋষিদের মনেও এসেছিল। তাঁরাও প্রশ্ন করেছিলেন, "কুত্যোৎহম্"। কবিও শিশুর মুখ দিয়ে মাকে প্রশ্ন করিয়েছিলেন, 'এলেম আমি কোথা থেকে', প্রশ্নের উত্তর তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবল্লীতে সুন্দর করে বলা হয়েছে। সমস্ত বিশ্বের মধ্যে যিনি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন সেই আনন্দই আছে বিশ্বের আদিতে ও অন্তে। এই দৃশ্যমান শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময় জগৎ যার সম্বন্ধে উপনিষদে আছে, "আনন্দ রূপম্ অমৃতং যদ্‌বিভাতি বিভাতি"—এর আদিরূপ অন্নময় এবং বারুণি তপস্যা করে একেই ব্রহ্ম রূপে জেনেছিলেন—"অন্নং ব্রহ্মে ইতি ব্যজানানাৎ" এবং যদি এই ভূতজগৎ অন্ন থেকেই সঞ্জাত হয়ে থাকে এবং অন্নতেই প্রলীন হয় তা হলে, "এলেম আমি কোথা থেকে" এ প্রশ্নের উত্তর হবে ব্রহ্ম থেকেই সব কিছু উৎপন্ন ও ব্রহ্মতেই সব কিছু বিলীন। বালকের প্রশ্নের উত্তরে কুলুকুলু শব্দে গঙ্গা তাই বলেছিল যে, সে মহাদেবের জটা থেকে এসেছে।

মহাদেব প্রলয়ের দেবতা এবং প্রলয় সৃষ্টির সিংহদ্বার। প্রলয় ও সৃষ্টির মধ্যে স্বরূপত পার্থক্য নেই। পার্থক্য যেটুকু আছে তা হচ্ছে অবস্থাগত। যেমন, ভাঁজ করা বস্ত্র ও খোলা বস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য। তাই মহাদেবের জটা থেকে শুধু গঙ্গাই নিষ্ক্রান্ত হয় নি, এই বিশ্বজগতও নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। জগদীশচন্দ্রের

এক পরমাত্মীয় মারা গেলে এই গঙ্গাতীরেই তাঁকে ভস্মীভূত করা হয়। "সেই পরম স্নেহের রাসমন্দির চূর্ণ হয়ে গেলে" জগদীশচন্দ্রের চিত্ত শূন্যতায় ভরে গিয়েছিল। যে গঙ্গার উৎপত্তি মহাদেবের জটা থেকে সেই গঙ্গার কাছে তাঁর কাতর হৃদয়ের নিবেদন আবার যখন প্রশ্নের আকারে নিবেদিত হলো, আমার প্রিয়জন আজ কোথায়? যে যায় সে কোথায় যায়? মৃত্যুতেই কি জীবনের সমাপ্তি? এই অনন্ত জিজ্ঞাসা চিরকালই মানুষের মনে ধ্বনিত হয়েছে, কেউ উত্তর পেয়েছে, কেউ উত্তর পায় নি। যারা উত্তর পেয়েছে সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র একজন ছিলেন। তাই গঙ্গার কুলুকুলু শব্দের মধ্যে তিনি চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর পেলেন মহাদেবের পদতলে। লোকে যেখান থেকে আসে সেখানেই যেন ফিরে যায়। এই জীবন যেন প্রবাসবাস। প্রবাসের কর্মজীবন সমাপনান্তে প্রাণ আবার মহাপ্রাণে এসে মিলিত হয়।

কিন্তু জগদীশচন্দ্র প্রাণের বিলুপ্তির কথা বলেন নি। এ বিষয়ে তিনি দ্বৈতবাদী। মহাদেবের জটাজালে যার আবির্ভাবের উৎস, মহাদেবের পদতল তার বিশ্রামের পরমস্থান। গঙ্গা যেন জীবনধারা প্রবাহের প্রতীক। জীবনের অপর নামই সৃষ্টি, সেই সৃষ্টি আদি-অন্তের রহস্য। পুরাণ-কথার আশ্রয়ে ভৌগোলিক বিবরণকে অবহেলা না করে জগদীশচন্দ্র 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' প্রবন্ধে দর্শন, বিজ্ঞান ও ভূগোলের এক আশ্চর্য বর্ণসম্পাৎ ঘটিয়েছেন।

গঙ্গার উৎপত্তি-কাহিনী বাল্মীকি রামায়ণে পাওয়া যায়। কাহিনীটি এইরূপ: কপিলমুনির ক্রোধদৃষ্টিতে ষাট হাজার সগরতনয় ভস্মীভূত হয়ে গেলে পৌত্র অংশুমানকে দুঃখিত মনে সগর পিতৃব্যদের অনুসন্ধান করতে বললেন। অনুসন্ধান করতে করতে অংশুমান পাতালে এসে পৌছলেন এবং সগরতনয়েরা যেখানে ভস্মীভূত সেখানে পিতৃব্যদের সলিলতর্পণ করবেন বলে যখন জলের অনুসন্ধান করছেন তখন পিতৃব্যদের মাতুল গরুড়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হলো। গরুড় তাঁকে বললেন কপিলমুনির ক্রোধে সগরতনয়েরা ভস্মীভূত হয়েছে, সুতরাং সাধারণ জল দিয়ে এদের তর্পণ না করে গঙ্গার জল দিয়ে তর্পণ করা উচিত। গরুড় আরো বললেন যে, গঙ্গার জল এসে ভস্ম পরিপ্লাবিত করে দিলে সগরতনয়েরা ভস্মরূপ থেকে মুক্তি পাবে, সুতরাং অশ্বটিকে এখন ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত করে গঙ্গাবতরণের ব্যবস্থা কর।

গঙ্গা পুরাণ মতে হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। সগরের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করলে সগর অত্যন্ত দুঃখিত হলেন কিন্তু কিভাবে গঙ্গাকে ভূতলে আনা যায় তার উপায় নির্ধারণ করতে পারলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর পৌত্র অংশুমানও অনুরূপভাবে গঙ্গাকে আনার উপায় নির্ধারণ করতে পারলেন না। অংশুমানের পুত্র দিলীপ। দিলীপও গঙ্গাকে আনবার কোন ব্যবস্থা করতে না পেরে চিন্তায় ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। দিলীপের পুত্র ভগীরথ গঙ্গাকে আনবার জন্য গোকর্ণ প্রদেশে গিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। কঠোর

তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে বর দিতে এলেন। ভগীরথ দুটি বর প্রার্থনা করলেন। তার মধ্যে প্রথমটি হলো গঙ্গাকে ভূতলে অবতরণ করাবার বর। ব্রহ্মা বললেন, জাহ্নবীর পতনবেগ বসুমতী ধারণ করতে পারবেন না। সুতরাং শিবের আরাধনা ভগীরথ যেন করেন। অংগুষ্ঠমাত্র ভর করে ভগীরথ সম্বৎসর দুশ্চর তপস্যা করে শিবকে সন্তুষ্ট করলেন এবং শিব গঙ্গার বেগ মস্তকে ধারণ করতে সম্মত হলেন। তখন গঙ্গা বিশাল আকার ধারণ করে দুঃসহ বেগে শিবের মাথায় পতিত হতে লাগলেন। সেই ফেনিল শুভ্র আবর্তে হরশির তুষারমণ্ডিত হিমগিরির শোভা ধারণ করলো। গঙ্গা মনে করলেন, তিনি দুঃসহ বেগে শঙ্করকে ভাসিয়ে রসাতলে নিয়ে যাবেন। গঙ্গার এই দর্প দেখে শিব তাঁকে জটাবন্ধনে বন্দী করে ফেললেন। বার বার চেষ্টা করা সত্ত্বেও গঙ্গা শিবজটা থেকে নিষ্ক্রমণের পথ আবিষ্কার করতে পারলেন না এবং মহীতল স্পর্শ করতে পারলেন না। ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব গঙ্গাকে জটাবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলেন এবং গঙ্গা সাতটি ধারায় ভূতল পরিপ্লাবিত করে প্রবাহিত হলেন। এই সাতটি ধারার মধ্যে তিনটি ধারার নাম আহ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী। এই তিনটি ধারা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হলো। পূর্ব দিকে প্রবাহিত আরো তিনটি ধারা—এগুলির নাম সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু। এ ছাড়া, আর একটি যে ধারা ছিল সেটি ভগীরথের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলতে লাগলো।

গঙ্গার জলরাশি মৎস্য, কচ্ছপ ও শিশুমার প্রভৃতি প্রাণীকে বুকে ধারণ করে ঘোরতর শব্দ-সহকারে প্রবাহিত হতে লাগল, সেই আশ্চর্য দৃশ্য দেখবার জন্য আকাশে যক্ষ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও দেবর্ষিরা ভিড় করে দাঁড়ালেন, দেবতারা এলেন রথে, হাতিতে ও তুরঙ্গে, তাঁদের জ্যোতির মালায় দশদিক বিভূষিত হলো এবং অন্তরীক্ষে ও মর্ত্যে অদৃষ্টপূর্ব শোভা ও সৌন্দর্যের আবির্ভাব ঘটলো। সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখবার। তাঁদের আভরণের দিপ্তীতে এবং অঙ্গের জ্যোতিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো এবং জলবেগে উৎক্ষিপ্ত মৎস্য, শিশুমার ও সর্পেরা বিদ্যুতের মতন চমক হানতে লাগলো। গঙ্গার শুভ্র জলরাশি থেকে উৎক্ষিপ্ত হতে লাগলো শুভ্র ফেনমণ্ডল। তার শোভা তখন দেখতে হলো যেন ধবল মেঘমালার পাশে উড্ডীন বকপঙ্‌ক্তির মত। গঙ্গা চলেছে কোথাও দ্রুতবেগে, কোথাও কুটিল গতিতে, জলরাশি কোথাও বা সরু একটি রেখার মত সঙ্কুচিত, কোথাও বা স্ফীত হয়ে বিরাট আকার ধারণ করলো। আরম্ভ হলো তরঙ্গের ওপর তরঙ্গাঘাত। কতকগুলি তরঙ্গ যেন লাফিয়ে আকাশে উঠবার চেষ্টা করতে লাগলো এবং তখনি নিচে শত খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়লো। এই ভাবে গঙ্গা চলেছেন ভগীরথের পিছনে পিছনে এবং যেখান দিয়ে চলেছেন সেখানকার লোকেরা সেই জল স্পর্শ করে এবং সেই জলে অবগাহন করে বিমল রূপ ধারণ করেছেন। গঙ্গা চলেছেন ভগীরথের পিছনে এবং গঙ্গার পিছনে পিছনে চলেছেন দেবতা, ঋষি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সরা ও উরগেরা—

এমনি ভাবে জহ্নুমুনির আশ্রমের কাছে গঙ্গা এলেন এবং জলরাশি দিয়ে আশ্রম প্রাঙ্গণ পরিপ্লাবিত করে ফেললেন। ক্রুদ্ধ জহ্নুমুনি সমস্ত জলরাশি গণ্ডুষে পান করে ফেললেন, কিন্তু দেবতাদের স্তুতি ও মিনতিতে নিজের কর্ণবিবর দিয়ে গঙ্গাকে মুক্তি দিলেন। সেই থেকে গঙ্গার আর একটি নাম জাহ্নবী। গঙ্গা ভগীরথের পিছন পিছন আবার চলতে চলতে এসে পড়লেন মহাসাগরে, তারপর গেলেন রসাতলে। সেখানে সগরসন্তানদের ভস্মরাশি জলরাশি দিয়ে পরিপ্লাবিত করলেন। রামায়ণের এই গল্পে গঙ্গার অবতরণের কাহিনী শুধু বলা হয়েছে, উত্তরণের কাহিনী বলা হয় নি। সেই উত্তরণের কাহিনী জগদীশচন্দ্র বলেছেন এবং বলেছেন অবতরণের কাহিনীও এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে।

বিজ্ঞানের নীরস তথ্যগুলি কাব্যের সরস তত্ত্বে এমন রূপান্তর পেতে পারে 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' প্রবন্ধটি পড়বার আগে কে তা ভাবতে পেরেছিলেন! ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থল হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ। উজান পথে জাহ্নবীর জলধারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে লেখক চলেছেন গঙ্গার উৎপত্তিস্থলে, সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ ভাগীরথীর তীরে তীরে। কত জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার তরঙ্গাঘাতে, পাড় ভেঙ্গে গিয়ে আবার কত জনপদ গড়ে উঠেছে তারই বুকের আশ্রয়ে। এক সময় জগদীশচন্দ্র এসে পৌছলেন কূর্মাচলে। এই কূর্মাচল থেকে সরযূ নদীর উৎপত্তি হয়েছে। গঙ্গার প্রথম অবতরণ—হিমালয় থেকে মর্ত্যলোকে কখন ঘটেছিল? আমরা আজকের দিনে যে তিথিকে দশহরা বলি সেই তিথি পুরাণ মতে গঙ্গার প্রথম অবতরণ তিথি, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে। হস্তা নক্ষত্রে মঙ্গলবারে হিমালয় থেকে মর্ত্যলোকে অবতরণ। পুরাণে, এ কথাও বলে যে, গঙ্গা হিমালয়-দুহিতা বটে কিন্তু মেনকার গর্ভে তাঁর জন্ম হয় নি। তিনি জন্মেছিলেন সুমেরু-দুহিতা মনোরমার গর্ভে। প্রসঙ্গত গঙ্গার অন্য পৌরাণিক পরিচয় দেওয়া যাক। বামনপুরাণে আছে যে, গঙ্গার সহোদর ভ্রাতা ছিলেন মৈনাক এবং এর দুই সহোদরার নাম রাগিণী ও কালী। গঙ্গার প্রকৃতি ও রূপ সম্পর্কে সেখানে বলা হয়েছে যে, তিনি কুটিলা, শ্বেতবর্ণা, পদ্মপলাশলোচনা, নীলকুঞ্চিতকেশ এবং শ্বেতমাল্যধারিণী।

তারকাসুর যখন স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন তখন দেবতারা গঙ্গাকে শিবপত্নী হবার উপযুক্ত মনে করলেন এবং ব্রহ্মাকে গিয়ে বললেন যে, শিবের তনয় তারকাসুরকে বধ করে দেবরাজ্য উদ্ধার করতে পারবেন। ব্রহ্মা গঙ্গাকে শিবপত্নী হবার অনুরোধ করলে গঙ্গা তা সহাস্যে প্রত্যাখ্যান করেন। ক্রোধে ব্রহ্মা তাঁকে সলিলরূপা হবার অভিশাপ দেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী তিনজনেই শ্রীহরির ভার্যা। কূর্মাচল পেরিয়ে দানবপুর। তারপর আবার যাত্রা গিরিগহনের মধ্য দিয়ে উত্তর পথে। সে পাহাড়ী রাস্তায় চলা কি অত সোজা কথা? একেই তো পার্বত্য পথ ক্রমশ উঁচু থেকে নীচু দিকে নেমে গেছে, তার উপরে সে পথ অতি বন্ধুর।

চারদিকে পাহাড়ের পর পাহাড়, অরণ্যের পর অরণ্য। এমনিভাবে চলতে চলতে এসে পড়লেন এক বিরাট পর্বতের সম্মুখে, যার পশ্চাতে অন্তর্হিত হয়েছে সমস্ত দৃশ্যপট। সেই শৃঙ্গের উপর থেকেই দেখা যায় গঙ্গার উৎপত্তি-স্থল। কিন্তু যতক্ষণ না গিরির ওপরে ওঠা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণের গলদেশ থেকে বিলম্বিত উপবীত স্থত্রের তুলনা নদীর শীর্ণ জলধারা। সেই শীর্ণ জলধারাটি ভাগীরথীর পূর্বাশ্রম। ঐ শৃঙ্গের পশ্চাদ্‌ভাগে রয়েছে গোমুখী পর্বত, সেখান থেকে নির্গত হয়েছে গঙ্গা। প্রকৃতপক্ষে ঐ বিশাল শৃঙ্গের পশ্চাদ্‌ভাগে আছে দুটি পর্বতশৃঙ্গ। একটির নাম নন্দাদেবী ও অপরটির নাম ত্রিশূল।

নন্দাদেবী ও ত্রিশূল পাশাপাশি দুটি পর্বতশৃঙ্গ যেন গৌরী ও শংকর। কি অনন্ত সৌন্দর্যময় সেই দৃশ্য! পিছনে নিবিড় নীল আকাশমণ্ডল আর চারপাশে স্থনিবিড় পর্বতমালা। মাঝখানে দুই তুষারশৃঙ্গ যেমন গৌরবে সমুজ্জ্বল তেমনি স্নেহে সমুজ্জ্বল। লেখক জগদীশচন্দ্রের চক্ষুতে নন্দাদেবী প্রতিভাত হলো গরিয়সী মাতৃমূর্তিতে—যেন স্নেহময়ী সহিষ্ণু ধরিত্রী, যিনি অসংখ্য জীবকুলকে অঙ্কে ধারণ করে আছেন। এই জীবধাত্রী জননী ধরিত্রীর বাৎসল্যমধুর রূপটি লেখক উপলব্ধি করলেন নন্দাদেবীর মধ্যে। দ্বিতীয় শৃঙ্গটির নাম ত্রিশূল। এই ত্রিশূল পর্বতকেও লেখক দেখলেন মহাদেবের ত্রিশূলের প্রতীকরূপে, রসাতল ভূতল ভেদ করে সেই মহাস্ত্র যেন ধারণ করে আছে নভোস্তলকে, যেন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে মহাকাল ধারণ করে রেখেছেন তাঁর ত্রিশূলশূলে। ওই নন্দাদেবী লেখকের চোখে স্বষ্ট জগতের প্রতীক, আর ওই ত্রিশূল স্রষ্টার প্রতীক।

উপনিষদেও আছে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সহাবস্থানের কথা। উপনিষদে বলে, স্রষ্টা ঈশ্বর এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে তাতেই অনুপ্রবিষ্ট হলেন—'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ'। শুধু তাই নয়, এই যে সৃষ্ট বস্তু এ তো স্রষ্টারই আনন্দরূপ। স্রষ্টা স্বয়ং আনন্দস্বরূপ— 'আনন্দ-রূপম্ অমৃতম্ যদ্‌বিভাতি।' সৃষ্টির অর্থই হওয়া এবং বার বার হওয়া, বার বার হতে গেলেই রূপান্তর পেতে হয় এবং রূপান্তর মানেই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নবজীবন-প্রাপ্তি। হাওয়ায় যে জলীয় অণু থাকে তা শিশিরের রূপ ধারণ করে মুহূর্তেকমাত্র। তারপরই টুপ করে ঝরে যায়। উপনিষদও এই কথাই বলে—'ইমনি ভূতানি যায়স্তে···যাতানি জিবন্তী, প্রয়ন্তি অভিসংবিষন্তি।' এই যে সৃষ্টি, এই সৃষ্টি অন্ন থেকে, মন থেকে, প্রাণ থেকে, বিজ্ঞান থেকে এবং আনন্দ থেকে। এই যে স্থিতি, এই স্থিতিও অন্নের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে, বিজ্ঞানের মধ্যে এবং আনন্দের মধ্যে। এই যে প্রলয় বা লীন হয়ে যাওয়া তাও অন্নের সঙ্গে, মনের সঙ্গে, প্রাণের সঙ্গে, বিজ্ঞানের সঙ্গে এবং আনন্দের সঙ্গে। অন্ন, মন, প্রাণ, বিজ্ঞান ও আনন্দ এরাই ব্রহ্মা, এরাই ব্রাহ্মণ্য, এরাই সৃষ্টি, এরাই স্রষ্টা। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবল্লীতে ভৃগুবারুণী সংবাদে এই তত্ত্বটিই ব্যাখ্যাত হয়েছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র এই তাৎপর্যই বললেন—"পরস্পরের পার্শ্বে সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকর্তার হস্তের আয়ুধ সাকাররূপে দর্শন করিলাম।"

কিন্তু এই সাকারের পিছনে যে নিরাকার আছে তাকে উপলব্ধি করা অত সহজ নয়। তাই জীবনপথ-প্রদর্শক গুরু বলেন, যেখান থেকে জীবনধারার উৎপত্তি সেখানে পৌছবার পথ অতি দুর্গম।

ক্ষুরস্যধারানিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গমং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি ॥

গঙ্গার উত্তাল তরঙ্গলীলা দেখে কে কল্পনা করতে পারেন যে, চঞ্চল জললহরী উৎপত্তিস্থানের কাছাকাছি গিয়ে তুষারনদীতে পরিণত হয়েছে। যেন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের আশঙ্কায় অকালবসন্তের যৌবনচাঞ্চল্যকে নন্দী মুহূর্তে স্তব্ধ করে দিয়েছে। যত গিরি, বন, অরণ্যাদি সবই তুষার নদীতে পৌছবার পথে। কত গিরিসংকট অতিক্রম করে সেখানে পৌছতে হয়। পর্বতের উপবীতের তুলনায় পর্বতের সেই সূক্ষ্মধারাটি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে হতে তুষারনদীতে এসে লুপ্ত হয়ে গেছে। নদীর সঙ্গে নিয়তচঞ্চল জীবনধারার তুলনা সবসময়ই করা হয়। সেই চঞ্চল জীবনধারা যদি হঠাৎ স্তব্ধ চিত্ররূপ ধারণ করে তাহলে যে-সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, যে-বেদনামিশ্রিত বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়, তারই একটি অনন্য সাধারণ নিদর্শনে এই স্ফটিকপ্রস্তরনীভ এই তুষারদৃশ্য, অথচ আশ্চর্য এই—এই দৃশ্যের দুপাশে যে পর্বতমালা সেখানে অগণ্য বৃক্ষপূর্ণ অরণ্যানী। পর্বতের পাদমূল থেকে বৃক্ষগুলি ক্রমশ উঁচু পর্বতপৃষ্ঠে উন্নত উর্ধ্বরেখাকে স্পর্শ করেছে আর সেইসব বৃক্ষ-লতাগুল্ম থেকে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। উত্তুঙ্গ তুষারশৃঙ্গের গলিত জলধারা উপত্যকার সংকীর্ণ ভূমিতে এসে পড়ছে। নন্দাদেবী ও ত্রিশূলের সামনে এক স্পষ্ট কুজ্ঝটিকা।

এই দৃশ্য বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রকে যেন এক মহামন্দিরে প্রকৃতিশক্তির পূজারীরূপে রূপান্তরিত করল। তুষারনদীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে কত কষ্ট কত আয়াস স্বীকার করে তবে সেই মহামন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন। ধবলগিরির উচ্চ শৃঙ্গ থেকে নেমে এসেছে যে-তুষারনদী তার তীক্ষ্ণ স্রোতে ভগ্ন প্রস্তরস্তূপ যেন সেই মহামন্দিরে পৌছবার এক একটি সোপান। সেই মহামন্দিরে পৌছবার পথে যেন এই দেহভার আর বহন করা যায় না। বায়ুমণ্ডল ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠল এবং সেই ক্রমক্ষীণ বায়ুমণ্ডলে দেহ যেন আর শ্বাসক্লেশ বহন করতে চাইল না। দেখতে দেখতে সেই বনভূমি দেবধূপের সৌরভে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। যে শত শঙ্খনাদে বনভূমি পরিপূর্ণ হয়ে উঠল তাকে একমাত্র নাস্তিকই নির্ঝর-পতন শব্দ কিংবা পতনশীল পর্বতশৃঙ্গের বজ্রনিনাদ বলে উল্লেখ করতে পারে। যে-কুজ্ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল পর্বতকে আবৃত করে রেখেছিল তা যেন নাস্তিকেরই সংশয়ের কুয়াশা। সেই কুয়াশা বা সংশয়ের অপসরণ হলেই দেখা যাবে শৈলশৃঙ্গ দেবতার আবির্ভাব। জগদীশচন্দ্রের এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে যেন উপনিষদেরই একটি তত্ত্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। মানুষ তার অভিজ্ঞতার বিচিত্র স্তর থেকে স্তরে পর্যটন করতে করতে যেখানে

এসে পৌঁছায় সেখানে বহু 'এক' রূপে ধরা দেয়। প্রকৃতপক্ষে বহুর মধ্যেই এক থাকে। সেই একের উপলব্ধি আমাদের চিত্তকে চমৎকৃত করে দেয়। সে বলে ওঠে—এ কাকে দেখলাম? আহা! এ যে আগমন নয়, এ যে আবির্ভাব!

উপনিষদ যখন বলে "আনন্দরূপম্ অমৃতম্ যদবিভাতি" তখন ঠিক এই কথাই বলে। সমস্ত বস্তুভাব যখন এই উপলব্ধির সোনার কাঠির স্পর্শে সূক্ষ্ম চেতনায় জ্যোতির্ময়তাকে লাভ করে তখন সমস্ত বিভিন্ন অস্তিত্বের মধ্যে সে একটি আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক সত্যের দেখা পায়। তখন বৈজ্ঞানিক সত্য ও পৌরাণিক সত্য এক হয়ে ওঠে। মেঘমণ্ডল হয় শিবের জটা এবং নন্দাদেবী হয়ে ওঠেন স্বয়ং গৌরী।

পরমজননী গৌরী যেন জীবধাত্রী জননী। নন্দাদেবী তারই প্রতীক। পুরাণ মতে মহাদেবের জটায় পতিত হয়েছিল পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা। সেই গঙ্গার জল-অণু বিন্দু বিন্দু বারিরূপে পৃথিবীর সৃষ্টিশক্তিকে উজ্জীবিত ও সঞ্জীবিত করে তুলছে। সেই সৃষ্টিকে শিব কল্যাণমূর্তিতে রক্ষা করছেন এবং রুদ্র মূর্তিতে নাশ করছেন। শিবের ত্রিশূলের তিনটি শীর্ষ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের এই ব্যঞ্জনায় সমাহিত। জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধান বিশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত করেছেন দার্শনিকের একটি তৃতীয় দৃষ্টি। যে শিশুমন একদিন গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনি থেকে শুনতে পেয়েছিল যে, গঙ্গা শিবের জটা থেকে আসে আর জটায় ফিরে যায় তারই একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' প্রবন্ধে দিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক তথ্যটি এইরূপ: জলের হিমাণু পর্বতগাত্রে প্রবিষ্ট হয়ে মহাবিক্রমে পর্বতগাত্র বিদীর্ণ করছে, তারপরে সেই শিলাখণ্ডগুলি হিমাণুস্তূপের সঙ্গে নেমে আসতে থাকে এবং যাত্রাপথে সেই পর্বতশৃঙ্গগুলি দেহভারে যেমন আপনপথ সৃষ্টি করে নেয় তেমনি ঘর্ষণে ঘর্ষণে চূর্ণবিচূর্ণও হতে থাকে। হিমাণুপ্রবাহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সারিতে পরিণত হয়ে শেষে নদ-নদীরূপে সেই বালুকাস্তূপ বহন করে নিয়ে চলতে চলতে ক্রমশ সমুদ্রে এসে পতিত হয়। পর্বতচূর্ণের সংযোগে মৃত্তিকা উর্বর হয়ে ওঠে এবং ধরণীর কলেবর বর্ধিত হয়। শুধু তাই নয়, মৃত-প্রাণিদেহ বহন করে নদ-নদীগুলি সমুদ্রে নিয়ে ফেলতে থাকে। সংহার ও সৃষ্টির এই অপূর্ব রহস্যময় সমন্বয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এড়ায় নি। শুধু তাই নয়, এই হিমাণুগুলি মৃত্তিকাগর্ভে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে অগ্ন্যুৎপাত ঘটাচ্ছে। ফলে বিদীর্ণ পৃথিবী থেকে নানা ধাতুমিশ্রিত লাভাস্রোত মৃত্তিকার নতুন উপাদানের মিশ্রণ ঘটাচ্ছে। উচ্চভূমি নিম্নস্থ হয়ে এবং নিম্নভূমি উচ্চস্থ হয়ে নতুন মহাদেশের সৃষ্টি হচ্ছে। আর একটি ব্যাপারও সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নদ-নদীর জল সমুদ্রে এসে পড়ছে। সমুদ্রের জল উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পান্বিত হচ্ছে। তারপর বিপুল মেঘসম্ভাররূপে ঝঞ্ঝা ও অশনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রবল বেগে পর্বতাভিমুখে ধাবিত হয়। কালক্রমে পর্বতশৃঙ্গ থেকে মেঘাশ্রিত জলকণাগুলি তুহিনকণা-

রূপে পর্বতগাত্রে প্রবিষ্ট হয়। এভাবেই জলকণাগুলির গতির বিরাম নেই, শেষও নেই।

একটি ভৌগোলিক তথ্যকে বিশ্বসৃষ্টির এক রহস্যময় তত্ত্বের সঙ্গে একাত্মভূত করে জগদীশচন্দ্র দেখিয়েছেন বিজ্ঞান ও দর্শন একই বস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করবার উপায় মাত্র। জগদীশচন্দ্রের লেখনিতে বস্তুসত্য ভাবসত্যে পরিণত হয়েছে। তথ্যকে তত্ত্বে পরিণত করবার, অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধিতে পরিণত করবার এই দুর্লভ ক্ষমতা জগদীশচন্দ্রের ছিল। এই দুর্লভ ক্ষমতাই কবির বাঙ্‌-নির্মিতি উৎস। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তিনটি সত্তা আছে : যেমন কবিসত্তা, বৈজ্ঞানিক সত্তা ও দার্শনিক সত্তা। প্রত্যেক মানুষই কখনও দার্শনিক, কখনও বৈজ্ঞানিক, কখনও কবি। কয়েকজন ক্ষণজন্মা পুরুষ আছেন যাঁরা এই তিনটি সত্তাকে একটি ঐক্যের অঙ্গীভূত করে নিয়ে জগতকে দেখতে, জানতে, প্রকাশ করতে পারেন। জগদীশচন্দ্র এঁদেরই অন্যতম।

জড় ও জীবের সাড়া

সমীরকুমার ঘোষ

'হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে, অরণ্যের অন্তর বেদনা
শুনেছ একান্তে বসি, মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকা বাঁকা
জন্ম-মরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষর রূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।
প্রাণের আগ্রহবার্তা নির্বাকের অন্তঃপুর হতে,
অন্ধকার পার করি আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্ত মাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্মের সাথে মানবমর্মের আত্মীয়তা।"

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের যে বিশেষ আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বকবির এই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হইয়াছিল তাহা হইল 'জড় ও জীবের সাড়া'। তড়িৎ-ধর্ম-সম্বন্ধীয় আবিষ্কারের পর আচার্যদেবের যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তাঁহাকে জগৎ-বিখ্যাত করিয়াছিল তাহা হইল জড় ও জীবের বিশেষত্ব-সম্পর্কীয় গবেষণা। আচার্য বসুর জড় ও জীবের সাড়া-সম্বন্ধীয় গবেষণার বিষয়ই আলোচ্য প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়।

আচার্যদেবের আবিষ্কারের মূল কথা বুঝিতে হইলে, প্রথমে জড় ও শক্তির দু-একটি সাধারণ ব্যাপার জানা প্রয়োজন। জড়েই যে সব শক্তির লীলাভূমি, বা শক্তি-যে জড়কে আশ্রয় করেই আত্মপ্রকাশ করে এ কথা সর্বজনবিদিত। তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সর্ববিষয়েই জড় ও শক্তির যৌথ কার্যের ফল। বিষয়টি খুব ব্যাপক হইলেও প্রত্যেক কার্যের মূলে পৌছাইলে দেখা যায় যে, পদার্থের অণুগুলির বিন্যাস বিকৃত ও চঞ্চল করাই শক্তির প্রধান কার্য। তড়িৎ-তরঙ্গের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া জড়পদার্থ মাত্রেরই, সে ধাতুই হোক বা অধাতুই হোক, সকলেরই পৃষ্ঠদেশের অণুগুলি বিচলিত হইয়া থাকে। মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ লইয়া তাহাদের তড়িৎ-প্রবাহ পরিচলন সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের মৌলিক অবদান সর্বজনবিদিত। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ লইয়া আলোচনা ও পরীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ আচার্যদেব যে কিরূপে জড় ও জীবের সাড়া সম্বন্ধে উৎসাহী হইয়া পড়িলেন সেই সম্বন্ধে যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহা

হইলে বুঝা যাইবে যে, তাঁহার চিন্তাশক্তি কিন্তু একটি নির্দিষ্ট যুক্তিধারা অবলম্বন করিয়াই অগ্রসর হইয়াছিল।

জগদীশচন্দ্র তাঁহার নিজস্ব তৈয়ারী কৃত্রিম চক্ষুর উপর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ফেলিয়া পরীক্ষাকালে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, কৃত্রিম চক্ষুর সাড়ার পরিমাণ বহুক্ষণ কার্য করিতে করিতে ক্রমশ স্বল্প হইয়া আসে। বারংবার এই পরীক্ষা করিয়া তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন যে, প্রাণীর ন্যায় জড়েরও বাইরের আঘাত সহ্য করিতে করিতে একটা ক্লান্তি বা অবসাদ আসিয়া পড়ে। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়াই তিনি এই বিষয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার-স্রোত যদি এই অনুমান পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়া যাইত, তাহা হইলে হয়তো অনেকেই বিস্মিত হইতেন। কিন্তু সেই স্রোত এক নূতন পথ অবলম্বন করিয়া নূতন দিকে প্রবাহিত হইল। জড় ও জীবের উপর তাঁহার কার্যাবলী সম্বন্ধে অনুধাবন করিতে হইলে প্রথমেই জড় ও জীবের পার্থক্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটু স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এ কথা সত্য যে, নির্জীব জড়ের ও জীবন্ত জীবের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড ব্যবধান আছে। জীবদেহে সাধারণত জড়পদার্থের স্বধর্মই বিদ্যমান। জীবদেহের শ্বাসগ্রহণ, রক্ত সঞ্চালন, খাদ্য পরিপাক প্রভৃতি কার্যাদি সাধারণ জড়বিজ্ঞানের পরীক্ষিত তত্ত্বের সাহায্যে বুঝা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞের মতে, জীবন-তত্ত্বের সমগ্র অংশ কখনই জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তাঁহাদের মতে রাসানিক, তাপ বা তড়িৎ ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোন এক প্রভাব-শীল ক্রিয়ার সাহায্যেই জীবনযন্ত্র প্রধানত কার্য করে। এই অজ্ঞাত অপরিচিত শক্তিকে জীবনীশক্তি (vital force) বলা যাইতে পারে। এই শক্তি কখনই জড়বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয় অর্থাৎ জড় পদার্থে এই জীবনীশক্তি অবর্তমান। সেইজন্য জড় চিরকালই জড়। আর জীবদেহে এই শক্তি বিদ্যমান বলিয়াই জীবদেহে জীবন আছে। এই শক্তির অস্তিত্বই মূলত জড় ও জীবের বিরোধের কারণ।

কিন্তু অপর এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের মত অন্যরূপ ছিল। তাঁহারা স্বতন্ত্র জীবনীশক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, জীবনের সব ধর্ম এখনও জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে উপলব্ধি না করিতে পারিলেও, ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিবে, যখন উন্নত জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে জীবনের সকল রহস্য সমাধান করা সম্ভব হইবে। তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, জীব-দেহের ও জড়দেহের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই। জীবন্ত জড়দেহ ও নির্জীব জড়দেহের মধ্যকার চিরন্তন এই পার্থক্য বা প্রভেদ বস্তুত কতখানি তাহা বিশ্লেষণ করিলে এই দাঁড়ায়—

(ক) জীবদেহের বাহির হইতে কোন শক্তি কার্য করিলে উহা সাড়া দেয়। এই সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা জীবদেহের অন্যতম লক্ষণ। চিমটি কাটিলেই আমাদের

মাংসপেশীর সঙ্কোচন ঘটে বা চক্ষুর স্নায়ুতন্ত্রীতে আলোকতরঙ্গ পতিত হইলেই মস্তিষ্কযন্ত্র বিচলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ দেহের অন্যান্য মাংসপেশীকে নাড়াইয়া দেয়। এই সাড়া কখনও সঙ্গে সঙ্গে ঘটে, আবার বহু কাল পরে তা প্রকাশ পায়। এমনও সম্ভব যে, আজ বাহিরের কোন শক্তি সহসা স্নায়ুযন্ত্রে একটি আঘাত দিল বটে কিন্তু সেই আঘাত স্নায়ুতে আবদ্ধ থাকিয়া হয়তো দীর্ঘ ৩০ বছর পরে স্বপ্ন-মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে আত্মপ্রকাশ করিল। বস্তুত পেশী-যন্ত্র বা স্নায়ুযন্ত্র-ঘটিত যাবতীয় ঘটনার মূলে এই সাড়া দেবার ক্ষমতা। সাড়া দেবার এইরূপ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়াই জীবদেহ জড়জগতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ। এইরূপ সাড়া দেবার ক্ষমতাকেই বলা হয় Responsiveness। জড়দেহে কিন্তু এই ক্ষমতা দেখা যায় না। বাহ্যশক্তির প্রভাবে জড়দেহের মধ্যে একপ্রকার বিকাশ জন্মে বটে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। প্রকৃতপক্ষে হার্বার্ট স্পেন্সার জীবনের যে-সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা প্রথমতই সাড়া দেবার ক্ষমতাকে কেন্দ্র করিয়াই।

(খ) জীবদেহ নিজেকে খণ্ডিত ও বিভক্ত করিয়া বংশধারা বজায় রাখে। প্রকৃতপক্ষে একটি জীবদেহ হইতে বহু জীবদেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া পিতৃপুরুষের সকল ধর্ম, প্রকৃতি ও গুণাবলী সম্বল করিয়া জীবনযাত্রা শুরু করিয়া থাকে।

(গ) জীবদেহের বৃদ্ধির ক্ষমতা ও পদ্ধতি জড়দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জড় পদার্থ আপন দেহে উপাদান সঞ্চিত করিয়া বৃদ্ধি পায় কিন্তু জীবদেহ বাহিরের উপাদান অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া সেই উপাদান হইতে শরীরের উপযোগী বস্তু তৈয়ারী করিয়া বৃদ্ধি পায়।

সংক্ষেপে বলিলে, জীবদেহের প্রধান লক্ষণ তিনটি। প্রথম, জীবদেহের বাহ্যশক্তির আহ্বানে সাড়া দিবার ক্ষমতা, দ্বিতীয়, জীবদেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া বংশবিস্তারে সক্ষম এবং তৃতীয়, বাহিরের উপাদান অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া জীবদেহের পূর্ণতা সাধন করিয়া বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষমতা।

জড় ও জীবের মধ্যে এই যে ভীষণ ব্যবধান, আচার্য বসুর আবিষ্কারে তাহা, বিশেষ করিয়া প্রথম ব্যবধানটি দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। জীব-দেহের উপর বাহ্যশক্তির প্রতিক্রিয়া বা সাড়া দিবার ক্ষমতা, যাহাকে responsiveness বলা হইয়াছে, তাহা জীবদেহের প্রতি অঙ্গেই বর্তমান। মাংস-পেশীতে ধাক্কা লাগিলে তাহা সঙ্কোচের ক্ষমতা বা পুনরায় তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের ক্ষমতা ইত্যাদি জীবদেহের স্বাভাবিক ধর্ম। আঘাতে ও উত্তেজনায় মাংসপেশীর যে-প্রতিক্রিয়া ঘটে, সেই বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহ। কিন্তু বিজ্ঞানাচার্য বসু ব্রাডফোর্ড নগরে এক বিদ্বজ্জনের সমাবেশে ঘোষণা করেন যে, এইরূপ প্রতিক্রিয়াশক্তি শুধুমাত্র জীবদেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, জড়-দেহেও ঠিক এইরূপ প্রতিক্রিয়াশক্তি বর্তমান আছে। কোন আঘাতে বা উত্তেজনায় মাংসপেশী যেমন সাড়া দেয়, তড়িৎ-তরঙ্গের আঘাতে নির্জীব জড়

পদার্থও ঠিক ঐ একইভাবে সাড়া দিতে সক্ষম। লৌহভস্মের মত নিতান্ত জড় পদার্থের উপরও তড়িৎ-তরঙ্গের ধাক্কা দিয়া আচার্যদেব দেখাইলেন যে, তরঙ্গের উত্তেজনায় উহার পরিচলন-ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং পরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। তাঁহার মতে, এই পরিচলন-ক্ষমতা বাড়িবার একটা সীমা আছে, সেই সীমায় পৌছাইলে ধাক্কা যতই প্রবল হোক না কেন, পরিচলন-ক্ষমতা আর বাড়ে না। আবার বিশ্রামের অবকাশ না দিয়া বারংবার অতি দ্রুত গতিতে ধাক্কা দিলে পরিচলন-ক্ষমতা আপনার নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বাড়িয়া যায়। আচার্য বসু ইহাকেই 'জড় পদার্থের ধনুষ্টঙ্কার' আখ্যা দিয়াছেন। আবার ইহাও তিনি দেখাইয়াছেন যে, জড় পদার্থে প্রবল আঘাত দিবার ফলে যখন তাহার পরিচলন-শক্তি একেবারে চরম সীমায় উপস্থিত হয় তখন আর শত আঘাত হানিলেও তাহার উপর কোনরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। ইহাকেই 'জড় পদার্থের ক্লান্তি' বলা হয়। এই ক্লান্তি অবশ্য একটি সাময়িক ব্যাধি কিন্তু এই ব্যাধি স্থায়ী হইলেই জড় পদার্থের মৃত্যু ঘটে। অবশ্য ওই অবস্থায় ভালোমত আলোড়িত হইলে বা উত্তপ্ত হইলে জড় পদার্থটি পুনরায় তাহার স্বাভাবিক ধর্ম পালনে সক্ষম হয়। জীবদেহের মত নির্জীব জড়দেহেও বিভিন্ন দ্রব্য প্রবেশ করাইয়া উত্তেজক বা অবসাদকের মত কার্য করান যায়। কখনও কোন দ্রব্য জড়দেহে ঔষধের মত কার্য করে, আবার কখনও কোন দ্রব্য বিষের মত কার্য করিয়া স্বাভাবিক ধর্ম পালনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। শুধু ইহাই নহে, একটি দ্রব্য মাত্রাভেদে কখনও উত্তেজক, কখনও বা অবসাদক। বস্তুত তড়িৎ-ধর্মের প্রভাবে জড়দেহে-যে বিকৃতি আনা সম্ভব এই কথা পূর্বে বিদিত ছিল, কিন্তু সেই বিকৃত অবস্থা হইতে জড়দেহকেও যে জীবদেহের মত স্বাভাবিক অবস্থায় আনা সম্ভব, এই কথা আচার্য বসুর এক পরমাশ্চর্য আবিষ্কার। জীবদেহের মত জড়দেহেও যে প্রথমে বিকার-প্রাপ্তি ও পুনরায় স্বভাব-প্রাপ্তির নিয়ম প্রযোজ্য, এই কথা আচার্য বসুর ঘোষণার পূর্বে যে সকলের নিকট অবিদিত ছিল এ কথা অনস্বীকার্য। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ব্রিটিশ এসোসিয়েশানে এবং পরে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে আমন্ত্রিত হইয়া আচার্য বসু উপস্থিত বিজ্ঞানীদের সম্মুখে তাঁহার এই সকল আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন।

প্রাণীর ন্যায় জড়ের মধ্যেও যে বাহিরের আঘাত পাইয়া ক্লান্তি বা অবসাদ আসিয়া পড়ে এ তথ্য জগদীশচন্দ্র প্রথম অনুমান করেন তখন, যখন তিনি তাঁহার তৈয়ারী কৃত্রিম চক্ষুর উপর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ-সংক্রান্ত পরীক্ষা চালাইতেছিলেন। কৃত্রিম চক্ষুর উপর আপতিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গের ফলে তাহার মধ্যে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার মূল কারণ চক্ষুমধ্যস্থ পদার্থের আণবিক পরিবর্তন। আচার্যদেবের এই মত যখন সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তিনি চিন্তা করিলেন যে, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দ্বারা যদি আণবিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়

তবে বাহির হইতে উত্তেজনা দ্বারাও ঐরূপ পরিবর্তন ঘটানো কেন সম্ভব হইবে না? আর পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হইলে সেই পরিবর্তন সাড়া রূপে অবশ্যই দেখা দিবে। পরীক্ষাস্বরূপ জড় পদার্থে তিনি ক্লোরোফর্ম বা ঐ জাতীয় মাদক দ্রব্য প্রয়োগ করিলেন এবং তজ্জনিত তাহাদের সাড়া লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রথমত উল্লেখযোগ্য যে, জড়, উদ্ভিদ বা প্রাণীদের সাড়া আপনা হইতে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তিনি বিভিন্ন যন্ত্রও উদ্ভাবন করেন। এই সব যন্ত্রে তিনি দেখিলেন যে, একটি ব্যাঙ বা একটি উদ্ভিদের ডগা বা একখণ্ড ধাতব পাত বাহির হইতে একই প্রকারের উত্তেজনার প্রভাবে অবিকল একই ভাবে সাড়া দেয়। সাড়া-লিপির সব কিছুই এক, শুধু লেখক আলাদা—কখনও উদ্ভিদ, কখনও ধাতু, আবার কখনও বা প্রাণী। বিশ্বের বিদ্বজ্জনের সম্মুখে প্রদর্শিত এই পরীক্ষায় আচার্য বসু যখন জড় ও জীবের সাড়া-লিপি তুলিয়া ধরিলেন তখন তাঁহাদের পক্ষে কোন্ লিপি জীবের তাহার প্রভেদ নির্ণয় করাও কঠিন হইয়া পড়িল। এই প্রসঙ্গে আচার্য বসু লণ্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার উপসংহারে তিনি বলেন—

'আলোকে ভাসন্ত ধূলিকণা, পৃথিবীর অগণিত জীব ও আকাশে দীপ্যমান অসংখ্য সূর্যের এক বিরাট ঐক্য যখন লক্ষ্য করিলাম তখন আমার পূর্বপুরুষগণ তিন সহস্র বৎসর পূর্বে ভাগীরথীর তীরে যে মহান সত্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ আমার হৃদয়ঙ্গম হইল—বিশ্বের নিয়ত পরিবর্তনশীল অনন্ত বিচিত্রের মধ্যে যাহারা সেই এককে দেখিতে পায়, সত্য শুধু তাহারাই পায়, আর কেহ নয়, আর কেহ নয়।'

বস্তুত আণবিক বিকৃতির উপর নির্ভর করিয়াই আচার্য বসু সজীব ও নির্জীব সকল পদার্থের সাড়ার সদ্ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। জড়ের উপর শক্তি প্রয়োগে যে-চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়, তাহা যদিও কাহারও অপরিজ্ঞাত ছিল না, তথাপি আচার্য-দেব জড় ও শক্তির এই সুপরিচিত সত্যটির সাহায্যে সজীব, নির্জীব, প্রাণী, উদ্ভিদ প্রভৃতির মূলগত রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া জড়বিদ্যাকে প্রকৃতই এক নূতন রূপ দিয়াছিলেন।

আচার্য বসুর আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত তত্ত্বগুলি তৎকালীন বিজ্ঞানীমহলে যে বাহির হইতে এক 'উত্তেজনার আঘাত' দিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু 'বিজ্ঞানী সমাজরূপ শরীর' সেই উত্তেজনায় কিরূপ সাড়া দিয়াছিল তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বিজ্ঞান যদিও অতি দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করিতেছিল তথাপি স্থিতিশীলতায় বৈজ্ঞানিক সমাজের বুঝি তুলনা নাই। কেহ কোন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিলে বিজ্ঞানীমহলে সেই যুগে আবিষ্কারকে কতকটা সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। বিজ্ঞানীমহল কোন নূতন সত্যকে স্বীকার করিতে রাজী হন না। অজ্ঞাত-কুলশীল অপরিচিত বৈজ্ঞানিক সত্য যতই মনোরম বেশে বিজ্ঞানীমহলের নিকট

আপনাকে উপস্থিত করুক না কেন, বিজ্ঞানীমহল সাধারণত তা জ্বলন্ত আগুনে তাহার 'বিশুদ্ধি পরীক্ষা' না করিয়া তাহাকে কখনই আপন সমাজে স্থান দিতে রাজি হন না। এইরূপ কঠোর অগ্নিপরীক্ষার পর যাহা সত্য তাহা আরও উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হইয়া বাহির হইয়া আসে। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত জড় ও জীবের তত্ত্বগুলিও ঠিক একইভাবে তৎকালে অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তার ফলস্বরূপ? অগ্নিপরীক্ষার পর আচার্যদেবের তত্ত্বগুলি যে কিভাবে সর্বজনস্বীকৃত, সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে মন্তব্য করা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র।

মানুষ জগদীশ বিজ্ঞানী জগদীশ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনান্তের একুশ বছর পরে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। বসু বিজ্ঞান মন্দির সে সময় যে স্মারক-পুস্তিকাটি বের করেন তাতেই প্রথম আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবন ও কর্মের মোটামুটি ইতিহাসটি সর্বজন-সমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা হয়। লজ্জার কথা হলেও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, তার আগে পর্যন্ত জগদীশচন্দ্রকে যথোচিতভাবে স্মরণের লক্ষণীয় প্রয়াসই হয় নি দেশে। অথচ তখনো পর্যন্ত তাঁর গণনীয় শিষ্য এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীরা অনেকেই জীবিত ছিলেন। একি অবহেলা? বলা বাহুল্য, তা নয়। আমাদের জাতীয় প্রবণতার মধ্যেই আছে কোথায় একটা আত্ম-কেন্দ্রিক নির্লিপ্ততা যা কঠোর সমালোচনার ভাষায় কর্তব্যবিমুখিতা আখ্যা পেতে পারে। যাই হোক, শতবার্ষিক উৎসবের আয়োজন শুরু হলে, দেশের নিস্তরঙ্গ আবহাওয়া হঠাৎ একটু নড়েচড়ে ওঠে এবং তার ফলে প্রখ্যিত বিজ্ঞানাচার্য সম্বন্ধে মানুষ আবার নতুন করে ভাবতে বসেন যা নিশ্চিতই সুখের কথা। আমাদের বাল্যবয়সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রাতঃস্মরণীয় বলে গণ্য হতেন যে-বাঙালীরা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যদুনাথ সরকার প্রভৃতি, জগদীশচন্দ্র শুধু তাঁদের অন্যতম ছিলেন না, অনেক হিসাবে তিনি গৃহীত হতেন প্রধানতম দুজনেরই এক জন রূপে, যার অন্যজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং যেহেতু ওঁরা একে ছিলেন অন্যের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, তাই একালীন বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসে ওঁরা স্বীকৃত হতেন অনেকটা কৃষ্ণ ও বলরামের মত। কথাটা বলেছিলেন এক সময় স্বয়ং জগদীশচন্দ্রই।

মনে আছে, প্রবাসীতে যখন রবীন্দ্র-জগদীশ পত্রমালা প্রকাশিত হয় তখন ছাত্র-সমাজে তা কি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। প্রবাসী সম্পাদক একটি ছোট সম্পাদকীয় মন্তব্যে ঐ সময় বলেন যে, বিজ্ঞানী হলেও রবীন্দ্র-সুহৃদ জগদীশচন্দ্র বন্ধুর অনুপ্রেরণায় লাভ করেছিলেন উজ্জ্বল একটি সাহিত্যিক দৃষ্টি যেমন রবীন্দ্র-নাথকে অভিষিক্ত করেছিলেন তিনি জাগ্রত একটি বিজ্ঞান-চেতনায়। মন্তব্যটি সাময়িক হলেও এর মধ্যে সত্যকার একটি দরকারী কথা স্থান পেয়েছে। সবাই জানেন আশা করি যে, বিজ্ঞানী হলেও, জগদীশচন্দ্র চমৎকার সাহিত্যগুণসম্পন্ন প্রবন্ধ লিখতেন। এমন কি, গল্প লেখার প্রয়াসও তাঁর নগণ্য নয়। গল্প লিখে তিনি কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছিলেন যা পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রও। রবীন্দ্র ও শরৎ সাহিত্যের অনুরাগী বোদ্ধা ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সমালোচক হিসাবেও তিনি কম উল্লেখযোগ্য নন। শরৎচন্দ্রকে লেখা তাঁর বিখ্যাত পত্রপ্রবন্ধের কথা

নিশ্চয় অভিজ্ঞ মানুষেরা এখনও ভোলেন নি। এই বহুব্যাপ্ত সাহিত্যনিষ্ঠার মূলে অবশ্যই রবীন্দ্র বান্ধবতা। আবার রবীন্দ্রনাথও যে বিজ্ঞানকে সাহিত্যের আসরে সম্মানের পোশাকে প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন তার পিছনে জগদীশচন্দ্রের প্রেরণাই যে সর্বাধিক কাজ করেছে এতে আর সন্দেহ নেই। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, বিজ্ঞানের বিচিত্র বিভাগে ছোট বড় বহু বিচ্ছিন্ন রচনা ছাড়াও পরমাণুতত্ত্ব নিয়ে পুরো একখানি বই-ই লিখে ফেলেছেন তিনি, এ কম লক্ষণীয় ব্যাপার নয়। যেদিন এ-দুই মহৎ মানুষের সমসাময়িক বা পরিচিত মানুষেরা কেউ থাকবেন না, চাক্ষুষ কোন প্রত্যক্ষ জানার কোন সাক্ষীই হাজির করা যাবে না যেদিন, সেদিন ঊনবিংশ-বিংশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি ও বিজ্ঞানীর এই বান্ধবতার কথা যে-কোন প্রামাণ্য আলোচনায় অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেবে।

কে না জানেন, আগরতলা রাজপরিবারের যে অর্থানুকূল্যে জগদীশচন্দ্র লণ্ডন যান সেখানকার রয়েল সোসাইটিতে তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রদর্শন করতে, তা পেয়েছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতাতেই? আর গল্পগুচ্ছের অনেক গল্প এবং কতকগুলি নাট্যকবিতা যে কবি লেখেন জগদীশচন্দ্রেরই প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণাতেই এও তো আজ সর্বজনবিদিত ঘটনা। কবি-জীবনের শিলাইদহ অধ্যায়ে তাঁর সাপ্তাহিক অতিথিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল এবং লোকেন পালিতের মত তাঁকেও আমরা বার বার তালিকাভুক্ত হতে দেখি। সেই সঙ্গেই দেখি চিঠির মাধ্যমে একে অন্যের সাংসারিক সুখ-দুঃখ নিয়ে আদান-প্রদানের কি অন্তরঙ্গতা! কিন্তু দীর্ঘজীবী দুই বন্ধুর এই হার্দিক নৈকট্য কি শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল? আমার ধারণা তা ছিল না। শেষ জীবনে দেখেছি জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞান-মন্দিরে এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীতে নিজের নিজের আরব্ধ ব্রতে একা চলেছেন। বাইরের দিক থেকে তো বটেই, অন্তরের দিক থেকে যেন উভয়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল বেশ একটু দূরত্বের পর্দা। তা না হলে বিশ্ব-ভারতীতে যখন বিজ্ঞান ভবন প্রতিষ্ঠিত হয় তার নাম 'রাজশেখর ভবন' হল, 'জগদীশ ভবন' হল না কেন? ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্রের জীবনাবসান হলে শ্রীযুক্তা অবলা বসু কেন অমন সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন কবিকে জগদীশচন্দ্রের সম্বন্ধে কিছু লিখুন বলে? অথচ আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে জগদীশচন্দ্রকেই সর্বাধিক অগ্রণী হতে এবং জগদীশচন্দ্র-জন্মজয়ন্তীতেও তার আগে রবীন্দ্রনাথকে সেই বিখ্যাত কবিতা লিখে তাঁকে সাদর অভিনন্দন জানাতে! একি শুধুই বয়সের ক্রিয়া! অধিকতর অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন নেই কি বিষয়টি নিয়ে?

প্রসঙ্গত জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যানুরক্তির এবং রবীন্দ্র-জগদীশচন্দ্র সম্পর্কের কথা এসে পড়লেও ওটা আপাতত এই আলোচনায় গৌণ হয়েই থাকুক। মুখ্যত আমাদের আলোচ্য বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রই। সুতরাং বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরেই

যাচাই করা যাক তাঁর প্রতিভা ও মানসিকতার স্বরূপ। জগদীশচন্দ্র যখন যুবক, বিজ্ঞানচর্চা তখন নামে মাত্র শুরু হয়েছে এ দেশে এবং তা করেছেন মুষ্টিমেয় বিদেশী অধ্যাপক। প্রাচীন ভারতবর্ষের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য থাকলেও, তার সঙ্গে জাতির মনের যোগ গিয়েছিল বিচ্ছিন্ন হয়ে বহু কাল আগেই। কাজেই নিছক পাশ্চাত্ত্য অনুপ্রেরণাতেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন জগদীশ-চন্দ্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর প্রথম দিকের শিক্ষা কলকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে, পরের ধাপের শিক্ষা কেম্ব্রিজে। দুই জায়গাতেই তিনি পেয়েছিলেন ভালো শিক্ষকের হাতে বিজ্ঞানের দীক্ষা। এই শিক্ষাই শুধু মাস্টারি নিয়ে না থেকে তাঁকে উদ্দীপ্ত করল বিজ্ঞানের রাজ্যে হাতে-কলমে নতুন কিছু করতে। দেশে ফিরে এসে তিনি তাই এক দিকে আরম্ভ করলেন অধ্যাপক জীবন, অন্যদিকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ও তড়িৎ-চৌম্বক নিয়ে রকমারি গবেষণা করতে লাগলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের সেই ছোট ঘরটিতে। এখানেই প্রথম বেতারে সঙ্কেতবার্তা পাঠানর সম্ভাব্যতা মাথায় এল তাঁর। এই চিন্তাকে অনেকটা পথ এগিয়েও আনলেন তিনি সম্পূর্ণ একক চেষ্টায়। কিন্তু গবেষণার সমাপ্তিতে পৌঁছতে অর্থ চাই, পোষকতা চাই। তা কোথায় পরাধীন দেশে? কাজেই দেরী হতে লাগল। এদিকে ইতালিয়ান বিজ্ঞানী মার্কনি বের করে ফেললেন বেতার-বার্তা প্রেরণের রহস্য এবং জগদীশচন্দ্রের পালের হাওয়া গিয়ে লাগল তাঁর পালে।

আঘাতটা সোফোক্লিস বা শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে রূপ পাবার মত নিদারুণ তাতে আর সন্দেহ নেই। জীবনের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষিত প্রয়াসের এমন অপমৃত্যু একি সহজ ধাক্কা? ঢের মানুষ হয়তো এ ধাক্কায় জীবনই হারাতেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র ভেঙে পড়লেন না। নিজেকে সামলে নিয়ে আত্মস্থ হলেন তিনি এবং পদার্থবিদ্যার মহল ছেড়ে সম্পূর্ণ আলাদা আর একটা বিভাগে চলে এলেন। সে বিভাগ হল উদ্ভিদ ও প্রাণবিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিজ্ঞান। বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু ও মানুষ যে একই অখণ্ড প্রাণের খণ্ডপ্রকাশ এবং বিবর্তনের পথে ক্রমিক উর্ধ্বগতির ফলেই সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান স্তর-বিন্যাস-গুলি, এ প্রমাণিত হয়েছিল উনবিংশ শতকেই। কিন্তু সর্বনিম্ন সোপানের প্রাণেও যে এক রকমের মনন ধর্ম রয়েছে, বহির্ঘটনার বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে তাদের দেহমনেও-যে লক্ষণীয় নানা প্রতিক্রিয়া হয় এ প্রথম প্রচার করলেন জগদীশচন্দ্রই। এই গবেষণার সহায়ক রূপে আবিষ্কৃত হল তাঁর ক্রেস্কোগ্রাফ যা দিয়ে মাপা যায় উদ্ভিদের সূক্ষ্ম প্রাণ-স্পন্দন। এ থেকেই জগদীশচন্দ্র প্রসিদ্ধ হলেন জগতে উদ্ভিদ-প্রাণাচার্য রূপে। নিষ্ফলতার স্রোত পাড়ি দিয়ে সমুজ্জ্বল সাফল্যের কিনারায় উঠে পড়লেন জগদীশচন্দ্র, এ নিশ্চিতই তাঁর পর্যাপ্ত প্রাণ-শক্তির পরিচয়। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই বিজ্ঞানের পথ ধরে চলে এলেন তিনি দর্শনের রাজ্যে। আর এখানেই হল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ জয়ও, আবার পরাজয়ও।

পরাজয় এইজন্যে, প্রতীচ্যের বিজ্ঞানী-সমাজ জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কারকে তাত্ত্বিক দিক থেকে স্বীকার করলেও অনেকে একে পরীক্ষিত সত্য বলে মানলেন না। আর জয় এইজন্যে যে, প্রতীচ্য থেকে আহৃত বস্তু-বিজ্ঞানের মনীষা নিয়ে যাত্রা শুরু করে তিনি এসে পৌঁছলেন প্রাচ্যের সেই প্রাণধর্মে, যা সব কিছুকেই এক পরম চেতনার অভিব্যক্তি বলে গ্রহণ ও প্রচার করেছে। এই অভিনব তত্ত্বজ্ঞানের আলোয় জগদীশচন্দ্র প্রতিভাত হলেন এক বিজ্ঞানাতিক্রান্ত মহান ব্যক্তিত্ব রূপে। এ থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে, জীবনের শেষার্ধে জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ বোধ পরিহার করে কল্পনাবিলাসী ভাববাদী দার্শনিকদের অনুগামী হয়েছিলেন। তিনি যে নিরীক্ষাবাদী বিজ্ঞানীই এবং আইনস্টাইন, মিলিকান ও ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের মত এমন এক তুঙ্গ বিন্দুতে পৌঁছেছিলেন যেখানে দাঁড়ালে সব অর্ধসত্য এক আদি বৃহৎ সত্যের অন্তর্ভুক্তরূপে প্রতীয়মান হয়, এ বোঝা যায় তাঁর 'Response of the living and the non-living' বা 'জৈব ও অজৈব পদার্থ-সমূহের স্পন্দন' নামক বইটি পড়লে। এই বই, বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তাঁর বৈজ্ঞানিক মনীষার অমূল্য দান, যেমন 'অব্যক্ত' বই তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি। এ ছাড়া, প্রকাশিত হয়েছে তাঁর চিঠিপত্র যাতে কাছের মানুষ হিসাবে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ে সকলেরই। রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, প্রজনন বিজ্ঞান ও শিল্পশাস্ত্র থেকে নৃত্য-গীত, ব্যায়াম ও খাদ্যতত্ত্ব পর্যন্ত এমন জিনিস কমই ছিল যা নিয়ে তিনি না মাথা ঘামিয়েছেন। এই চিঠিগুলি আর একটি দিক থেকেও মূল্যবান দলিল রূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

জ্ঞান-সাধনায় তদ্গত চিত্ত মানুষদের অনেক সময় দেখা যায় সাংসারিক ব্যাপারে বেশ একটু অজ্ঞ বা উদাসীন হতে। জগদীশচন্দ্র কিন্তু ছিলেন এর স্পষ্ট ব্যতিক্রম। সমস্ত ব্যাপারেই, সে ছোট হোক আর বড় হোক, তাঁর ঔৎসুক্য ছিল লক্ষ করার মত। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের মত এত বড় বিরাট প্রতিষ্ঠান যিনি গড়েছেন, যিনি সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞান মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রথম সারির বিজ্ঞানীদের হাতে করে মানুষ করেছেন, তিনিই পদ্মাপারের মাটি খুঁড়ে কিরকম করে কচ্ছপের লুকান ডিম খুঁজে বার করতে হয় তা শেখাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ('পিতৃস্মৃতি' বই দ্রষ্টব্য) এবং বর্তমান লেখককে ইদানীন্তন কালের বিশিষ্ট সাহিত্যিক কয়েকজনের গল্প সংগ্রহ করে দিতে বলছেন, এ সত্যিই নজর করার মত ব্যাপার ছিল! সাধারণভাবে আচার্য জগদীশচন্দ্র একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষই ছিলেন অবশ্য। কিন্তু তাঁর চিঠি থেকেও বোঝা যায় তাঁর স্নেহধন্য মানুষরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও জানেন যে, সমস্ত কথা ও কাজের মধ্য দিয়েই তাঁর ধরা পড়ত সহজ নমনীয় একটি কৌতুকপ্রবণ প্রকৃতি। অর্থাৎ এই জায়গাতেও তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই দোসর। কাস্তে-হাতুড়ি প্রতীক সম্বলিত একখানি বই একজনের

হাতে দেখে একবার বলেছিলেন, কাস্তে হাতুড়ি দুই-ই প্রয়োজনীয় যন্ত্র। তাদের সম্মান করতেই হবে। কিন্তু কলমের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে তা করলে কি ভালো হবে? কাস্তে-হাতুড়ির কীর্তি প্রচারের জন্যেও তো কলমের আঁচড় দরকার! এক চাকরিপ্রার্থীকে বলেছিলেন, সার্টিফিকেট না দেখিয়ে গুরু, জ্যোতিষী বা কবিরাজ হওয়া যায় কিন্তু চাকরি তো হয় না।

জীবপদার্থবিদ্যার প্রগতিতে জগদীশচন্দ্র

পবিত্রানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়

"এই সন্ধ্যায় আমি আপনাদের যা দেখালাম সেটা হল সজীব এবং নির্জীব বস্তুর প্রত্যুত্তর ঘটনা, যন্ত্র লিপিবদ্ধ করে দেখাল। কি অপূর্ব এই মিল সজীব এবং নির্জীব বস্তুর প্রত্যুত্তর ঘটনার লিপিতে। আপনারা কি এই দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখছেন? লিপি দুটিতে তাদের প্রকাশের মিল এত বেশী যে, আপনারা কোনো পার্থক্য দেখাতে পারবেন না। ক্লান্ত হলে প্রকাশক্ষমতা লোপ পায় কিন্তু উদ্দীপকের প্রভাবে জাগরণ ঘটে। আবার বিষপ্রয়োগে জড় বস্তু এবং জীবিত বস্তুর স্বাভাবিক প্রকাশের স্পন্দন থেমে যায়। সুতরাং জীবিত এবং মৃত দুয়ের মধ্যে কোনো সীমারেখা দ্বারা পার্থক্য কি আমরা করতে পারি? অথবা ভৌত পদ্ধতি শেষ হলে শারীরতত্ত্বীয় পদ্ধতির সূত্রপাত—না, সেরকম কোনো বাধা নেই। জড় বস্তু থেকে সজীব বস্তু পর্যন্ত প্রকাশিত জাগতিক পদার্থসমূহের ধর্মের পথ যেন এক। সজীব বস্তুর প্রত্যুত্তর ঘটনা যেন নির্জীব বস্তুর অন্তর্নিহিত ঘটনার ছায়াগামী। বস্তুত শারীরতত্ত্বীয় ঘটনার প্রকাশ ঘটে ভৌত রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে আর এই দুয়ের মধ্যে নেই কোনো বিচ্ছেদ, তাই, তারা অবিচ্ছিন্ন।"

আচার্য জগদীশচন্দ্রের এই বক্তৃতায় সেদিন সমস্ত বিজ্ঞানী সমাজ স্তম্ভিত। সভাগৃহ আলোড়িত। স্থান রয়্যাল ইনস্টিটিউট, সাল ১৯০১। জগদীশচন্দ্র পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখালেও পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকদের কাছে এই তত্ত্ব তখন দুর্বোধ্য ছিল। কারণ ইউরোপীয় বিজ্ঞানী এবং খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাসী লোকদের সহজ জ্ঞান ছিল জীবন একটা মহান—জড় জগত থেকে বহু উচ্চে অবস্থিত। এই প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, "ফিজিওলজি যে ফিজিক্সের অন্তর্গত ইহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না!" কোনো কোনো ফিজিওলজিস্ট বলেছিলেন, "আপনি যে মেটালিক পারটিকলস্ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন কোনো সলিড মেটালকে চিমটি কাটিয়া তাহার অনুভূতি যদি দেখাইতে পারেন তাহা হইলে দ্বিধা থাকে না।" জগদীশচন্দ্র সেই কলটি প্রস্তুত করেছিলেন। চিমটি কাটার ফলে যে অনুভূতি-স্পন্দন হয় তা আপনা-আপনি রেকর্ড হয়, তার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।

রয়্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা দেবার সাতদিন আগে ৩রা মে, ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন থেকে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, "কি অত্যাশ্চর্য নূতন জগৎ আমার কাছে প্রতিভাত হইয়াছে বলিতে পারি না, কি অসীম সত্য সম্মুখে রহিয়াছে। জীবনের স্পন্দন যেমন নাড়ীর দ্বারা বোঝা যায় সেইরূপ জড়েরও জীবনীশক্তির

নাড়ীস্পন্দন আমার কলে লিখিত হয়। তোমার নিকট এক আশ্চর্য রেকর্ড পাঠাইতেছি। স্বাভাবিক নাড়ীর ক্রিয়া দেখিবে, তারপরে বিষপ্রয়োগে নাড়ীর স্পন্দন বিলোপ হইতেছে দেখিবে। জড়ের ওপর বিষপ্রয়োগ হইয়াছিল।"

মহান বিজ্ঞানীর গবেষণা কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। জগদীশচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। সত্য অনুসন্ধানে মহান বিজ্ঞানী যখন অগ্রসর হন তখন সব বিদ্যা একাকার হয়ে যায়। সেখানে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যার আলাদা ভাবে কোনো অস্তিত্ব থাকে না। সেই চরম সত্যের অনুসন্ধানে জগদীশচন্দ্র জড়জগৎ, উদ্ভিদজগৎ এবং প্রাণিজগতের কার্য-পদ্ধতির অভিন্নতা খুঁজে পেয়েছিলেন, এখানেই মহান বিজ্ঞানীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং কৃতিত্ব। সমগ্র বিশ্বে প্রথম স্তরের বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। বর্তমান কালের যাঁরা তৃতীয় স্তরের বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ কিছু গবেষণাপত্রের আলোয় যারা আলোকিত তাঁদের পক্ষে অনেক সময় এটি বোধগম্য হয় না, একজন পদার্থ-বিদ্যার বৈজ্ঞানিক কি করে জীববিজ্ঞানের গবেষণা শুরু করেন, এর আদি রহস্যই বা কি? অথবা এর যথার্থতা সমালোচনা করতেও তাঁরা কুণ্ঠাবোধ করেন না। বর্তমান কালের যাঁরা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, যাঁরা তৃতীয় বিশ্ব থেকে উদ্ভূত তাঁরা যদি প্রথম বিশ্বের বর্তমান গবেষণার গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করেন তা হলে এটা বুঝতে অসুবিধা হবে না, ভৌতবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের সম্মিলিত প্রয়াসেই সেখানকার গবেষণা এগিয়ে চলেছে। আর বিশ্বে এর প্রথম পথ দেখিয়েছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র।

জড়জগৎ এবং জীবজগতের অন্তর্নিহিত সত্যটি যে এক, সেই চরম সত্যটি যে অভিন্ন সেটি প্রমাণ করার সন্ধিক্ষণে তাঁকে টেনে নিয়ে যায় উদ্ভিদ এবং প্রাণিজগতের ওপর গবেষণায়। উদ্ভিদের ওপর বিভিন্ন প্রকার উত্তেজকের প্রভাব অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি প্রাণিজগতেও অনুরূপ প্রভাবের লক্ষণ-গুলির মিল খুঁজে পেতে চেষ্টা করেন। তিনি অনুভব করেছিলেন ভৌত ও শারীরতত্ত্বীয় ধর্মের সঠিক পার্থক্য নিরূপণের প্রয়োজন। অবশেষে দীর্ঘদিন গবেষণা করার পর ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে তিনি ঘোষণা করলেন, "বিগত তিরিশ বছর যাবৎ আমার গবেষণাগারের পরীক্ষার ভিত্তিতে এটা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট যে, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জৈবনিক কার্যপদ্ধতি বিশেষ ভাবে একই প্রকারের। ইহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই।"

জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদ শারীরতত্ত্বের গবেষণা মূলত উদ্ভিদ এবং প্রাণীর দেহ-কোষের গঠন ও কার্যকরী বৈশিষ্ট্যের অভিন্নতার অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এককোষী জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে উদ্দীপকের প্রভাবে প্রোটো-প্লাজমের প্রতিক্রিয়ার ঘটনায় তিনি আকৃষ্ট হন। এই সমস্ত জীবে উদ্দীপকের প্রভাবে প্রোটোপ্লাজমের সঙ্কোচনশীলতা, ছন্দ এবং তড়িৎ সঞ্চালন প্রভৃতি ঘটনাগুলি তিনি প্রত্যক্ষ করেন। এককোষী জীবের এই বৈশিষ্ট্য বহুকোষী

জীবের ক্ষেত্রেও বর্তায়। শারীরবৃত্তীয় কাজের বিভিন্ন বিভাগ অনুসারে এক-একটি নির্দিষ্ট কলা এক-একটি জৈবনিক কাজ সঠিক উপায়ে করে থাকে। প্রাণীকলার ক্ষেত্রে সঙ্কোচন ও উত্তেজনীয়তার কাজ দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গে এবং কতগুলি বিশেষ কলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রাণিদেহে উত্তেজনা গ্রহণ এবং প্রেরণের কাজ যে কলার মাধ্যমে সংঘটিত হয় তাকে নার্ভ বলে। প্রাণিদেহে সঙ্কোচনশীল কলার নাম পেশী। প্রাণিদেহের নার্ভ কোনো প্রকার সঙ্কোচন ছাড়াই উদ্দীপকের প্রভাবে সাড়া দিতে পারে, অপরপক্ষে পেশীকলা সঙ্কোচনশীল এবং সহজেই উত্তেজিত হতে পারে। পেশীকলা ছাড়া নার্ভের এই উত্তেজনীয়তা তড়িৎ-প্রবাহের পরিবর্তনের মাধ্যমে ধরা পড়ে—যে ঘটনা সকল জীবিত কলায় উদ্দীপক প্রয়োগ করলে পাওয়া যায়। প্রাণিজগতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নার্ভ এবং পেশীকলার যেমন পার্থক্য পরিস্ফুট হয়েছে, উদ্ভিদ-জগতে কলার মধ্যে সেরকম কোনো প্রভেদ আসে নি। বরং উদ্ভিদদেহে সংজ্ঞাবাহী অঙ্গ এত বেশী জটিলে পরিণত হয়েছে যে, প্রাণিদেহের মত আলাদা ভাবে পেশীকলা ও নার্ভের পার্থক্য আসে নি।

জগদীশচন্দ্র দেখিয়েছিলেন উদ্ভিদদেহে রসের উৎস্রোত এবং উত্তেজনাপূর্ণ সঞ্চারণ উভয়েই বাহ্যিক কারণের ওপর নির্ভরশীল এবং সেই সঙ্গে চলন ও তড়িৎ-প্রবাহের তারতম্যও ঘটে থাকে, ঠিক এরকম ঘটনা নার্ভ এবং পেশীকলার ওপর প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা যায়।

তাঁর প্রাণী এবং উদ্ভিদের ওপর বিভিন্ন ধরনের গবেষণা, যার ফলস্বরূপ আজকের উন্নতমানের জীব-পদার্থবিদ্যার অগ্রগতি। তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের গবেষণাগুলির মধ্যে অন্যতম হল বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং কৃত্রিম উদ্দীপকের প্রভাবে উদ্ভিদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা। এই গবেষণাগুলির মধ্যে অন্যতম হল উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং ট্রপিক চলন এবং ন্যাস্টিক চলন। ট্রপিক চলনের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ-অঙ্গের গতিপথ উদ্দীপকের গতিপথে প্রভাবান্বিত হয়। যেমন, আলো, অভিকর্ষ, জল, স্পর্শ প্রভৃতির প্রভাবে যে চলন হয়। ন্যাস্টিক চলনের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের চলন উদ্দীপকের গতিপথে চালিত হয় না। কৃত্রিম ভাবে উদ্দীপক প্রয়োগ করে তিনি উদ্ভিদের তড়িৎ-চাঞ্চল্যের প্রকাশ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি আরও দেখান, সকল যান্ত্রিক উদ্দীপনাই তড়িৎ উদ্দীপনার অনুগামী। অনেক সময় যান্ত্রিক উদ্দীপকের উদ্দীপনা জীবের মধ্যে প্রকাশ না ঘটলেও তড়িৎ উদ্দীপনাটি প্রকাশ পায়। এক কথায় প্রাণের সংজ্ঞা এবং জীবনের প্রকাশ বলতে যা বোঝায় তা হল তড়িৎ-চাঞ্চল্যের প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে তিনি ওয়ালারের মতের সঙ্গে এক সিদ্ধান্তে আসেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর মতকে প্রতিষ্ঠা করেন বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। এ ছাড়া প্রোটোপ্লাজমের যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং ধর্ম প্রমাণ ছাড়াই স্বীকৃত ছিল জগদীশচন্দ্র সেইগুলি প্রমাণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী হন এবং সফলতা লাভ করেন। এর মধ্যে প্রোটো-

প্লাজমের তড়িৎ-পরিবাহিতা, সঙ্কোচন এবং প্রসারণ এবং তার ছন্দটির ওপর গবেষণা উল্লেখযোগ্য।

একটি জীবিত কোষের বিভিন্ন ধর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় কোষের নিউক্লিয়াস, সাইটোপ্লাজম, মাইটোকনড্রিয়া এবং প্লাজমা মেমব্রেন বা অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা যেটি কোষের সমগ্র প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে অবস্থান করে। জীব এককোষী হোক আর বহুকোষীই হোক, জীবিত কোষের মৌলিক ধর্মগুলি হল বিপাক ক্রিয়া, যে ক্রিয়া চলাকালীন কোষে যে শক্তি উৎপন্ন হয় সেটি স্থিতিশক্তি হিসাবে সঞ্চিত হয়। এই স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে পরিণত হয় যখন প্রোটোপ্লাজমের সঞ্চিত খাদ্য রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সরল যৌগ পদার্থে পরিণত হয়। কোষের মধ্যে এই ভাঙ্গা-গড়ার কাজ অবিরাম চলে আর এই অদৃশ্য ক্রিয়া দুটির মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে জীবনের জটিল রহস্য। এই অদৃশ্য ক্রিয়া দুটির প্রকাশ ঘটে চলন, উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে। প্রকাশ পায় অভিযোজন ক্ষমতা অর্থাৎ উদ্দীপক অথবা পরিবেশের প্রভাবে বিভিন্ন রকম উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া।

জীবনের জৈব রাসায়নিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিডহাম একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন, জীববিজ্ঞানীরা জীবের কার্যকরণ পদ্ধতির সঠিক মূল্যায়নের স্বরূপটি খুঁজে পান যখন জীবনকে বহুধারার রীতিতে গতিশীল বলে মনে করেন। জীবন বলতে যা কিছু বোঝায় তা হল যেন একটি শক্তির ধারা যে শক্তির প্রভাবে স্বকীয় ভাবে সংরক্ষিত হয় পুষ্টি অর্থাৎ যে-পদ্ধতিতে অধিক পরিমাণে বিশেষ ধরনের শক্তি পূরণ হয় আর সেই সঙ্গে ঘটে বৃদ্ধি যা হল শক্তির বিস্তার। এই ঘটনা যখন ঘটে তখন শক্তিশৃঙ্খলায় অনুপযোগী শক্তির অপসারণ প্রয়োজন। এটি সংঘটিত হয় রেচনের মাধ্যমে। এই সঙ্গে প্রকাশিত হয় আংশিক শক্তির মাধ্যমে সামগ্রিক চলন, খাদ্যগ্রহণ প্রভৃতি কার্য। জীবন-প্রবাহ গতিশীল হয় জননের মাধ্যমে অর্থাৎ স্বনির্ভরশীল নতুন পদ্ধতির সৃষ্টি হয়। প্রজননবিদ্ বিডলের মতে, জীব হল রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমষ্টি, যেটি সময় এবং স্থানের সঙ্গে জটিলভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া এনজাইম বা উৎসেচক দ্বারা সম্পন্ন হয়। উৎসেচক এবং অন্যান্য প্রোটিন জীনের মাধ্যমে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় আর জীনই হল জীবনের ক্ষুদ্রতম ছাঁচ।

জগদীশচন্দ্রের গবেষণার কেন্দ্রে ছিল জীবের বৈশিষ্ট্য অনুশীলন করা, বিশেষ করে, উদ্দীপকের প্রভাবে উদ্দীপনার প্রকৃতি নির্ণয় করা। জীবের এই সকল প্রত্যুত্তর ঘটনার মধ্যে বৃদ্ধি এবং চলন অন্যতম।

তিনি জীবের উত্তেজনীয়তার বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ করেছিলেন পারি-পার্শ্বিক আবহাওয়া বা উদ্দীপকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে পরিবর্তনের স্বরূপটি প্রকাশ করে। আর এই স্বকীয় কার্যাবলী পরিবর্তনের মাধ্যমেই জীবকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। উষ্ণতা, অক্সিজেন গ্রহণ অথবা

কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ প্রভৃতি ঘটনার মাধ্যমে জীবদেহে রাসায়নিক কার্য পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় আর এর প্রভাবেই জীবদেহে প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে। জগদীশচন্দ্র জীবদেহের ওপর উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করেন। সেই প্রতিক্রিয়া বা উদ্দীপকের প্রভাবে প্রত্যুত্তর ঘটনাগুলির প্রকৃতি এরকমই ছিল যে, যার সাহায্যে জীবদেহের জীবত্বের চরিত্রগত গুণগুলি প্রমাণ করা যায়। তিনি প্রমাণ করেছিলেন, তড়িৎ-প্রবাহ প্রোটোপ্লাজমকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। খুব দুর্বল তড়িৎ-প্রবাহও নার্ভ, পেশী প্রভৃতির ওপর উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে। জীবদেহে রাসায়নিক অনুভূতি সর্বজাগতিক সত্য। তড়িৎ-অনুভূতিও জীবদেহের অন্যতম আর একটি বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া, অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যান্ত্রিক প্রভাব, উষ্ণতা এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আলো এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অনুভূতিও জাগতিক সত্য।

তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন কোষের অর্ধভেদ্য পর্দা বা প্লাজমা মেমব্রেনের ওপর উদ্দীপকের প্রভাবে তড়িৎ-শক্তির প্রত্যুত্তর ঘটনা। তিনি এর কারণ দেখিয়েছিলেন। প্লাজমামেমব্রেনের ভেদ্যতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জলীয় দশায় আয়নের ঘনত্বের তারতম্য ঘটে। জীবের ওপর বিভিন্ন পরীক্ষা করে তিনি কোষের তড়িৎ-পরিবাহিতা এবং সঙ্কোচনশীলতা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, এটি সাইটোপ্লাজমের প্রোটিন তন্তুর ওপর নির্ভরশীল। কোষের সঙ্কোচন সম্ভব হয় প্রোটোপ্লাজমের প্রোটিন অণুর কাঠামোটির বিশেষ ভাঁজের জন্য এবং তড়িৎ-সঞ্চালন সম্ভবত প্রোটিন শৃঙ্খলের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে হাইড্রোজেন বণ্ডের স্থানান্তরের জন্য সংঘটিত হয়। আর এই ঘটনাটি সম্ভব হয় প্রোটিন শৃঙ্খলের দুই প্রান্তের আয়নের ঘনত্বের তারতম্যের জন্য। উদ্দীপকের প্রভাবে প্রত্যুত্তরের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় এবং উদ্দীপনার অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে যে শক্তির প্রয়োজন সেটি কোষের জৈবনিক কার্য এবং শ্বাসকার্য থেকে উদ্ভূত হয়। উদ্ভিদের ওপর কোনো উদ্দীপক প্রয়োগ করলে প্রথমে তার প্রতিক্রিয়া হয় প্রয়োগস্থানের কোষসমূহে। এরপর প্রতিক্রিয়ার চঞ্চলতা দূরবর্তী প্রতিক্রিয়াশীল কোষসমূহে পরিবাহিত হয়ে চঞ্চলতা প্রকাশ করে।

জগদীশচন্দ্রের মতে, উদ্দীপকের প্রভাবে উদ্ভিদদেহ কোষের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হল কোষের সঙ্কোচন, যার ফলে কোষ থেকে কোষরস বাইরে আসে। এই নিঃসৃত রস কোষমধ্যবর্তী স্থানে জমা হয় এবং সেই সঙ্গে পার্শ্ববর্তী জাইলেমে, যে জলস্থিতি চাপ জলযান্ত্র প্রক্রিয়ায় উদ্দীপকের প্রয়োগ স্থান থেকে উদ্দীপনা প্রকাশকারী স্থানে সঞ্চারিত হয়। কোষের রসস্ফীত চাপের হ্রাসের প্রধান কারণ হল অর্ধভেদ্য পর্দার ভেদ্যতা বৃদ্ধি। এর ফলে স্থানীয় স্থিতিশক্তির হ্রাস ঘটে আর সেটি পূরণ করার জন্য নিকটবর্তী স্থান থেকে স্থানীয় তড়িৎ প্রবাহিত হয়। এইরূপ চাঞ্চল্যটি তড়িৎ প্রকৃতির হয়ে পরিবাহিত হয়। এই-রকম চাঞ্চল্যের পরিবহণ দেখিয়েছিলেন তিনি মাইমোসা (লজ্জাবতী) এবং

বাইয়োফাইটাম (ভুঁই আমলা) উদ্ভিদে। এই সমস্ত শারীরতত্ত্বীয় সূত্রের সাহায্যে তিনি আরও প্রমাণ করেছিলেন, প্রাণী-কলাতেও অনুরূপ চাঞ্চল্য পরিবাহিত হয়।

তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান আবিষ্কার প্রোটোপ্লাজম পরিবৃত্ত নালিকার মাধ্যমে স্থানীয় তড়িৎ-চাঞ্চল্যটি প্রত্যক্ষ করা। সেই সময় তাঁর এই আবিষ্কার যদিও বিতর্কিত ছিল, পরবর্তী কালে ব্লিঙ্ক, ওস্টারহাউস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ জলজ শৈবাল **কারা** এবং **নিটেলার** ওপর পরীক্ষা করে তাঁর তথ্যের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। বর্তমানে উদ্ভিদ এবং প্রাণী-কলায় প্রোটোপ্লাজম পরিবৃত্ত এই সকল নালিকার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে যার মধ্য দিয়ে তড়িৎ-চাঞ্চল্য প্রবাহিত হয়। তিনি আরও দেখান, **মাইমোসা** (লজ্জাবতী) উদ্ভিদে পাতার বৃন্তে ফ্লোয়েমই বিশেষ নালিকা যার মধ্য দিয়ে এ-রকম চঞ্চলতা পরিবাহিত হয়। ইলেকট্রিক প্রোবের সাহায্যে উদ্ভিদের কয়েকটি কলার চিহ্নিতকরণ এবং তার বিশেষ বিশেষ কাজগুলি জানা সম্ভবপর হয়েছে। এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ কাজগুলির মধ্যে মাধ্যাকর্ষণজনিত উদ্দীপকের অনুভূতি, চঞ্চলতার প্রেরণ, স্পন্দন-শীল কোষের মাধ্যমে কোষের রস প্রেরণ প্রভৃতি নতুন নতুন তথ্য জানা সম্ভবপর হয়েছে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পদ্ধতিগুলির প্রবর্তনও সম্ভব হয়েছে। হাই-ড্রোলিক চাপের মাধ্যমে চাঞ্চল্য প্রেরণের পদ্ধতিগুলি তখন জানা সম্ভব ছিল না যেগুলি জগদীশচন্দ্র বিস্তৃতভাবে অনুশীলন করেছিলেন। তাঁর মতে যে দূরত্বে শারীরবৃত্তীয় চাঞ্চল্য প্রেরিত হয় তা খুব সীমিত, কারণ উদ্ভিদকলার পরিবহণের ক্ষমতা প্রাণীর নার্ভকলার মত তত উন্নত নয়। স্বভাবতই উদ্ভিদকলার এই প্রকার স্বল্প পরিবহণ-ক্ষমতার দরুন অতিদূরত্বে জলযান্ত্রবাহকের মাধ্যমে চাঞ্চল্য প্রেরণের কাজটি হয়ে থাকে, যার ফলে প্রত্যুত্তর স্থানে রসস্ফীত চাপ বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্ভব হয় এবং গ্যালভ্যানোমিটারে ধনাত্মক তড়িৎ-চঞ্চলতা-রূপে প্রকাশ পায়। অপরপক্ষে কার্যকরী তড়িৎ-প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবাহিত চঞ্চলতা প্রত্যুত্তর স্থানে রসস্ফীত চাপের হ্রাসের ফলে সঙ্কোচন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্যালভ্যানোমিটারে ঋণাত্মক চঞ্চলতা প্রকাশ পায়। এই প্রকার উদ্দীপকের প্রভাবে দ্বৈত প্রত্যুত্তর সূত্র জগদীশচন্দ্রকে অনেক মৌলিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করেছিল। এইগুলির মধ্যে উদ্ভিদকলার চঞ্চলতা পরিবহণের প্রকৃতি নির্বাচনে উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং ট্রপিক (দিগ্‌নির্ণীত) চলন এবং ব্যাপ্তি বা ন্যাস-টিক চলন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উদ্ভিদের জৈব কার্যপদ্ধতিগুলি বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করে জগদীশচন্দ্র এই সকল সাধারণ সূত্রগুলির প্রমাণ দিয়েছেন।

উদ্ভিদের প্রত্যুত্তর গবেষণায় তাঁর বিশেষ অবদান তিনি উদ্ভিদের কার্যকরণ পদ্ধতিতে চঞ্চলতা পরিবহণের দ্বৈত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ একটি জলযান্ত্রিক এবং অপরটি শারীরতত্ত্বীয়—যে দুটি প্রত্যুত্তর অঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন ফল প্রদান করে। জগদীশচন্দ্র সেই যুগে একজন তড়িৎ-শারীরতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক হয়েও জৈব

তড়িৎ-শক্তির প্রভাবে যার ফলস্বরূপ বৃদ্ধি, কোষবিভাজন, রেচন প্রভৃতি কার্য তড়িৎ-চাঞ্চল্যের মাধ্যমেই ঘটে থাকে বলে প্রমাণ করেছিলেন।

তাঁর স্বীকৃত গবেষণা যে সত্যের সন্ধান দিয়েছিল তা অভূতপূর্ব। উদ্ভিদ ও প্রাণীকলার মধ্য দিয়ে তড়িৎ-পরিবহণের দিক নির্ণয়ের সঙ্গে বিপাক কার্যের সম্বন্ধটি আজ সর্বজনবিদিত। তাঁর এই গবেষণা বিপাক কার্য সম্বন্ধে নতুন তথ্য যোগাতে সাহায্য করেছে। তিনি দেখিয়েছিলেন যখন প্রোটোপ্লাজমের স্তর থেকে তড়িৎ বাহিরের দিকে ধাবিত হয় তখন জারণ কার্য এবং নতুন অঙ্গ সৃষ্টি করতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। বৃদ্ধি, সংস্কার ও উদ্দীপনামুক্ত অবস্থা হল রাসায়নিক কার্যের প্রকাশ, যেটি প্রকৃতপক্ষে একটি জারণ-প্রক্রিয়া। এই জারণ-প্রক্রিয়া একটি মেরুতেই সংঘটিত হয়। অন্য মেরুতে ঠিক বিপরীত বিক্রিয়া ঘটে। উপযুক্ত চঞ্চলশীল কলার মধ্যে চঞ্চলতার পরিবেশ সৃষ্টি করে আর তার ফলেই বৃদ্ধি অথবা বর্ধনশীল অঙ্গের বৃদ্ধি ব্যাহত অথবা বন্ধ হয়। উদ্ভিদের এই সমস্ত কার্যাবলীর শক্তির উৎস হল রাসায়নিক বিপাকীয় কার্য যেটি নিয়ন্ত্রিত হয় হরমোন, ভিটামিন, অক্সিন প্রভৃতির দ্বারা আর তাঁর সময়ে এদের কাজগুলি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। দেবেন্দ্রমোহন বসু এই সমস্ত গবেষণার পূর্ণ-মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, অনেক জীবিত কলায় বিপাকীয় কার্যের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু হল সাবস্ট্রেট এবং উৎসেচক, যে দুটি সবসময়ে পাশাপাশি থাকে এবং এদের স্থানীয় আয়নের ঘনত্বের পরিবর্তনটি বাহির অথবা নিকটবর্তী স্থান থেকে চঞ্চলতা পরিবহণের মাধ্যমে প্রভাবান্বিত হয়, আর এর ফলেই কোষে রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু অথবা বন্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মাইমোসা (লজ্জাবতী) উদ্ভিদের পত্রবৃন্তে উদ্দীপক প্রয়োগ করলে যে-উদ্দীপনা দেখা যায় সেটি নার্ভ পেশীকলা এককের উদ্দীপনার সঙ্গে সমতুল্য। তিনি আরও দেখান, বনচাড়াল গাছের ছিন্ন পত্রবৃন্তের স্পন্দনটি প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের অনুরূপ। তিনি দেখেছিলেন বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করলে পত্রবৃন্ত এবং হৃৎপিণ্ড একইরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের শক্তির উৎস হল গ্লাইকোজেন। পরবর্তী কালে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এর ওপর আরও গবেষণা করা হয় এবং পত্রবৃন্তের স্পন্দনের শক্তির উৎস শর্করা বলে প্রমাণিত হয়েছে, যেটি গাছ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় তৈরী করে থাকে।

জগদীশচন্দ্র একজন জীবপদার্থবিদ্ ছিলেন। তিনি উদ্ভিদ-শারীরতত্ত্বীয় ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করেছিলেন কতগুলি মৌলিক বিষয়বস্তু নিয়ে, যেমন, প্রোটো-প্লাজমের বৈশিষ্ট্য, উদ্দীপনার প্রকৃতি নির্ধারণ, উদ্দীপনা পরিবহণের দ্বৈত ভূমিকা এবং প্রতিক্রিয়াশীল কলার বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ। এই সমস্ত গবেষণা করতে গিয়ে তিনি যে-শ্রম দান করেছিলেন এবং এটি যে কত কষ্টকর তাঁর গবেষণার দিকগুলি নিয়ে কিছু কিছু অনুশীলন করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পারছি, বলেছিলেন ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু তাঁর একটি গবেষণাপত্রে। এই

সমস্ত পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতির ব্যবহারিক সংগ্রাহক যন্ত্র প্রস্তুত করেছিলেন যার সাহায্যে যান্ত্রিক এবং তড়িৎ-শক্তির প্রকাশ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর মতে, কোষের রসসঞ্চালন এক প্রকার বিশেষ কোষের সঙ্কোচন এবং প্রসারণের ফলে সংঘটিত হয় এবং এর ফলেই মূল থেকে সংগৃহীত রস পাতায় যায়। বর্তমান গবেষণায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে কোষরসের কতগুলি অতি প্রয়োজনীয় অজৈব মৌলকণা পূর্ণবর্তনীর মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণ করে। এই পরিভ্রমণটি কাণ্ডের ফ্লোয়েম এবং জাইলেম স্তরের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়, সেই সময় মূল এবং পাতা অগ্রজ যন্ত্র (টারমিনাল অরগান) হিসাবে কাজ করে এবং প্রক্রিয়াটি জারণ প্রক্রিয়া দ্বারা সংঘটিত হয়।

উদ্ভিদ-শারীরতত্ত্ববিদদের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি দেখান উদ্ভিদের কাণ্ড ও মূলের ট্রপিক চলনের সঙ্গে তড়িৎক্ষেত্র বিশেষভাবে জড়িত। জগদীশচন্দ্র আরও দেখান, উদ্ভিদের বক্রতা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যেটাই হোক না কেন, তড়িৎক্ষেত্রজনিত বক্রতা একই দিকে ধাবিত হয়। উদ্দীপকের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাবে কাণ্ড ও মূলের ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক অভিকর্ষবৃত্তীয় ও আলোকবৃত্তীয় বক্রতা এবং দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে উদ্দীপনাটির সঞ্চালন একটি উল্লেখ-যোগ্য কার্যকরী ঘটনা। এর সঙ্গে বৃদ্ধি-সহায়ক অক্সিনের কার্যকরী প্রভাব সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেন নি, কারণ অক্সিন আবিষ্কার তাঁর গবেষণার সময় থেকে অনেক পরে হয়েছিল। বর্তমান গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে ট্রপিক বক্রতার জন্য স্বতন্ত্র তড়িৎক্ষেত্র এবং অক্সিন উভয়েরই প্রয়োজন। শুধুমাত্র অক্সিন সূত্রের মাধ্যমে কাণ্ড ও মূলের বিপরীত অভিকর্ষবৃত্তীয় বক্রতার প্রমাণ খুব স্পষ্ট নয়, সেইজন্য সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্যও নয়।

তিনি প্রমাণ করেছিলেন, জীবিত কোষের চাঞ্চল্য কোষের প্লাজমাপর্দার ওপর নির্ভরশীল, যেটি পরিবর্তনশীল অর্ধপরিবাহী স্তরের ন্যায় কাজ করে। এই স্তরটি দুটি ভিন্ন ঘনত্বযুক্ত আয়নের তরল অবস্থাকে পৃথক রাখে। উদ্দীপকের ক্রিয়া যখন শুরু হয় তখন অস্থায়িভাবে ক্ষণিকের জন্য অর্ধপরিবাহী স্তরটি পরিবর্তিত হয়ে ভেদ্যতা ও পরিবাহিতা বৃদ্ধি করে।

জগদীশচন্দ্রই প্রথম যিনি অজৈব মডেল (Inorganic model) প্রস্তুত করেন, যেটি জীবিত কোষের মত উদ্দীপকের প্রভাবে সাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিল। এই রকম অনেকগুলি মডেল তিনি প্রস্তুত করেছিলেন তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য মডেলটি ছিল একটি কাচের পাত্র যার মধ্যে থাকে জল আর তার মধ্যে দুটি টিনের তার ডোবান থাকে। তার দুটির নিচের প্রান্তদেশ একটি কাঠের প্লেটের সঙ্গে আটকানো থাকে ও উপর প্রান্তদেশ একটি ইবোনাইট প্লেটের মধ্য দিয়ে বাহিরে আসে এবং এটিকে ইচ্ছামত মোচড়ানো যায়। তার দুটির একটি গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে যুক্ত থাকে যেটি তড়িৎ-প্রবাহের সঙ্কেত গ্রহণের জন্য

প্রয়োজন। তিনি দেখিয়েছিলেন, কোনো একটি তারকে মোচড়ালে গ্যাল-ভ্যানোমিটারে তড়িৎ-প্রবাহ ধরা যায়। সব ক্ষেত্রেই তড়িৎ-প্রবাহ মৃদু উদ্দীপনার স্থান থেকে বেশি উদ্দীপনার স্থানের দিকে ধাবিত হয়। এই রকম মডেলের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছিলেন তাঁর অজৈব মডেলটি জীবিত কোষের মত যান্ত্রিক উদ্দীপকের প্রভাবে সাড়া দিতে পারত। এই রকম অনেক মডেল তিনি তৈরী করেছিলেন যেগুলি অনেক তথ্য বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করেছে। তার মধ্যে প্রত্যুত্তরের বৈশিষ্ট্য, ক্রমাগত উদ্দীপনার অবস্থা থেকে উদ্দীপনামুক্ত অবস্থায় ফিরে আসার বৈশিষ্ট্য, উদ্দীপক প্রয়োগের হারের সঙ্গে প্রত্যুত্তরের হারের সম্পর্ক এবং অবসাদ প্রাপ্ত অবস্থায় বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি।

জার্মান ভৌত রসায়নবিদ্ বনহেফার মডেল প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় লৌহ নির্মিত তার এবং নার্ভ রাসায়নিক প্রকৃতির দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কিন্তু ইহার কার্যকরী ক্ষমতা একই।" জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্ব এখানেই, তিনিই প্রথম অজৈব মডেলে উদ্দীপকের প্রভাব এবং তার প্রকাশ লিপিবদ্ধ করেন। ত্বকের ওপর চিমটি কাটলে যে অনুভূতি এবং চিমটির তীব্রতা অনুসারে অনুভূতির প্রকাশ তার মডেলটি সেরকম লিপিবদ্ধ করতে পারত। পরবর্তী কালে তিনি ধাতব তারের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে প্রত্যুত্তর অনুভূতি বিশ্লেষণ করেন আর এর সাহায্যেই আবিষ্কার করেন অণুর চাঞ্চল্য সূত্র।

তাঁর আবিষ্কৃত অজৈব মডেলটির প্রতিশ্রুতি আজকের দিনে চিকিৎসাশাস্ত্রে উন্নত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির প্রসার। এর মধ্যে ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাম, ইলেকট্রোএনকেফালোগ্রাফি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া, তাঁর মডেলটির কার্যকরী পদ্ধতি প্রযোগ হয়েছে র‍্যাডার, স্বয়ংক্রিয় মিসাইল আলট্রা কম্পিউটার প্রভৃতি সূক্ষ্ম উন্নত যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করতে। আরও আশ্চর্যের বিষয়, তিনি দেখিয়েছিলেন এই সমস্ত যন্ত্রের কার্যকরণ পদ্ধতি উচ্চতর প্রাণীর সংগ্রাহক এবং ক্রিয়াশীল অঙ্গের কার্যপদ্ধতির সমতুল্য।

অবিস্মরণীয় এক মুহূর্ত। জীবিত এবং জড়বস্তু প্রকাশমান জগতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিন্তু আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপে তারা অভিন্ন। কোন্‌টা সত্য? প্রথমটি অথবা দ্বিতীয়টি? জগৎ সত্য না ব্রহ্ম সত্য? জগদীশচন্দ্র সেই সত্যে পৌঁছে-ছিলেন যেখান থেকে তিনি দেখেছিলেন বস্তুজগতের অপ্রকাশ্য বিচ্ছুরণকারী আলো, যে আলোয় পথ দেখিয়েছে নতুন এক বিজ্ঞানের জগৎ, জন্ম দিয়েছে বিজ্ঞানের নতুন একটি শাখা, নাম "সাইবারনেটিকস"।

ওয়েনার সাইবারনেটিকস বিজ্ঞানের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, যে বিজ্ঞান যন্ত্র অথবা প্রাণী অথবা উভয়েরই সবরকম আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও যোগা-যোগের সূত্র সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভে সাহায্য করে তার নামই "সাইবার-নেটিকস"।

এই বিজ্ঞানের সাহায্যে জীব ও জড়ের একাত্মতা বা অভিন্ন রূপটি ব্যাখ্যা করা

সম্ভব হয়েছে। যেমন, প্রাণীর নার্ভের কার্যকরণ পদ্ধতি তার মডেলের কার্যকরণ পদ্ধতির সমতুল্য। বিজ্ঞানী ওয়েনার এই বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন, ফলে সাইবারনেটিকস্ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কার্যকারিতার প্রসার সম্ভব হয়েছে। জগদীশচন্দ্র "সাইবারনেটিকস" বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছিলেন, তার ফলে মস্তিষ্কের ক্রমাগত তড়িৎস্পন্দনের প্রতিধ্বনি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে, সম্ভব হয়েছে শারীরতত্ত্বীয় প্রবৃত্তি সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য যোগানো। কম্পিউটারেব কার্যকরণ পদ্ধতিটি প্রাণীর মস্তিষ্ক ও নার্ভতন্ত্রের কার্যকরণ পদ্ধতির সমতুল্য। যোগাযোগ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় যে-ইলেকট্রনিক টিউব ব্যবহার করা হয় সেটি প্রাণীর নার্ভের কার্যকরণ পদ্ধতির অনুরূপ। নার্ভকোষ বা নিউরোন ইলেকট্রনিক রিলে প্রথায় কাজ করে থাকে বলে জানা গেছে। ঋণাত্মক পূর্ণযোজনের মাধ্যমেই তাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রিত হয়, যে-পদ্ধতি প্রাণীর নার্ভতন্ত্রেও কাজ করে থাকে। যেমন, রক্তের চাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে ক্যারোটিড সাইনাসের স্ট্রেচ-রিসেপটর উত্তেজিত হয়, ফলে তাড়নাটি ভেসোমটর কেন্দ্রে প্রবাহিত হয়ে রক্তচাপ হ্রাস করে আনে।

এক একটি যুগের গবেষণা বিগত যুগের গবেষণাকে অনুসরণ করে। বর্তমান যুগ হল যোগাযোগ এবং তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যুগ আর তার গোড়াপত্তন করে গেছেন জগদীশচন্দ্র। সেই সঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের বিভিন্ন কার্যকরী বৈশিষ্ট্য অনুশীলন করে ব্যবহারিক জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন এক পথ দেখিয়ে গেছেন যার ফলস্বরূপ উন্নত ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যা আজ রোগ নির্ণয়নের এবং রোগ উপশমের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। দুর্ভাগ্য ও দুঃখের বিষয়—তাঁকে নোবেল জয়ী করা হয় নি, এর কারণ বিশ্লেষণ করার সময় অনেক দিন পার হয়ে গেছে। তবু আজকের দিনে পশ্চিম বাংলা তথা ভারতবর্ষের কোনো বিদ্যালয় অথবা কলেজের ছাত্র যদি জগদীশচন্দ্রের নাম শোনে নি বলে, তার জন্যে দায়ী থাকবে কে?

[প্রবন্ধটি D. M. Bose-এর লেখা J. C. Bose's Plant Physiological Investigations in relation to modern Biological Knowledge, published in Trans Bose Inst. Vol. XVII, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের শ্রীদিবাকর সেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের চিঠিপত্র প্রভৃতি গবেষণাপত্রের ছায়া অবলম্বনে লিখিত।]

স্বদেশী জগদীশচন্দ্র

কুমারেশ ঘোষ

তখন আমি ছোট। গড়পারে থাকি। কাছেই বোস ইনষ্টিউটের বা বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখি, স্যার জগদীশ বোস সদর গেটের কাছে পায়চারি করছেন।

গায়ের রং ধব্‌ধবে ফরসা, মাথার চুলগুলো কাশফুলের গুচ্ছের মতো সাদা কোঁকড়ানো, পরনে ধুতি না পায়জামা মনে নেই তবে সিল্কের পাঞ্জাবী, পায়ে চটি এবং কর্মব্যস্ত হাত দুখানি পেছনে যুক্ত—মাথা নীচু করে কী যেন ভাবচেন আর পায়চারী করছেন। একবার আসছেন সদর গেটের কাছে, আবার খানিকটা ভেতরে চলে যাচ্ছেন। আমি যে একটি ছেলে হাফপ্যাণ্ট-সার্ট পরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছি, সেদিকে তাঁর বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই।

সেদিন জানতাম, তিনি বড় বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, আবিষ্কার করেছেন গাছের প্রাণ আছে। ব্যস! তা ছাড়া তাঁর ছবি আর খবর বেরোয় খবরের কাগজে। অর্থাৎ ধনে-মানে বেশ বড়লোক। আর ম্যাট্রিকে পড়তে হলো তাঁর লেখা 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে'। বড্ড খটখটে ভাষা, রসের উৎস কোথাও খুঁজে পেলাম না। তবু গিলতে হল। পাঠ্য !!

আমি যেদিন আচার্য জগদীশচন্দ্রকে প্রথম এবং শেষবার দেখেছিলাম তাঁকে চিনতে পারি নি, জানতে পারিনি। যখন জানতে পারলাম, তখন তিনি ইহধামে নেই, তবে আমাদের জন্য রেখে গেছেন নানা অমূল্য সম্পদ।

কলকাতার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে গড়পারের এই এলাকাটি যেন ভারতীয় সাহিত্য-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের লীলাভূমি। ভারত-পথিক রাজা রাম-মোহন রায়ের বাসগৃহ, রামমোহন লাইব্রেরী, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়, ফেডারেশন হল, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়, নারী শিক্ষা সমিতি, শ্যামাদাস আয়ুর্বেদিক চিকিৎসালয়, এম. এন. চ্যাটার্জী চক্ষু চিকিৎসালয়, লেডিজ পার্ক, গিরিশ বিদ্যারত্নের বাসগৃহ ও সেই নামের রাস্তা, সায়েন্স কলেজ এবং আচার্য জগদীশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বসু বিজ্ঞান মন্দির।

অদ্ভুত বাড়িটা ঐ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের। আশেপাশের অতগুলি স্ব স্ব প্রধান অট্টালিকার মধ্যে ঐ বিজ্ঞান মন্দিরের বাড়িটি যেন ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের মুকুটমণি। কারুকার্য কারোর চোখে এড়াবার নয়। সৌন্দর্য আর সুরুচিবোধের অপূর্ব প্রকাশে সারা বাড়িটা সমুজ্জ্বল। এমন যে বাড়ি, সে বাড়ির মালিক না জানি কি?

তিনি কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক। অথচ বিজ্ঞানাচার্যরূপেই বিশ্ববিখ্যাত।

আর আশ্চর্য, ঐ বৈজ্ঞানিক একাধিকবার বিলেত গেছেন, সেখানে নানাভাবে জয় করেছেন উঁচুদরের সব বিলেতী মন, অথচ নিজের মনটিকে ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির খুঁটিতে বাঁধা রেখেছেন আজীবন। বিলেতী অনুকরণ করেন নি, কায়মনোবাক্যে অনুসরণ করেছেন ভারতীয় ঐতিহ্যকে।

বেতার-যন্ত্র, উদ্ভিদ-জীবন ইত্যাদি আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বিশ্ব-খ্যাত হয়েও তিনি তাঁর বাঙালীয়ানা ও স্বদেশীয়ানা ভোলেন নি। তা ছাড়া, বাংলা সাহিত্যে তাঁর সহযোগিতা কম ছিল না। নীরস বিজ্ঞান তাঁকে শুকনো করে দিতে পারে নি। পল্লবিত গাছের মতোই তিনি ছিলেন সরস সতেজ সবুজ। হাস্যরসের প্রাচুর্য ছিল তাঁর মনে-প্রাণে।

ইংরেজ সরকার যখন জগদীশচন্দ্রকে C I E বা Companionship of the Indian Empire উপাধি দেন তখন তিনি রসিকতা করে তাঁর বন্ধুবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখলেন 'আমি একটি পুচ্ছ অর্জন করেছি।'

একবার এক ভদ্রলোক কথায় কথায় জগদীশচন্দ্রের পকেটঘড়ির সোনার গোট চেনটা দেখিয়ে বলেছিলেন, ঘড়ির গোট চেনটা তো বেশ ভালো দেখতে। শুনে জগদীশচন্দ্র হেসে বললেন, এ গোট চেনটি আমি যখন ঘড়ির সঙ্গে পরি তখন এটি He-goat আর উনি মানে লেডি অবলা বসু মহাশয়া যখন গলায় পরেন তখন এটি হল She-goat।

জগদীশচন্দ্র আর একবার কথাপ্রসঙ্গে রসিকতা করে বলেছিলেন, আমাদের দেশে পুরুষরা মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করে এটা কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত। কারণ পৃথিবী তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দিয়ে ভারী জিনিসকেই বেশী করে টানে, হাল্কা জিনিসকে নয়। মেয়েদের মন আর শরীর খুবই তো হাল্কা।

জগদীশচন্দ্র বাংলা ভাষায় যেমন বহু বৈজ্ঞানিক রচনা লিখেছেন, তেমনি লঘু বা হাস্যরসের লেখাতেও তিনি যে সিদ্ধহস্ত তাও এক কলম দেখিয়ে গেছেন। কুন্তলীন প্রতিযোগিতা পুরস্কার, পুরোন দিনে একটি নাম-করা পুরস্কার ছিল। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রও এই কুন্তলীন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারের জন্য গল্প লিখেছেন। তেমনি লিখেছিলেন জগদীশচন্দ্র একটি মজার হাসির গল্প, নাম 'পলাতক তুফান'। গল্পটি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল এবং লেখক পেয়েছিলেন পুরস্কার স্বরূপ পঞ্চাশ টাকা। তিনি টাকাটা একটা সৎকাজে দান করে দিয়েছিলেন। গল্পটা হচ্ছে, লেখক একদিন জাহাজে করে যাবার সময় ঝড়ের মধ্যে পড়েছিলেন এবং বাঁচবার কোন আশাই ছিল না। বিরাট ঢেউ এসে এসে জাহাজটাকে গ্রাস করবার চেষ্টা করছিল। এমন সময় লেখকের মনে হলো মাথায় মাখবার জন্য তাঁর তো একশিশি কুন্তলীন কেশতৈল আছে বাক্সের মধ্যে। ঐ তেল নাকি মাথা ঠাণ্ডা রাখে। কাজেই ঐ মাথা গরম পাগলা তুফানগুলির মাথায় ঐ কুন্তলীন তেল

ঢেলে দিলে কাজ হতে পারে হয়তো। এবং কাজ হলো, লেখক শিশি খুলে দু-চার ফোঁটা তেল ঐ ঢেউয়ের ওপর দিতেই দেখা গেল ঢেউগুলি তাদের উদ্যত ফণা গুটিয়ে একেবারে শান্তশিষ্ট!

অথচ ঝড়ের মধ্যে জাহাজের সেই বিপজ্জনক অবস্থা লেখক জগদীশচন্দ্রের ভাষায় যেভাবে ফুটে উঠেছে, তাতে যে পরে পাঠকের জন্যে অতি তৃপ্তিকর হাস্যরসের পানীয় গোপনে রাখা আছে মধুরেন সমাপয়েৎ করার জন্যে—তা বোঝবারই উপায় নেই—

দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। চারিদিক মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার হইল। এবং দূর হইতে এক এক ঝাপটা আসিয়া জাহাজখানাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল।...তারপর মুহূর্ত মধ্যে যাহা ঘটিল, তাহার সম্বন্ধে আমার কেবল এক অপরিষ্কার ধারণা আছে। কোথা হইতে যেন রুদ্ধ দৈত্যগণ একেবারে নির্মুক্ত হইয়া পৃথিবী সংহারে উদ্যত হইল।...বায়ুর গর্জনের সহিত সমুদ্র স্বীয় মহাগর্জনের স্বর মিলাইয়া সংহার মূর্তি ধারণ করিল।... তারপর অনন্ত ঊর্মিরাশি একের পর অন্যে আসিয়া একেবারে জাহাজ আক্রমণ করিল।... এক মহাঊর্মি জাহাজের ওপর পতিত হইল এবং মাস্তুল, লাইফ-বোট ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল।...আমাদের অন্তিম কাল উপস্থিত। মুমূর্ষু সময়ে জীবনের স্মৃতি যেরূপ জাগিয়া উঠে, সেইরূপ আমার প্রিয়জনের কথা মনে হইল।

বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক রচনাও যে কত সহজ করে লেখা যায় তা বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র সাহিত্যের কলমে অনেকদিন আগেই দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর 'গাছের কথা' প্রবন্ধের ভাষা, 'এই যে গাছগুলি কোন কথা বলে না, ইহাদের যে আবার একটা জীবন আছে, আমাদের মত আহার করে, দিন দিন বাড়ে, এসব কিছুই জানিতাম না, এখন বুঝিতে পারিতেছি। এখন ইহাদের মধ্যেও আমাদের মত অভাব দুঃখকষ্ট দেখিতে পাই। জীবনধারণ করিবার জন্য ইহাদিগকেও সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। কষ্টে পড়িয়া ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ চুরি-ডাকাতি করে। মানুষের মধ্যে যেমন সৎগুণ আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করিতে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুতা হয়, মা নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করেন, সন্তানের জন্য নিজের জীবনদানও উদ্ভিদে সচরাচর দেখা যায়, গাছের জীবন মানুষের জীবনেরই ছায়ামাত্র।'

জগদীশচন্দ্রের লেখা বিভিন্ন বিষয়ের বাংলা প্রবন্ধ সংকলনটির নাম 'অব্যক্ত'। কুড়িটি অমূল্য রচনার গুচ্ছ : যুক্তকর, আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ, অদৃশ্য আলোক, পলাতক তুফান, অগ্নিপরীক্ষা, ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে, বিজ্ঞানে সাহিত্য, নির্বাক জীবন, নবীন ও প্রধান, বোধন, মনন ও কারণ, রানী-সন্দর্শন, নিবেদন, দীক্ষা, আহত-উদ্ভিদ, স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা প্রবাহ এবং হাজির।

'অব্যক্ত' প্রকাশ করেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্নওয়ালিশ

ষ্ট্রীট কলকাতা থেকে বাংলা ১৩২৮ সনে। বইটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২৩৪, দাম আড়াই টাকা। 'কথারম্ভে' লেখক লিখেছেন, 'বন্ধুবর্গের অনুরোধে বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। চতুর্দিক ব্যাপিয়া যে অব্যক্ত জীবন প্রসারিত, তাহার দু-একটি কাহিনী বর্ণিত হইল। ইহার মধ্যে কয়েকটি লেখা মুকুল, দাসী, প্রবাসী, সাহিত্য এবং ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল।'—বসু বিজ্ঞান মন্দির। ১লা বৈশাখ, ১৩২৮।

জগদীশচন্দ্র তাঁর মাতৃভাষা বাংলায় সাহিত্য-সেবা ছাড়াও তাঁর স্বজাতির কথাও ভোলেন নি। তাই তাঁর দেশের কবি রবীন্দ্রনাথকে বিদেশে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে কবিকে বারবার অনুরোধ করেছেন তাঁর কবিতাগুলিকে ইংরাজীতে অনুবাদ করবার জন্যে। কবির 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজী অনুবাদের মূলে ছিল তাঁর বন্ধু জগদীশচন্দ্রেরই অনুপ্রেরণা এবং কবি নোবেল প্রাইজ পাবার পর তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে সদলবলে জগদীশচন্দ্র স্বয়ং শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন।

এক পত্রে জগদীশচন্দ্র নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কেও পরামর্শ দিয়েছিলেন, "আপনি রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস, প্রভৃতির অনুপম চরিতগাথা বঙ্গবাসীকে শুনাইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পত্তি বা একেবারেই আপন ঘরের জন নহেন। এখন এমন আদর্শ বাঙালীকে দেখাইতে হইবে, যাহাতে এই মুমূর্ষু জাতটা আত্মশক্তিতে আস্থাবান হইয়া আত্মোন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হয়। আমাদের এই বাঙ্গলা দেশের আবহাওয়ায় জন্মিয়া, আমাদের ভিতর দিয়াই বাড়িয়া উঠিয়া সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন, যদি সম্ভব হয়, যদি পারেন তো একবার এই আদর্শ এ বাঙ্গালী জাতিকে দেখাইয়া আবার তাহাদিগকে জীয়াইয়া মাতাইয়া তুলুন।'

এরই কিছুদিন পরে দ্বিজেন্দ্রলাল বিখ্যাত গানটি লিখলেন 'বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।'

বাঙালীকে উদ্দেশ্য করে জগদীশচন্দ্র তাঁর 'বোধন' প্রবন্ধে বলেছেন,"হে বাঙালী, বর্তমান দুর্দিনের কথা একবার ভাবিয়া দেখ।…তুমি কি তোমার ক্ষীণশক্তি ও জীবন লইয়া জাতীয় জীবন চিরজীবনের মত প্রবাহিত রাখিবে ঠিক করিয়াছ? তুমি কি জান না, ধরিত্রীমাতা যেমন পাপ বহন করিতে অসমর্থ, প্রকৃতি জননীও সেইরূপ অসমর্থ জীবের ভার বহন করিতে বিমুখ?…বিনাশেই তাহার শাস্তি, ধ্বংসই তাহার পরিণাম।…কোন আচরণে আমাদের জীবন আঁধারময় ও ব্যর্থ হইয়াছে। আলস্যে, স্বার্থপরতায় এবং পরশ্রীকাতরতায়। ভাঙ্গিয়া দাও এই সব অন্ধকারের কারণ।" ১৩৩৩ সনের শারদীয়া সংখ্যার 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় জগদীশচন্দ্র লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন, "বাল্যকালে মহাভারত পাঠ করিয়াই জীবনের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলাম।…যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফল নিরপেক্ষ হইতে পারেন।…

বারবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেই একদিন বিজয়ী হইবে।”

জগদীশচন্দ্রও সেইভাবেই বিজয়ী হয়েছিলেন।

আচারে-ব্যবহারে জগদীশচন্দ্র ছিলেন খাঁটি বাঙালী। অপুত্রক হলেও তাঁর পারিবারিক জীবন ছিল মধুময়। স্ত্রী লেডি অবলা বসু ছিলেন তাঁর প্রকৃত সহধর্মিণী, সহমর্মিণীও। শোনা যায়, লেডি অবলা বসু বাইরে বেরুবার জন্যে সাজসজ্জা পরপর কর্মব্যস্ত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্রকে দেখিয়ে আসতেন—কোন্ শাড়িটি তিনি পরেছেন এবং সেটি তাঁর পছন্দ কিনা। না হলে শাড়ি বদলে আবার পরতেন লেডি বসু।

সারা বিশ্বের বিশেষ রকম খাদ্য আস্বাদন করেও ঢাকা-বিক্রমপুরের সন্তান জগদীশচন্দ্র তাঁর স্বদেশীয় রান্নার স্বাদ ভুলতে পারেন নি আর সেদিকে লেডি বসুরও ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক চিঠিতে বন্ধুবর ইংলণ্ড প্রবাসী জগদীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন তাঁর বাড়ির সেই মাছের ঝোল-এর স্মৃতি আজও মনে জাগরূক। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর বিদেশ যাত্রার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর বিজ্ঞানী-বন্ধুবরের বাড়িতে ঝাল রান্না খেয়ে আসতেন। রান্না যত ঝাল হত, স্বামীজী ততই খুশি হতেন।

বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান নিয়েই শুধু কঠোর তপস্যা করেন নি, বাংলা সাহিত্যে এবং স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতিতে তাঁর মনপ্রাণ ছিল ভরপুর। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে তাঁর সভাপতির ভাষণ (১৯১১) কিংবা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তাঁর সভাপতির ভাষণ (১৯১৮) ইত্যাদি থেকেই জানতে পারি স্বদেশবাসীর ও মাতৃভাষার বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা।

চিন্তানায়ক জগদীশচন্দ্রের চিন্তাধারা আমাদের মঙ্গলের জন্যে। তাঁর বাণী অনুসরণ করে চলবার দিন আমাদের শেষ হয় নি। আমাদের মঙ্গলের জন্যে তিনি যেসব কথা বলেছিলেন বা লিখেছিলেন তা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে দিলেই বোঝা যাবে তিনি আমাদের জন্যে কিভাবে কতখানি ভাবতেন—‘যে মুমূর্ষু, সে-ই মৃতবস্তু লইয়া আগলাইয়া থাকে। যে জীবিত, তাহার জীবনের উচ্ছ্বাস চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়। ধরিত্রী প্রাচীনকেও চায়, নবীনকেও চায়। প্রবীণ ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনে যেন উদ্বিগ্ন না হন, আর নবীনও যেন প্রবীণের এত দিনের নিষ্ঠা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন।’

‘সমুদয় শিক্ষা-দীক্ষা কোন মনুষ্যত্ব-লাভের উদ্দেশ্য মাত্র। বিশ্বব্যাপী আহবে দুর্বল উচ্ছিন্ন হইবে এবং সবল প্রতিষ্ঠিত হইবে।’

‘স্বপ্নের দিন চলিয়া গিয়াছে। যদি বাঁচিতে চাও, তবে কশাঘাত করিয়া নিজেকে জাগ্রত রাখো।’

‘জগতে ভিক্ষুকের স্থান নাই।’

'যদি আমার জীবনে কোন সফলতা হইয়া থাকে তবে তাহা নিষ্ফলতার স্থির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।'

'অন্যের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর। ভাগ্য ও কার্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে। তাহার নিয়ম উত্থান, পতন আবার পুনরুত্থান।'

'আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, সঞ্চয় করিতে হইবে এবং বাড়িতে হইবে।'

'সামান্য ধুলিকণাও বিনষ্ট হয় না, ক্ষুদ্র শক্তিও বিনাশ পায় না। শক্তিতেই চরমোচ্ছ্বাস।'

'অদৃষ্ট দারুণ আঘাত দিয়া মানুষকে পরীক্ষা করে, সাচ্চা ও ঝুটার পরীক্ষা কেবল তখনই হয়।'

অলমিতি বিস্তরেণ।

পরাধীন দেশের বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র

প্রভাতকুমার গোস্বামী

সিপাহী বিদ্রোহের সবে অবসান ঘটেছে, অর্থাৎ অস্ত্রবলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রমাণ করেছে যে, ভারতের বুকে তারা স্থায়িভাবে বসলো। এই রকম সময়ে জগদীশচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০-এ নভেম্বর তাঁর জন্ম হয়।

জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু মনের দিক থেকে তিনি 'গোলামী' পুরোপুরি হজম করতে পারেন নি। তখনকার দিনের শিক্ষিতদের একাংশের আদর্শ অনুযায়ী তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি কৃষকদের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রচারের জন্যে ফরিদপুরে স্বদেশী মেলার পত্তন করেন। তিনি নিজ ব্যয়ে টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, কারিগরী শিক্ষা ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভবপর নয়। টেকনিক্যাল স্কুল চালাতে গিয়ে তিনি সর্বস্বান্ত হন।

শৈশব থেকেই জগদীশচন্দ্রের মধ্যে তাঁর পিতার দেশাত্মবোধের আদর্শ প্রভাব বিস্তার করে। তিনি যে বিজ্ঞান-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন তার মূলেও ছিল এই দেশাত্মবোধ। বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জগৎ অগ্রগামী এবং ভারতবর্ষের মতো দেশ বিজ্ঞান-সাধনায় সাফল্যলাভ করতে পারে না—প্রধানত এই ধরনের মনোভাব ভুল প্রতিপন্ন করার জন্যই যেন জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, বিজ্ঞান-সাধনায় ভারতবর্ষ অমনোযোগী নয় এবং চেষ্টা করলে কোন ভারতীয় বিজ্ঞান-সাধক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে পারেন। তবুও কিন্তু সরাসরি তিনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারেন নি। বি.এ. পাশ করার পর বিলাতে সিভিল সার্ভিস পড়ার ব্যবস্থা হতে থাকে। সে যুগের বাঙালীদের এটা ছিল অন্যতম উচ্চাশা। তাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভগবানচন্দ্রের পুত্রকে যে সিভিল সার্ভিস পড়াবার ব্যবস্থা হবে—এটা স্বাভাবিক।

কিন্তু জগদীশচন্দ্র পড়ার জন্য বিলাত গেলেন বটে তবে সিভিল সার্ভিস পড়তে নয়—ডাক্তারী পড়তে।

পরাধীন দেশের অধিকাংশ লোকের জীবন ইচ্ছা করলেও পরিকল্পনা মাফিক গড়ে তোলা যায় না। তাই দেখা গেল ডাক্তারী পড়া শুরু করেও তা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। তিনি শেষ পর্যন্ত নতুন করে ভর্তি হলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের পাঠক্রমে।

এইবার জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রতিভা বিকাশের প্রকৃত ক্ষেত্র খুঁজে পেলেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ট্রাইপস, অর্থাৎ পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা এই তিনটিতে অনার্স কোর্সে ভর্তি হলেন তিনি।

তদানীন্তন কালে কেম্ব্রিজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক মাইকেল ফস্টর ভাইনস, ফ্রানসিস ডারউইন এবং লর্ড র‍্যালের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন জগদীশচন্দ্র। এইসব দক্ষ অধ্যাপকদের অধ্যাপনার স্পর্শে তাঁর প্রতিভার উন্মেষ ঘটল।

কিন্তু পরাধীন দেশে প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের পথে বিস্তর বাধা, এ কথা হয়তো জগদীশচন্দ্র প্রথমে বুঝতে পারেন নি। যত দিন যেতে লাগলো তত তিনি বাধার সম্মুখীন হলেন। এই বাধা অনেক রকম।

প্রথমত, চাকুরীর ক্ষেত্রে বেতন-বৈষম্য। একই কলেজের অধ্যাপক, অথচ ইংরেজ অধ্যাপকের এক রকম বেতন, ভারতীয় অধ্যাপকদের জন্য অন্যরকম বেতন। এই বেতন-বৈষম্য ঘোচানোর জন্য তাঁকে বেতন বয়কট পর্যন্ত করতে হয়, মাসের পর মাস বিনা বেতনে কাজ করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, গবেষণার উপযোগী জিনিসপত্র এবং ল্যাবরেটরীর অভাব। নিঃসন্দেহে সেদিনও আজকের মতোই প্রেসিডেন্সী কলেজের গবেষণাগৃহ দেশের অন্য গবেষণাগৃহ থেকে উন্নত ছিল কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় সেটা কিছুই নয়। সাধারণ যন্ত্রপাতি পর্যন্ত সেখানে ছিল না।

তৃতীয়ত, গবেষণার জন্য আর্থিক সাহায্য। এই সাহায্য করতে পারতেন সরকার কিন্তু বিদেশী সরকার এ ব্যাপারে উৎসাহবোধ করেন নি। অবশ্য অনেক চেষ্টার পর সামান্য কিছু অর্থ তাঁরা গবেষণার জন্য মঞ্জুর করেন।

এই সব কারণে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা বার বার বাধার সম্মুখীন হচ্ছিল। জগদীশচন্দ্রের মতো বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী যদি স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করতেন, তবে জগৎকে তিনি যা দিয়ে গেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী দিতে পারতেন। শুধু মাত্র বেতার-বিজ্ঞানের কথাই ধরা যাক।

গণিতশাস্ত্রবিদ্ জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ছিলেন অঙ্কের লোক। বেতার-বিজ্ঞানকে গণিতের গণ্ডীর মধ্যে ফেলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সম্পর্কে তিনি শুধু ভবিষ্যদ্বাণীই করতে পেরেছিলেন। জার্মান বৈজ্ঞানিক হার্টজ যখন প্রথম যন্ত্র সহযোগে ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পরীক্ষাগারে তৈরী করলেন তখন সারা বিশ্বে সাড়া পড়ে যায়। এরপর হার্টজের গবেষণাকে ভিত্তি করে বেতার-বিজ্ঞানের সৌধ গড়ে তুলবার চেষ্টা করলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকেরা। এঁদেরই একজন জগদীশচন্দ্র বসু। অথচ শেষ পর্যন্ত তরুণ বৈজ্ঞানিক মার্কনি জয়মাল্য লাভ করলেন। কারণ স্বাধীন দেশের বৈজ্ঞানিক মার্কনির সামনে যে-সুযোগ-সুবিধা ছিল জগদীশচন্দ্রের তা ছিল না। নতুবা তিনিই প্রথম অনেক দূর এগিয়ে যান।

জগদীশচন্দ্রই প্রথমে হার্টজের গবেষণার শেষ অধ্যায়ের পরিপূর্ণতা আনেন। বৈদ্যুতিক ঢেউ বিনাতারে কিভাবে কানে লাগানো যায় এ নিয়ে পরীক্ষা চালাতে থাকেন। বিনাতারে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠিয়ে দূরের কোন যন্ত্রকে যে নাড়া দেওয়ান যায় সে পরীক্ষাও জগদীশচন্দ্র করে দেখান।

১৮৯৪-এর নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজে এক পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঘরে জগদীশচন্দ্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি করলেন। সেই ঢেউ দেওয়াল ভেদ করে পাশেই অধ্যাপক পেডলারের ঘরে একটা পিস্তল ছুঁড়লো।

পৃথিবীতে বিনাতারে বার্তা প্রেরণের এই হলো সূচনা। অথচ এ নিয়ে বিশ্বে কোন আলোড়নও হলো না। কারণ এই পরীক্ষা তিনি সুযোগ ও অর্থাভাবে বহির্বিশ্বকে মার্কনির আগে প্রদর্শন করাতে পারলেন না।

বর্তমানে বেতার-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আচার্য জগদীশচন্দ্রের নাম বড় একটা শোনা যায় না। তাঁর আর একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার বৃক্ষেরও প্রাণস্পন্দন আবিষ্কার। সাধারণ ভাবে সকলে বলে থাকেন যে, জগদীশচন্দ্র গাছেরও প্রাণ আছে তা আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারও কম বিস্ময়কর নয়। কারণ যাঁরা উদ্ভিদকে প্রাণহীন ঘোষণা করে নিশ্চিন্ত ছিলেন তাঁদের সম্মুখে জগদীশচন্দ্র দেখিয়ে দিলেন চেতন ও অচেতনের মধ্যে অভিন্ন জীবনপ্রবাহ।

কিন্তু জগদীশচন্দ্রের জীবনে বিদেশী সরকারের বাধা যেমন দূর হয় নি তেমনি তিনি উপযুক্ত সাহায্য থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন।

এত বড় একজন বৈজ্ঞানিক কিন্তু রীতিমত সাহিত্যরসিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের চেয়ে বছর তিনেকের ছোট ছিলেন। কিন্তু দুজনের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। জগদীশচন্দ্র নিজে বাংলা ভাষায় তাঁর আবিষ্কার ও চিন্তা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প (ছুটি) ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'খেয়া' ও 'কথা' কাব্য জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন—

বিজ্ঞান লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধু তীরে
হে বন্ধু দিয়েছ তুমি, জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনা হীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।

জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—

তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক
জড়ের পেয়েছে সাড়া
আমাদের এই নবীন সাধনা
সব সাধনার বাড়া

জগদীশচন্দ্রকে এক-একজন মনীষী এক-এক দিক দিয়ে দেখেছেন এবং তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার তারিফ করেছেন। তবে আমার মনে হয়, তাঁর সঠিক মূল্য নির্ণয় করেছেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন—

'ডঃ বসু পৃথিবীকে কয়েকটা অমূল্য সম্পদ উপহার দিয়েছেন। তার যে-কোনও একটির জন্য বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা যেতে পারে।'

জগদীশচন্দ্রের জীবন-দর্শন

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

ভারতের বিজ্ঞান জগতে যাঁরা পথিকৃৎ, তাঁদের মধ্যে অন্যতম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। সারাজীবন বিজ্ঞান সেবা করে যিনি বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারাকে প্রকাশ করাই বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌহৃদ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। জগদীশচন্দ্র যে প্রগতিপন্থী ছিলেন, তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথকে লিখিত এক চিঠি থেকে জানা যায়। তিনি লিখছেন—'আমাদের দেশবাসীরা কেবল অতীতের গৌরবে অন্ধ। বর্তমান কালে আমাদের যত অধোগমন হোক না কেন, আমরা অতীতকালের কথা স্মরণ করে উৎফুল্ল থাকবো।' অন্যত্র তিনি লিখেছেন—'জাপানীরা পুরানো কথা বলে সময় নষ্ট করে না, তারা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত।' বসু বিজ্ঞান মন্দিরে বহুমুখী জ্ঞানের অনুশীলন সম্বন্ধে তাঁর মত ছিল, এখানে কোন বহুচর্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হবে না। পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের যা-কিছু নতুন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হবে, তা এখান থেকে জগতে প্রচারিত হবে। এইসব চিন্তাধারা থেকে বুঝা যায় যে, জগদীশচন্দ্র পেছনের দিকে তাকানোর চেয়ে সামনের দিকে তাকাতে বেশী ভালবাসতেন।

জগদীশচন্দ্রের জীবনে দেশপ্রেম ছিল মস্ত বড় একটা অনুপ্রেরণা। নিজেকে উদ্ভিদের সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথকে তিনি লিখেছেন—'আমার মাতৃভূমির রসে আমি প্রস্ফুটিত।' অপর এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন—'আমাকে যদি শতবার জন্মগ্রহণ করতে হয়, তাহলে প্রত্যেকবার হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করবো।' বিদেশে বসে বিজ্ঞান গবেষণা করার তীব্র বাসনা তাঁর তেমন ছিল না। লণ্ডন থেকে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন—'আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থেকে কিছু করতে পারি, তাহলে আমার জীবন ধন্য হবে। যদি সকলেই আমরা বোঝা ফেলে বিদেশে চলে আসি, তবে দেশের ভার কে বইবে।' ইংল্যাণ্ডে থাকা কালীন তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ দেওয়ার কথা যখন হয়েছিল, তখন দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ও স্বদেশবাসীর স্নেহবন্ধন ভুলতে না পেরে সে পদ তিনি গ্রহণ করেন নি।

দেশপ্রেমের ন্যায় মাতৃভাষার প্রতি ছিল জগদীশচন্দ্রের অকৃত্রিম অনুরাগ। রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনতে পাই, সেই মাতৃদেবী ব্যতীত আমার আর কি উপাস্য আছে?' জগদীশচন্দ্রের যা-কিছু আবিষ্কার বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা প্রথমে মাতৃভাষায়

প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার পরীক্ষা সাধারণ সমক্ষে প্রদর্শিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত তিনি তাঁর আবিষ্কারের মূল্য ও মর্যাদা দেশবাসীর কাছ থেকে প্রথম পান নি। বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর আবিষ্কার স্বদেশে প্রশংসিত হয় নি।

বিজ্ঞান গবেষণায় জগদীশচন্দ্রের প্রধান হাতিয়ার ছিল স্বনির্ভরতা। পরীক্ষাগারে উপকরণের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব—এ তত্ত্বকথাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতেন না। যদি তা সত্য হোত, তাহলে অন্যদেশে যেখানে পরীক্ষাগার নির্মাণে কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে, সেখান থেকে প্রতিদিন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হোত। তিনি বলতেন, প্রকৃত পরীক্ষাগার বিজ্ঞানীদের অন্তরে। সেই অন্তর যদি উজ্জ্বল থাকে, তাহলে বাইরের কোন আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। নিজের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তিনি নিজেই যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতেন। বিদেশী যন্ত্রের উপর নির্ভর করতেন না। দুঃখ করে তিনি বলতেন, পরের অনুকরণ না করে আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকেরা নিজের চিন্তাবলে নতুন কিছু উদ্ভাবন এবং আবিষ্কার করার কথা কি ভাবতে পারেন না?

সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই বিজ্ঞানীর আদর্শ। জগদীশচন্দ্রের জীবনে এই আদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি বলতেন, 'সত্যের সম্যক প্রতিষ্ঠা প্রতিকূলতার সাহায্যেই হয়, আর আনুকূল্যের প্রশ্রয়ে সত্যের দুর্বলতা ঘটে। নতুন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত জীবন পণ ও সাধনার আবশ্যক লাভ করিবার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না, দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা সত্যের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ, তাহাদের জন্য নহে কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়পদ্ম।'

জগদীশচন্দ্রের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল—'আমাদের বাঁচতে হবে, সঞ্চয় করতে হবে এবং বাড়তে হবে। যে কোন সঞ্চয় করে না, পরমুখাপেক্ষী, যে ভিক্ষুক, সে জীবিত হইয়াও মরিয়া আছে। যার কিছু নেই, সে জগতকে কি দেবে! জগতে ভিক্ষুকের স্থান নেই। যে সঞ্চয় করেছে, সেই শক্তিমান, সেই তার সঞ্চিত ধন বিতরণ করে পৃথিবীকে সমৃদ্ধিশালী করবে।'

জগদীশচন্দ্রের কার্যে ও চিন্তায় সাহসী মনোভাবের পরিচয় যা দেখা যায় তা তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। পিতার ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষকতা করতেন, তখন তিনি দেখেছিলেন, সমান কাজে ভারতীয় ও ইউরোপীয় শিক্ষকদের বেতনে বৈষম্য। তিন বছর ধরে বেতন গ্রহণ না

করে তিনি কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে নীরব ও অহিংস প্রতিবাদ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একসময়ে জগদীশচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সরকার-মনোনীত সদস্য ছিলেন। তাঁর একটি কার্য সরকারী স্বার্থের অনুকূলে হয় নি। তার কৈফিয়ৎ তলব করা হলে, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, সরকারের অন্ধ স্তাবকতা করবো, এই যদি আমার কাছে আশা করা হয়ে থাকে, তবে যেন যথাসত্বর আমাকে সরকারী মনোনয়ন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ব্রিটিশ রাজত্বকালে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস খুব কম ব্যক্তিরই ছিল। জগদীশচন্দ্র কখনও 'হতে পারে না' বা 'হবে না' বলে কোন বৈজ্ঞানিক কার্যে পশ্চাৎপদ হন নি। তিনি বলতেন, যদি কেউ ফলাফলে নিরপেক্ষ থেকে বড় কাজে জীবন উৎসর্গ করতে এগিয়ে আসেন এবং তাঁর যদি অসীম ধৈর্য থাকে, তবে বারংবার পরাজিত হলেও তিনি একদিন বিজয়ী হবেন।

জীবনটাকে জগদীশচন্দ্র পাশা খেলার সঙ্গে তুলনা করতেন। দার্শনিকতার মনোভাব নিয়ে তিনি বলতেন, —'এ জীবন একটা মহাক্রীড়াস্বরূপ। আমরা কি একটা উপলক্ষ করে এ জীবনকে পাশার ন্যায় নিক্ষেপ করতে পারি না। হয় জয় কিম্বা পরাজয়।···আনন্দ কিম্বা নিরানন্দ, সুখ কিম্বা দুঃখ—ইহাতে কি আসে যায়।....আলস্যে, স্বার্থপরতায় ও পরশ্রীকাতরতায় আমাদের জীবন অন্ধকারময়। এই অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে আমাদের অন্তর্নিহিত আলোক-রাশি উদ্ভাসিত করুক দিগদিগন্তে'—এই ছিল জগদীশচন্দ্রের জীবনের একান্ত কামনা।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের স্বদেশচিন্তা

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণের ধারণা, বিজ্ঞান-সাধকরা দেশ, সমাজ ও জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের সাধনার গণ্ডীর মধ্যেই বিচরণ করেন। দেশের বিষয়, সমাজের বিষয় বা জাতির বিষয় তাঁরা ভাবেন না বা ভাববার অবকাশ পান না। বিজ্ঞানীরা লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃতে তাঁদের গবেষণা ও আবিষ্কারে নিমগ্ন থাকেন বটে, কিন্তু তাঁরা যে দেশ, সমাজ ও জাতির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন এমন কথা বলা যায় না। আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবন-সাধনা অনুধাবন করলে এ কথার সত্যতা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্রে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন, 'গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া বাড়িতে থাকে, উত্তাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। কাহার গুণে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল? কেবল গাছের গুণে নয়! আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত।'

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে আর একটি পত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'তোমাদের পিছনে আমি এক দীনা চীরবসন পরিহিতা মূর্তি সর্বদা দেখিতে পাই। তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় লই। আমি ভাষায় সে কথা কি করিয়া প্রকাশ করিব? তুমি বুঝিবে। সাধারণত লোকের যেসব বন্ধন থাকে, তাহা হইতে আমি মুক্ত। কিন্তু আমি সেই অঞ্চল ছেদন করিতে পারি না।...আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা হইলে জীবন ধন্য হইবে।'

এই সামান্য কয়টি কথার মধ্যে জগদীশচন্দ্রের প্রগাঢ় দেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রীতি সুপরিস্ফুট। বস্তুত জগদীশচন্দ্রের সকল সাধনার মূলে এই প্রবল দেশ-প্রেমই তাঁকে প্রেরণা দান করেছিল, সকল বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে তাঁকে স্থির সংকল্পে অবিচলিত রেখেছিল।

বিজ্ঞানচর্চায় অনুপ্রাণিত করে দেশকে বড় করবেন এই ছিল তাঁর অন্তরের সংকল্প। তাই দেখা যায়, বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্রের অন্তরের অন্তস্তলে স্বদেশপ্রেমের অনাবিল ফল্গুধারা নিরন্তর বয়ে চলেছিল। তাঁর মত ক'জন এমন আত্মহারা হয়ে দেশমাতৃকাকে ভালোবাসতে পেরেছেন? তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন—'আমাকে যদি শতবার জন্মগ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে, প্রত্যেকবার হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিতাম।'

ইউরোপ থেকে তিনি একবার লিখেছেন—'আমি এতো দিনে আমাদের জাতীয় মহত্ব বুঝিতে পারিতেছি, স্বদেশীয় আত্মম্ভরি ও বিদেশীয় নিন্দুকের

কথায় চক্ষে আবরণ পড়িয়াছিল—এখন উন্মুক্ত চক্ষে যাহা প্রকৃত তাহাই দেখিতেছি। ছেলেবেলায় ইংরাজী শিক্ষার সহিত যে পাক পড়িয়াছিল, এতো দিনে তাহা আস্তে আস্তে খুলিয়াছে। এখন স্বপ্রকৃতিস্থ হইয়া সব দেখিতে পাইয়া অনেক মোহ দূর হইয়াছে।'

জগদীশচন্দ্র যখন অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন তখন তিনি দেখেন বিজ্ঞানের বিষয় শিক্ষাদান কালে কেবল বিদেশী মনিষীদের নামই স্মরণ করতে হয় এবং তাঁদের কথিত ব্যাখ্যারই পুনরুক্তি করতে হয়। যে ভারতের নালন্দা, তক্ষশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিন দূর-দূরান্তর থেকে বিদেশী শিক্ষার্থীরা জ্ঞান সঞ্চয়ের মানসে উপস্থিত হতেন, সেই ভারতের এই পরমুখাপেক্ষীতায় জগদীশচন্দ্রের জাতীয় পৌরুষ গভীর ভাবে আহত হয়। মাতৃভূমির এই অপযশ অপনোদনের জন্য তিনি সমগ্র মনপ্রাণ বিজ্ঞানের সাধনায় নিয়োগ করেন। এই সাধনায় দীর্ঘকাল তাঁকে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে বারংবার আঘাত করেছে, এমন কি, একজন বিরুদ্ধপক্ষীয় জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার নিজের বলে প্রচারও করেন। কিন্তু ঘোরতর নিরাশার মধ্যেও তিনি পরাভব স্বীকার করেন নি। নিজের সত্য-সাধনার প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং দেশমাতৃকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প শত নৈরাশ্যের মধ্যে তাঁকে অটল ও অবিচল রেখেছিল। এবং শেষকালে যখন তাঁর আবিষ্কৃত সত্য বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে স্বীকৃত হল, তখনও এই অসামান্য সাফল্যকে তিনি ব্যক্তিগত কৃতিত্বরূপে গ্রহণ করেন নি। দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ ভক্তের ন্যায় তিনি বলেন—'সুদীর্ঘ পরিণামে যদি জয়মাল্য আহরণ করে থাকি, তবে তাহা দেশলক্ষ্মীর চরণে নিবেদন করিতেছি।'

জগদীশচন্দ্রের এই ভক্তির মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর প্রগাঢ় দেশপ্রেমের মহান পরিচয় পাই।

মাতৃভূমির মত মাতৃভাষার প্রতিও জগদীশচন্দ্রের অনুরাগ ছিল সুগভীর। তাঁর যা কিছু আবিষ্কার বিদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করে তা সর্বাগ্রে মাতৃভাষায় এদেশে প্রকাশিত হয়েছিল। এবং তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলির নামকরণ তিনি মাতৃভাষায় করেছিলেন।

আমাদের জাতীয় জীবনের তখনকার দিনের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র যথেষ্ট চিন্তা করেছিলেন এবং সে বিষয়ে কর্মপন্থার নির্দেশও দিয়েছিলেন। তখনকার দিনের অতিপ্রয়োজনীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি গঠনমূলক বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা তিনি দেশের লোকের কাছে পরিষ্কার ভাবে বলেছিলেন। দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—'প্রথম পরিচয়ের স্বাদ বিস্তার করিবার জন্য শিক্ষার প্রণালীকে সরল করা চাই। যখন অনেক লোকের মধ্যে শিক্ষার গোড়াপত্তন হইয়া যাইবে, দেশের লোক যখন এই বিদ্যার রস পাইতে থাকিবে,

তখন যোগ্যতার বাছাই করিবার জন্য এখনকার চেয়ে কড়াকড়ি চলিতে পারিবে। বিদেশী ইউনিভারসিটির চেয়ে আমাদের আদর্শ খাটো হইয়া পড়িবে, এই মিথ্যা লজ্জার কোন মূল্য নাই। সেখানকার আদর্শ চিরদিনই একভাবে ছিল না, জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।'

'তা ছাড়া, আর একটি কথা বলিবার আছে, বিজ্ঞানের কূটতত্ত্ব ও কঠিন সমস্যা লইয়া নাড়াচাড়া করিলেই যে উদ্ভাবনী-শক্তি বাড়ে তাহা নয়। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়, ভালো করিয়া দেখিতে শেখাই বিজ্ঞান-সাধকের মূল সম্বল। বিজ্ঞান পাণ্ডিত্যে যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা যে বিদ্যালয়ে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা দিয়া বড় হইয়াছেন তাহা নহে। আমাদের দেশে আমরা যদি যথার্থ বিজ্ঞানবীরদের অভ্যুদয় দেখিতে চাই, তবে শিক্ষার আদর্শ দুরূহ ও পরীক্ষা কঠিন করিলেই সে ফল পাইব না। তাহার জন্য দেশে বিজ্ঞানে সাধারণ ধারণা ব্যাপ্ত হওয়া চাই এবং ছাত্ররা যাহাতে পুঁথিগত বিদ্যার শুষ্ক কাঠিন্যে বদ্ধ না থাকিয়া প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিজ্ঞানদৃষ্টি চালনার চর্চা করিতে পারে তাহার উপায় করিতে হইবে।'

আমাদের দেশের তৎকালীন স্বাস্থ্যসমস্যা সম্বন্ধেও জগদীশচন্দ্র বিশেষ ভাবে চিন্তা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্য দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন—'ম্যালেরিয়াতে নির্মূল হইতেছে। বিবিধ সংক্রামক রোগ যেন দেশকে একেবারে বিধ্বস্ত করিতে চলিল। স্কুল-বৃদ্ধি অতি মন্থর গতিতে হইতেছে। এই সকল একেবারে অনিবার্য্য নয়, আমাদের অজ্ঞতা ও চেষ্টাহীনতার বিষময় ফল। আমাদের সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চিরন্তন ব্যবস্থা কথকতা। পর্যটনশীল মেলা দেশের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পদিনেই অন্য প্রান্তে পৌছিতে পারে। এই মেলায় স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ছায়াচিত্র যোগে উপদেশ, স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া-কৌতুক, ব্যায়াম, যাত্রা, কথকতা, গ্রামের শিল্পবস্তু সংগ্রহ, কৃষিপ্রদর্শনী ইত্যাদি বহুবিধ গ্রামহিতকর কাজ সহজেই সাধিত হতে পারে। আমাদের কলেজের ছাত্র গঠন ও এই উপলক্ষে তাহাদের দেশপরিচর্যা বৃত্তি কার্যে পরিণত করিতে পারেন।'

আমাদের জাতীয় চরিত্রে শ্রমবিমুখতা জাতির অগ্রগতি নানা ভাবে ব্যাহত করে। এই প্রসঙ্গে আচার্য জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, 'আমরা শ্রমের মর্যাদা শিখি নাই, তাই কর্মক্ষেত্রে আমাদের লাঞ্ছনা ও দুর্গতি পদে পদে। স্বপ্নের দিন চলিয়া গিয়াছে। যদি বাঁচিতে চাও তবে কশাঘাত করিয়া নিজেকে জাগ্রত রাখ। যদি ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিতে চাও তবে তার মানসিক ক্ষমতাকে অপ্রতিহত রাখিতে হইবে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া যাইলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা বিনষ্ট হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু।'

দেশের চাষী-মজুর প্রভৃতি নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি সমাজের

অবিচার এবং অবজ্ঞা জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায় নি। এই অবিচার-অবজ্ঞায় ব্যথিত হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি ও আমি যে শিক্ষা লাভ করিয়া নিজেকে উন্নত করিতে পারিয়াছি এবং দেশের জন্য ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছি ইহা কাহার অনুগ্রহে? তাহা জানিতে হইলে সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন কর। সেখানে দেখিতে পাইবে পঙ্কে অর্ধনিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ট, রোগশীর্ণ, অস্থিচর্মসার এই পতিত শ্রেণীরাই ধন-ধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই। কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চিরবেদনা নিহিত আছে।'

জগদীশচন্দ্রের এই স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ কিন্তু সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে সীমিত ছিল না। বিজ্ঞানের পবিত্র অঙ্গনে জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ের কোন ভেদাভেদ নেই। বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান মন্দিরে স্বদেশ ও বিদেশের সকল বিজ্ঞানীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকালে তাঁর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে তিনি নিবেদন করেন, 'এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীরা বঞ্চিত হইবে না। বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতে জ্ঞান সার্বভৌমিক রূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশের নালন্দা ও তক্ষশীলায় দেশ-দেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে তখনই আমরা মহৎ রূপে দান করিয়াছি, ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্বজীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়।'

জগদীশচন্দ্রের এই মহৎ দেশপ্রীতি ও বিশ্বজনীন উদারতা তাঁর চরিত্রকে সার্থক, সুন্দর ও মহিমান্বিত করেছে এবং তাঁর স্মৃতিকে বিশ্ববাসীর অন্তরে চির জাগরিত রেখেছে।

জগদীশচন্দ্র এবং আমাদের বিজ্ঞান-চেতনা

মণীন্দ্র ঘটক

ধর্ম-চিন্তা দীর্ঘকাল মানবসভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে। তার পাশাপাশি দর্শন নানা দিক্‌-নির্দেশনায় ব্যক্তি-মানুষকে প্রেরণা দিয়েছে। বিজ্ঞান তখন ঠারেঠোরে হাতছানি দিচ্ছে মাত্র। বিজ্ঞান-সম্পর্কে স্বচ্ছ-স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছে। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রচলনের একটা বিরোধও মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে।

বোধ হয়, বিজ্ঞান যখন প্রযুক্তিবিদ্যায় প্রবলভাবে যুক্ত হতে লাগল, তখনই পৃথিবীতে সাড়া উঠল, বিজ্ঞান বিজ্ঞান। য়ুরোপের শিল্প-বিপ্লব প্রযুক্তিবিদ্যায় বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগের ফল। তার আগে বিজ্ঞান-সম্পর্কে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা মানবসভ্যতার সর্বস্তরে তেমন দানা বাঁধতে দেখা যায় নি। যদিও বিজ্ঞান-চর্চা তথা গবেষণা কিছু নতুন ব্যাপার নয়। দেখা যায়, সভ্যতার গোড়াপত্তনের সময় থেকেই বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছে মানুষ। উপায় নেই, বিজ্ঞান ছাড়া গতি নেই—এ কথা হয়তো বুঝতে সময় লেগেছে, হয়তো না-বুঝেও বিজ্ঞানের প্রসাদ গ্রহণ করেছে মানুষ।

আমাদের দেশে সাধারণ ভাবে বিজ্ঞান-সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণা ছিল, বিরোধও ছিল। তার মূল কারণ হয়তো ধর্মভাবাপন্ন সংস্কার। অথচ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ধর্মবোধের সঙ্গে বিজ্ঞানের সত্যি কোন বিরোধ নেই। তার বিরোধ সত্য এবং অসত্যের। বিজ্ঞান সত্যের উদ্ঘাটক। সেই উদ্ঘাটনে সাময়িক বহু ধ্যান-ধারণা, বহু বিশ্বাস, বহু সংস্কার ওলট-পালট হয়ে যায় বলেই হয়তো বা ধাক্কা সামলাতে মানুষ বিরূপ হয়ে ওঠে, বিরোধিতা করে। কিন্তু সময় ক্ষেপণের সঙ্গে দিনযাপনের বাস্তব প্রয়োজনে এক সময় বিজ্ঞানের সঙ্গে সাযুজ্যে আসতে হচ্ছেই মানুষকে। এবং তার অনুভবে এটাই স্থির আর স্পষ্ট যে, বিজ্ঞান জীবন-বিমুখ, দৈনন্দিন-বিচ্ছিন্ন, স্বভাব-বিরূপ কোনও প্রথা বা প্রয়োগের ব্যাপার নয়। জীবনের আষ্টে-পৃষ্ঠে-ললাটে বিজ্ঞানের প্রাপনা। জীবনমুখী যাবতীয় কর্মকাণ্ডে, জীবন থেকে উৎসারিত যাবতীয় ভাবে, জীবনের যাবতীয় উন্মেষ-চেতনায় বিজ্ঞান দেয় বৈচিত্র্য, আনে বিশিষ্টতা এবং অনুসন্ধানের প্রেরণায় মানুষকে করে উদ্বেল।

বিজ্ঞান-গবেষণা এবং আবিষ্কারের ধারায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত একটা বড় পার্থক্য ছিল। এদেশে বিজ্ঞান-সাধনা, ওদেশে বিজ্ঞান-প্রয়োগ। বিজ্ঞান-প্রয়োগের ফল হাতেনাতে ধরা যায়, পাতে পাতে পরিবেশনে কোনও অসুবিধে নেই, বরঞ্চ তাতেই তার প্রতি আকর্ষণ-আগ্রহ ব্যাপক। কিন্তু বিজ্ঞান-সাধনার ব্যাপারটা বড়ো বেশি মৌলিক,

সহজে কাছে ঘেঁষা যায় না, কাজের বলে মনে হয় না। তাই, এ যুগে সাধনার দিকটা অন্ধকারে চোখের আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। ব্যাপকভাবে কেবল প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি। অথচ এর পশ্চাতে যে নীরব, নিবিড় সাধনা অবিরত কাজ করে যাচ্ছে সে কথাটা আমাদের মনেই আসে না।

আচার্য জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে ভাবনায় এসব কথা মনে আসছে নানা কারণে। তাঁর জীবন তাঁর সাধনা সম্পর্কে এদেশের মানুষ কম জানবে তা বলা যায় না। কিন্তু সে জানা অনেকটা অব্যবহারের অলৌকিক কিংবদন্তীর মতো এবং তারও কারণ বোধ হয় আমাদের বিজ্ঞান-বিরূপ মানসিকতা। সহজ সত্যকে কিছুতেই আমাদের মনে ধরে না। কি কারণে সত্যের গায়েও কিছুটা মিথ্যে রঙ না চড়ালে যেন স্বস্তি নেই, তৃপ্তি নেই। সে বোধ করি আমাদের এক-ধরনের অবৈজ্ঞানিক মানস-ধারারই স্বভাব।

এযুগে বিজ্ঞানকে দেখা হচ্ছে বীরের ভূমিকায়, বিজয়ীর রথে চড়া এক অপ্রতিরোধ্য বেগ রূপে। বিজ্ঞান চন্দ্র বিজয় করে, প্রকৃতিকে দাস বানায়, মহাকাশে অভিযান চালায়। শুনতে বেশ, কিন্তু কিছুটা অভিনিবেশে এসে ভাবতে বসলে বিজ্ঞানের এ চরিত্র কি মেনে নেওয়া যায়, না বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়!

বিজ্ঞানের এ অভিধায় জগদীশচন্দ্রকে আমরা কি বলবো? তাঁকে আমরা আচার্য-রূপে বরণ করেছি, ঋষি-রূপে অর্ঘ্য দিয়েছি। কিন্তু বিজ্ঞানী-রূপে তাঁর সম্পর্কে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট। পরাধীন দেশের চরম প্রতিকূলতার মধ্যে, বিনা আয়োজনে, নিজের উদ্ভাবনী শক্তির বলে তিনি বিজ্ঞান-জগতে যে সাড়া তুলেছিলেন তা কেবলমাত্র বিস্ময়ের বস্তু নয়, বোধ হয় আজও তা অনুধাবনের অপেক্ষায়। 'অব্যক্ত'-গ্রন্থের বিভিন্ন নিবন্ধে তাঁর বিজ্ঞান-চেতনার যে গভীর ও রস-স্নিগ্ধ পরিচয় পাওয়া যায় তা কোনও তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটাবার তাগিদে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের নিছক কারিগরি ব্যাপার নয়। জগৎ ও জীবন, জড় ও জীবন, বস্তু ও জীবনের মধ্যে ওতপ্রোত যে সম্বন্ধ এবং তারই স্পন্দনে যে মহা বিস্ময়ের আলো মানুষকে এক বিমুগ্ধ সত্যের সন্ধান দেয় আচার্য জগদীশচন্দ্র যেন সারা জীবন তাকেই অণু অণু করে সংগ্রহ করে রেণু রেণু করে তার রূপ ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন মানুষের অনুভূতিতে।

সবিনয়ে, অত্যন্ত স্থিতধী হয়ে, প্রায় নীরবে জগদীশচন্দ্র একের পর এক বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ করেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। যে-সত্য যখন তাঁর গবেষণায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, বিশ্বের মানুষকে বিনা দ্বিধায় জানিয়ে দিয়েছেন, গ্যাখো, গ্যাখো! এ সত্যের সন্ধান আমি পেয়েছি। তোমরা অবলোকন কর।

কোন লোভ, কোনও স্বার্থবোধ তাঁকে কোনও গণ্ডীতে আবদ্ধ করতে পারেনি। তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একের পর এক প্রাকৃতিক রহস্য উন্মোচন করে একটি বিশেষ সত্যের সন্ধান পেতে চাইছেন তিনি। আর সেই

সত্যে উপনীত হতে বিজ্ঞানের সব শাখাতেই তাঁর বিচরণ। তাই তিনি শুধুই গবেষক, শুধুই বিজ্ঞানী নন। তিনি আচার্য, তিনি ঋষি।

বৈজ্ঞানিক চিন্তা, বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তি ইত্যাদি কতগুলো কথা ইদানীং খুবই প্রচলিত। কিন্তু এ প্রচলনের খুব একটা যুক্তিযুক্ত স্পষ্ট রূপ কিন্তু খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। একটি কবিতা কি খুব অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার? একটি বিশেষ কল্পনা কি খুবই অবিজ্ঞান-সম্মত যুক্তির? আসল গোলমাল বোধ হয় বিজ্ঞান শব্দ নিয়ে। বিজ্ঞান নেহাৎ একটা বাইরের বিষয় নয়। মানুষের বস্তু-জগৎ এবং ভাব-জগতের সঙ্গে তার যে অচ্ছেদ্য সেতুবন্ধ সে কথাটা সহজে বোঝা যায় না বলেই যত ভুল।

এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্য-অদৃশ্য যাবতীয় বস্তু-সম্ভারের, নিহিত শক্তির এবং প্রাণসত্তার রূপ-রস-রহস্য, তার উৎস, তার চাঞ্চল্য, তার রূপান্তর—তা থেকে নব নব নির্মাণের শিল্পকলার উদ্ভাবনই তো বিজ্ঞান। চাঁদে যাওয়ার শক্তি তো মানুষ তৈরি করে নি, প্রকৃতিতে তা নিহিত ছিল, মানুষ তা আবিষ্কার করে শিল্পায়িত করে কাজে লাগিয়েছে। উদ্ভিদের প্রাণ-সত্তার রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র। আণবিক মহাশক্তির উন্মোচনও আজকের বিজ্ঞানীরই হাতে। বিজ্ঞানের বলে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অজ্ঞাত রহস্যের সামান্য কণামাত্র হাতে পেয়েই আজকের মানুষ বড়ো বেশি দাপাদাপি করছে। কিন্তু বিজ্ঞান-তপস্বীরা রহস্য যত উন্মোচন করছেন ততই গভীরে মগ্ন হচ্ছেন। বলছেন, আরো আরো, তারপরে আরো কি? আমরা সাধারণ মানুষেরা সে সব নিয়ে তেমন মাথা ঘামাই না। জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদের প্রাণ-স্পন্দন চাক্ষুষ দেখালেন। আমরা চেঁচাতে থাকলাম। ইথারে শব্দ পরিবহণের রহস্য উন্মোচন করলেন। আমরা হায় হায় করে উঠলাম। কি দুর্ভাগ্য আমাদের। মার্কনি সাহেব জগৎ জুড়ে হাঁক পেড়ে বুঝি জগদীশচন্দ্রকে হার মানালেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের মুখে কি সেদিন কোনও ক্ষোভের চিহ্ন দেখেছে কেউ? শোনা যায় নি। বরঞ্চ এটাই স্বাভাবিক যে, যে-সত্যের তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন তাকে আর কেউ আরো সত্য বলে প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছেন তাতে তাঁর আনন্দ, আর সে আনন্দ মানুষেরই বড়ো মর্যাদার।

একটা ধারণা আছে যে, জগদীশচন্দ্র যদি বিজ্ঞান-সাধনায় মন না দিতেন তা হলে তাঁকে সাহিত্যিক হতে হতো। কেননা, 'অব্যক্ত' গ্রন্থের বিচিত্র সব নিবন্ধে ছত্রে ছত্রে পাকা সাহিত্যিকের ছাপ। কথাটা তলিয়ে দেখার মতো। 'অব্যক্ত'-এর রচনাগুলো তাঁর বিভিন্ন সময়ের জ্ঞান ও ভাবের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু সাহিত্যিকের সচেষ্ট অভিনিবেশের ফল নয়। বলা যায়, প্রায় আকস্মিক। তাঁর কথাতে "কোনদিন লিখিতে শিখি নাই, কিন্তু ভিতর হইতে কে আমাকে লিখাইতে আরম্ভ করিল।" জগদীশচন্দ্রের মতো বিজ্ঞান-সাধক এমন কথা বলেছেন যা আমাদের বিজ্ঞান-ধারণার সঙ্গে অমিল মনে হয়। মনে হয়, এ

যেন অদৃষ্টবাদী কোনও মিষ্টিক সাহিত্যিকের কথা। এখানে আর একবার স্মরণ করছি, বিজ্ঞানের নামে অনেক অবৈজ্ঞানিক ভাবনা আমাদের বড়ো বেশি জটিল মানসিকতা এনে দিয়েছে। তাই স্বাভাবিক ভাবগুলো আর সহজে আমাদের মনে লাগে না। ভেতর থেকে কেউ লেখানো বা বলানোর ব্যাপারটা জগদীশচন্দ্রের আগে এবং পরে আমাদের দেশের বহু সাধক-শিল্পী-সাহিত্যিক বলেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তো বার বার একথা আমাদের শুনিয়েছেন। কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-ধর্মসাধকদের কথা না হয় আমরা অবাস্তব ব্যঞ্জনা বলে মেনে নিলাম। কিন্তু তদ্‌গত বিজ্ঞানী, তিনিও যদি এমন কথা বলেন, তা হলে বুঝে দেখার বড়ো দরকার। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র কিছু লিখবেন কোনদিন ভাবেন নি। কিন্তু এমন একটা সময় এল যখন তাঁকে লিখতেই হল। ভেতরের কেউ তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিল। অর্থাৎ বিজ্ঞান-সাধনায় লব্ধ জ্ঞান, বোধ এবং দর্শন তাঁকে উদ্বেল করেছিল বলেই তার প্রকাশের জন্যে তাঁকে লিখতে হয়েছিল। আর এটা কারও অবিদিত নয় যে, ভেতরে গভীর বোধ ও ভাবের সঞ্চার হলে তা অনায়াসে ভাষায় প্রকাশিত হতে পারে। সেই প্রকাশের জন্যে ভাষা খুঁজতে হয় না, ভাষা-চর্চা করতে হয় না। সাহিত্যিকদের বেলায় তো তার নজির বহু। এবং ব্যাপারটা যথেষ্ট বিজ্ঞান-সম্মত নয়, বলা যায় না। বরঞ্চ, তিনি বিজ্ঞানে না গেলে সাহিত্যিক হতেন এটাই অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রশ্রয় দেয়।

জগদীশচন্দ্র সাহিত্যিক হতেন কিনা জানি না। কিন্তু সাহিত্য যে বিজ্ঞানীকেও মুক্তি দিতে সক্ষম তা তাঁর 'অব্যক্ত' গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে জাজ্বল্য।

এ যুগে আমরা তেমন একটা বিজ্ঞান-ব্যক্তিত্বের খবর পাই না। নিউটন, আইনস্টাইন, জগদীশচন্দ্র—এমন ধারার ঋষিপ্রতীম বিজ্ঞানী হয়তো আছেন, আমরা তাঁদের কথা জানি না। যাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র, গবেষক, অধ্যাপক বা বিজ্ঞান-জগতের সঙ্গে জড়িত তাঁরা ছাড়া একালের বিজ্ঞানীদের সন্ধান তত কেউ জানে বলে মনে হয় না। কিন্তু নিত্য নতুন গবেষণা, আবিষ্কার, প্রয়োগ যে কতো চলছে তা তো আমরা নিয়তই দেখছি। তবে কি ভাবতে হবে বিজ্ঞানী বলে আলাদা একটা শ্রেণী ভাগ হয়ে গেছে! তাঁরা সাধারণ মানব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন? তা ভালো কিনা, জগদীশচন্দ্রের জীবনের আলোতে একবার দেখা যেতে পারে।

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার আচার-আচরণ এমন লৌকিক যে তার মর্মকথা সম্যক আমাদের বোধগম্য না হলেও মনে হবে, হ্যাঁ, এ-ই তো, এরকমই তো! তাতে আরো বেশি সহায়ক তাঁর সাধারণ এবং স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা। সর্বোপরি তাঁর সহজ তেজোদ্দীপ্ত ব্যক্তিত্ব। স্মরণ করা যাক তাঁর প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার প্রথম তিন বছরের কথা। সাহেব অধ্যাপক আর নেটিভ অধ্যাপকদের বেতনের তারতম্য নিয়ে তাঁর যে প্রতিবাদ তা

স্বাভাবিক কিন্তু অসাধারণ। এ ক্ষেত্রে তাঁর তেজ বাইরের নয়, ভেতরের। তিন বছর বাদে তিনি জয়ী হয়েছেন। কিন্তু এ তিন বছরে নিশ্চিত তাঁকে তিন হাজার রকমের প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে এগুতে হয়েছে। এগিয়েছেন। জয়ী হয়েছেন। কিন্তু এতবড় একটা ধুন্ধুমার প্রতিবাদের কাণ্ড আশ্চর্য স্বাভাবিকতায় পরিণতির দিকে এগিয়েছে। কেউ কোনও হাঁক-ডাক শোনে নি কিন্তু। তারপরে ধরা যাক তাঁর বেতারে শব্দ পরিবহণের কথা। এতো বড়ো একটা বৈজ্ঞানিক সফলতা, পরাধীনতার অভিশাপে প্রায় নিরর্থক হবার জো। তিনি টলেন নি। তাৎক্ষণিক মূল্যের জন্যে তাঁর সামান্য আকাঙ্ক্ষা থাকলেও হয়তো তিনি নিজের প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতেন। আমি এই করেছি, এই করলাম—এমন ধারার চিন্তা-ভাবনায় তাঁর রুচি দেখা যায় নি। তাই প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটাও তাঁর কাছে এসেছে অন্যভাবে। মনে হয়, সমগ্র মানব জাতির একজন হিসেবে তাঁর যাবতীয় কর্ম-প্রচেষ্টা বিজ্ঞানে নিবদ্ধ রাখতেই তাঁর তুষ্টি। তাঁর কর্তব্যবোধ ব্যক্তিক নয়, সমগ্র সামাজিক। উদ্ভিদে প্রাণ-স্পন্দন তথা প্রাণিসুলভ আচরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা-প্রমাণ, জড়ের মধ্যেও একপ্রকারের চেতনার অস্তিত্ব ইত্যাদি দুরূহ জটিল বিষয়ে গবেষণা, বলা যায় প্রাণিজগৎ এবং বস্তুজগৎ সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় ধ্যানধারণাই উলটে-পালটে দেয়। আজকের মানুষও এমন ভাবে যে, ফুলের সৌন্দর্য এবং গন্ধ যদি মানুষ না অনুভব করে তবে তা ব্যর্থ। আসলে, জগদীশচন্দ্র আমাদের অজ্ঞানতার একটা মস্ত বড়ো পাথর ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়েছেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর সঙ্গে সব কিছুর যে একটি অবিচ্ছেদ্য বাস্তব সম্পর্ক রয়েছে, তা যে অলৌকিক বা অলীক নয়, আচার্য জগদীশচন্দ্র তা অনুভব করেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন, হাতে-কলমে আমাদের বোঝাতে পেরেছেন।

গূঢ় বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সাধারণ মানুষের বোঝার কথা নয়। কিন্তু তার থেকে যে সত্যটির সন্ধান দেন বৈজ্ঞানিক, সাধারণ মানুষ তাই দিয়ে নিজের উপলব্ধিকে ঘষামাজা করে উপযোগী করে তোলে। এ কাজটা যে ক্ষেত্রে অনায়াসে ঘটে, সে ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, মহৎ ব্যক্তিতে আর সাধারণ ব্যক্তিতে এক অবিচ্ছিন্ন আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। জগদীশচন্দ্রের বেলাতে এ ঘটনাই ঘটতে দেখা গেছে। তাঁর সমসাময়িক কালের বহু বিশিষ্ট এবং নগণ্য মানুষের অভিব্যক্তিতে আমরা তার প্রকাশ দেখেছি। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান-সাধনার সঙ্গে সাধারণের যোগসূত্র সরাসরি গড়ে ওঠে নি। বিজ্ঞান আর মানব সংস্কৃতির মাঝখানে একটা মোটা দাগের ব্যবধান অস্বীকার করা যায় না। আজ বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষের অনুভূতির দুয়ারে তেমন নাড়া দিচ্ছে মনে হয় না। তবে, মানুষকে অভিভূত এবং আচ্ছন্ন করছে ঠিকই। মানুষের সম্ভাবনার জগৎ প্রসারণের দিকে আজকের বিজ্ঞানের বহুমুখী প্রচেষ্টা অনেকটাই যেন বহির্মুখী।

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার আমাদের বিস্ময় জাগাচ্ছে ঠিকই। আবিষ্কারের

ফলশ্রুতিতে নিত্য নতুন সংযোজনায় আমাদের প্রয়োগ-জ্ঞান ও সম্পদ, ভোগ ও আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে সত্যি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক অভাবিত যান্ত্রিকতা যে ভয়াবহ মানবিক নিষ্ক্রিয়তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে তার প্রতিবিধানের কথা কিন্তু ভাবা হচ্ছে না। ভাবা হচ্ছে না, অন্তর্বিমুখ এক ধরনের উন্মার্গধর্মী আত্মসর্বস্বতার কথা—যা কিনা আজকের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ প্রয়োগের অবশ্যম্ভাবী ফল।

মানুষ যদি অতিমানুষ হয়ে উঠতে না পারে, তা হলে তার এই বিপুল বিজ্ঞান তার নিজের মহাভারে একদিন নিজেকেই ধ্বংসের মুখে টেনে নিয়ে যাবে। জীবন-বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞানচেতনা জীবনের বহিঃকুশলতায় যতই পারদর্শী হোক, তলে তলে এক ধরনের ক্ষয় বড় হতে হতে একদিন ধস নামাতে বাধ্য। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার মূল লক্ষ্যের সঙ্গে আজকের বিজ্ঞান-সাধনার মূল লক্ষ্যের তফাৎটা এখানে। অথবা, বলা যায়, আজকের বিজ্ঞান-সাধনার সত্যি কোনও লক্ষ্যই নেই যেন বা। একের পর এক প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শক্তির অজানা উৎস সন্ধানের মোহে আজকের বিজ্ঞান-চেতনা যেন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানহারা। অথচ এ কথাটা কি ভোলা যায় যে, বিজ্ঞানের ভাবনা-চেতনার ফল কেবলমাত্র মানুষেই বর্তাবে না। মানব-গণ্ডীর বহির্জগতে তাবৎ প্রাণ ও বস্তুতেও তার প্রভাব পড়বেই। কেননা, বিজ্ঞান প্রকৃতিজগৎ তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অদৃশ্য, অজানা, অননুভূত শক্তি, রূপ ও সম্পদের আবরণ উন্মোচন করে মাত্র। সে সবের স্রষ্টা মানুষ নয়। সে সব মানুষ তার কাজে লাগাতে পারে মাত্র। কেবল মানব-স্বার্থে তার প্রয়োগ মানবের অধিকার-গর্ব বাড়াতে পারে, কিন্তু তাতে মানব-অস্তিত্বের সংকীর্ণতা বাড়ে বৈ কমে না।

মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ তার শিল্পসৃষ্টিতে। বিজ্ঞান-চেতনা তার সেই শিল্পসৃষ্টির প্রচেষ্টাকে সহজ এবং উৎসাহিত করে। এ জগতে মানুষ ছাড়া আর কে পারে শিল্প সৃষ্টি করতে? সে মানুষের সৃষ্টি-শিল্পই হোক, বিধ্বংসী-শিল্পই হোক। আণবিক মারণাস্ত্রও শিল্প। ক্রেস্কোগ্রাফও শিল্প। মারণাস্ত্র ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ করায় আর ক্রেস্কোগ্রাফ স্মরণ করায় উদ্ভিদজগতের সঙ্গে প্রাণিজগতের এক অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তার কথা।

বিজ্ঞানের মূলমন্ত্রটি যদি মানব সমাজ ভুলে যায়, বিজ্ঞানীকেই তা স্মরণ করিয়ে দেবার দায়িত্ব নিতে হয়। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনা সে দায়িত্ব শুধু স্মরণ করিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হয় নি। নিরন্তর সে দায়িত্ব পালনের কর্তব্যের পথটিও তৈরী করে দেখিয়েছে। বসু বিজ্ঞানমন্দিরের পরিকল্পনায় একটি সহজিয়া ভাব-পরিমণ্ডলের ভাবনা ছিল জগদীশচন্দ্রের। তাই সেখানে কেবলমাত্র রসকষহীন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাই চলবে, এ কথা ভাবেন নি তিনি। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে মিলিত হবে মানবিক সুস্থ স্বাভাবিকতা—তাই বসু বিজ্ঞানমন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে প্রাচীন ভারতের শিল্প-চেতনা আর অভ্যন্তরে সুস্থিত বিজ্ঞান-কর্ম-সম্ভার। দেশের মানুষ আসবে-যাবে এখানে,

বিদেশের মানুষ আসবে-যাবে এখানে। বিজ্ঞানের সুবাদে মহামানব-মিলন-যজ্ঞের সমিধ সঞ্চয়ের একটি কেন্দ্র হবে বসু বিজ্ঞানমন্দির। বিজ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে এরকম পরিকল্পনা সর্বমানবের কল্যাণকামী ঋষিদৃষ্টির পরিচায়ক। আমাদের প্রাচীন ঋষিকণ্ঠে কবে অনাদি কালে ধ্বনিত হয়েছিল, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আধুনিক বিজ্ঞানের নতুন চেতনা যোগ করে জগদীশচন্দ্র প্রাচীন ঋষির সে বাণীকে যেন বাস্তবে রূপ দিলেন।

"...এ জগতে আরম্ভও নাই, শেষও নাই। এখন দেখিতেছি, এ জগতে ক্ষুদ্রও নাই, বৃহৎও নাই।

জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব! এ কথা সর্ব সময়ের জন্য ঠিক নয়। যে শক্তি আদিম জীববিন্দুকে মনুষ্যে উন্নীত করিয়াছে, যাহার উচ্ছ্বাসে নিরাকার মহাশূন্য হইতে এই বহুরূপী জগৎ ও তদ্বৎ বিস্ময়কর জীবন উৎপন্ন হইয়াছে, আজিও সেই মহাশক্তি সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। ঊর্ধ্বাভিমুখেই সৃষ্টির গতি। আর সম্মুখে অন্তহীন কাল এবং অনন্ত উন্নতি প্রসারিত।"—আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ। অব্যক্ত, পৃ. ১৭। জগদীশচন্দ্রের এ দর্শন বা বোধের অন্তর্নিহিত কথায় এলে আমাদের বহু ধারণা এবং মনন অসত্য বলেই প্রতিভাত হবে। মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব—এ ধারণা বহু প্রচলিত। এমন কি, আজকের জীবন-বিজ্ঞানের পাঠক্রমের নিম্নস্তর থেকে ঊর্ধ্বস্তর পর্যন্ত এ ধারণাটিকে একটি ধ্রুবসত্য ধরে নিয়ে পাঠ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বলছেন, সব সময়ের জন্যে এ কথা ঠিক নয়। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎসমূলে এক মহাশক্তির ক্রিয়া-প্রক্রিয়াতে প্রাণ ও বস্তুর সৃষ্টি-বৃদ্ধি-লয়—এ কথাটি মনে না রাখলে বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষাটিই সীমাবদ্ধ থেকে যেতে বাধ্য। জীবন বলতে পৃথিবীতে কেবল মানুষেরই জীবন নয়। আরও আছে। নানা প্রাণীর জীবন, গাছের জীবন, এমন কি, প্রতিটি জড় বস্তুকণার জীবন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জীবনের এই ব্যাপক তাৎপর্যটি ধরা না পড়লে বিজ্ঞানের সাধনা ব্যর্থ না হোক, সম্ভাবনাময় সার্থকতার দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে বলে মনে হয় না।

"এ জগতে ক্ষুদ্রও নাই, বৃহৎও নাই!" আশ্চর্য তো! আমরা তো এ জগতে মানুষকেই সর্ববৃহৎ বলে ভেবে এসেছি এবং স্থির বিশ্বাস করেছি। আসলে এও যে এক অবৈজ্ঞানিক ভাবনা এবং বিশ্বাস তা একবারও কি আমরা ভেবেছি? অ্যামিবাকে নিম্ন স্তরের জীব আর মানুষকে ঊর্ধ্বতম স্তরের জীব তা হলে বলি কি করে? আচার্য জগদীশচন্দ্রের কথা মেনে নিলে বলতে হবে, অ্যামিবা এক আদিম প্রাণবিন্দু, বিবর্তনের পথে যার বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে নি। কিন্তু মানুষ বিবর্তনের গতিতে ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে হতে আজ এই আকারে এসে দাঁড়িয়েছে, ভবিষ্যতে কি হবে সে সম্পর্কে কল্পনা করা গেলেও তাকেই একমাত্র সত্য বলা যাবে না। সুতরাং ক্ষুদ্র বা বৃহতের ধারণাটি জীব ও বস্তুজগতের

বেলায় বিজ্ঞান-সম্মতভাবে প্রযোজ্য নয়। এ ধারণা বিশেষ আত্মশ্লাঘাপ্রসূত মানুষের অবিজ্ঞানের ধারণা।

"এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিৎ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক-এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন; মনে করিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদকে, সচেতনকে তাঁহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিক দেখা, এ কথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক-না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্য প্রতি দিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।"—বিজ্ঞানে সাহিত্য: কবিতা ও বিজ্ঞান। অব্যক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭। কিন্তু আমরা কি দেখছি? বিরোধ এবং খণ্ডীকরণ পূর্ণোদ্যমে মহাসমারোহে চলছে আমাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। রসায়নতত্ত্ববিদ্ প্রকৃতিতত্ত্ব সম্পর্কে উদাসীন, প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ উদ্ভিদতত্ত্ব সম্পর্কে অমনোযোগী, ভূতত্ত্ববিদ্ জীবতত্ত্ব সম্পর্কে অন্ধকারে, জীবতত্ত্ববিদ্ ভূতত্ত্ব সম্পর্কে উন্নাসিক। সম্যক উপলব্ধি তো বহু দূরের ব্যাপার, বিজ্ঞানের প্রাথমিক যে শর্ত পারস্পরিক যোগ-চেতনা, তাই এখন পর্যন্ত আমাদের শিক্ষায় ও মননে সক্রিয় হয়ে ওঠে নি। তাই স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের সাহিত্যবোধ, কাব্যোপলব্ধি, শিল্পচেতনা ইত্যাদিকে বৈজ্ঞানিক মননের পরিপন্থী বলে মনে করা হয়। তা-ও যে অবিজ্ঞানপ্রসূত অসত্য জগদীশচন্দ্র তা আমাদের বোঝাতে ছাড়েন নি।

তিনি যেন উল্টো কথা বলেছেন। "বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবির সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে।" —ঐ, পৃ. ৮৬। আমরা কি জানি না, পথ সকলের এক নয়। জ্ঞানের পথ, বিজ্ঞানের পথ, শিল্পের পথ, কাব্যের পথ, সাহিত্যের পথ—তার আবার কত শাখা-উপশাখা; আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন মনে হলেও এ সকলেরই মূল লক্ষ্য চরম উপলব্ধি, পরম শক্তি ও রূপের সন্ধান, অসীম রহস্যের উন্মোচন। কোন্ উপলব্ধি, কার রূপ, কিরকম শক্তি, কিসের রহস্য—এ জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলই মানুষের নব-সৃজনী-চেতনার উন্মোচন করে। কবি হোন, বিজ্ঞানী হোন, শিল্পী হোন, সাহিত্যিক হোন, এমন কি, ধর্ম-সাধকই হোন—যদি মানুষের সৃজনী-চেতনার উন্মোচনে সহায়ক না হোন তাঁরা, তা' হলে তাঁদের সাধনার সিদ্ধি কি? তাঁদের উপলব্ধির সার্থকতা কি? তাঁদের প্রচেষ্টার অঙ্গুলি-নির্দেশ কোন্ দিকে? বিজ্ঞানী কি

কেবল বিজ্ঞানের এক অলঙ্ঘ্য প্রকোষ্ঠেই আবদ্ধ রাখবেন তাঁর সাধনার ফল, উপলব্ধির মন্ত্র? কবি কি তাঁর কাব্যের জগতের মধ্যেই কেবল গান গেয়ে বেড়াবেন? শিল্পী কি কেবল শিল্প-সুষমার অঙ্গনেই থাকবেন আবদ্ধ? তাহলে এ বিশাল সৃষ্টি-প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন যে-শক্তিপ্রকরণের অনুরণন এবং উন্মেষ, তার অন্তর্নিহিত মহামিলনের সুরটি ধরবে কে?

এ দেশে আচার্য জগদীশচন্দ্র, ঋষি জগদীশচন্দ্র, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন বাণীতে নয়, কর্মে। প্রকৃত সাধনার পথে তিল তিল করে সত্য আহরণ করে আমাদের বিতরণ করেছেন—আমরা তা গ্রহণ করতে পেরেছি কিনা, বোধ হয় তা খতিয়ে দেখার সময়ও পার হয়ে যাচ্ছে।

কবি-দার্শনিক-বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র

পরিমল গোস্বামী

কাব্য

"তবে তো আমরা এই অসীমের মধ্যে একেবারে দিশাহারা! কতটুকুই বা দেখিতে পাই? একান্তই অকিঞ্চিৎকর! অসীম জ্যোতির মধ্যে অন্ধবৎ ঘুরিতেছি; এক ভগ্ন দিকশলাকা লইয়া পাথার লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পাইতেছি। হে অনন্ত পথের যাত্রী, কি সম্বল তোমার?"

"সম্বল কিছুই নাই; আছে কেবল অন্ধ বিশ্বাস; যে বিশ্বাসবলে প্রবাল সমুদ্রগর্ভে দেহাস্থি দিয়া মহাদ্বীপ রচনা করিতেছে। জ্ঞানসাম্রাজ্য এইরূপ অস্থিপাতে তিল তিল করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আঁধার লইয়া আঁধারেই শেষ, মাঝে দু-একটি ক্ষীণ আলোরেখা দেখা যাইতেছে।"

বিজ্ঞান

"পরমাণুর ইতিহাসে রেডিয়ামের অধ্যায়ের মূল্য বেশি, সেইজন্যে একটু বিশদ করে তার কথাটা বলে নিই। রেডিয়াম লোহা প্রভৃতির মতোই ধাতুদ্রব্য। এর পরমাণুগুলি ভারে এবং আয়তনে বড়ো। অবশেষে একদিন কী কারণে কেউ জানে না রেডিয়াম ফেটে যায়, তার অল্প একটু অংশ যায় ছুটে; এই ভাঙনধরা পরমাণু থেকে নিঃসৃত আলফা রশ্মিতে যে কণিকাগুলি প্রবাহিত হয় তারা প্রত্যেকে দুটি প্রোটন ও দু'টি নিউট্রনের সংযোগে তৈরি। অর্থাৎ হিলিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুরই সঙ্গে তারা এক। বীটা রশ্মি কেবল ইলেকট্রনের ধারা। গামা রশ্মির কণা নেই; তা আলোক জাতীয়।..."

কাব্য-বিজ্ঞান রহস্য

উপরের উদ্ধৃত 'কাব্য' অংশটি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা এবং পরবর্তী 'বিজ্ঞান' অংশটি কবি রবীন্দ্রনাথের লেখা। হঠাৎ শুনলে সাধারণ পাঠকের চমক লাগিবে; মনে হবে এটি একটি আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে আদৌ আকস্মিক ঘটনা নয়। তার কারণ বিশ্বরহস্য যে মানুষের মনে বিস্ময় জাগিয়েছে; তার মনকে বিচলিত করেছে, রহস্যভেদে ব্যাকুলতা জাগিয়েছে; সকল দৃশ্যমান বস্তু বিশ্বের দুর্বোধ্য যবনিকার অন্তরালে কোন স্থির সত্য বিরাজ করছে তার সন্ধানে তার মনকে অস্থির করছে তিনিই কবি, তিনিই দার্শনিক, তিনিই বিজ্ঞানী, কবি ও বিজ্ঞানীর সত্য সন্ধানের পথ কিছু পৃথক হলেও মায়ারাজ্যে, সত্যসন্ধানের ব্যাকুলতায় দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

কবি কল্পনা করেন, বিজ্ঞানীও কল্পনা করেন। দুইয়ের উদ্দেশ্য সত্যে উত্তীর্ণ হওয়া। প্রকৃত কবির কাছে সমস্ত বিশ্বের মূল সত্য তার অনুভূতির মধ্যে এসে ধরা দেয়। বিজ্ঞানীর কাছেও তাই, কিন্তু তিনি গবেষণা ঘরে গিয়ে তার সত্য যাচাই করে নেন। সে সত্য যাচাই কবির পক্ষে কিন্তু অগ্রাহ্য নয়। জ্ঞানের দিগন্ত বিস্তৃত হলে কল্পনার বিস্ময় বাড়ে, তাতে কল্পনা আরও বিচিত্র হয়, সমগ্র বিশ্ব যে ছন্দে চলছে তার উপলব্ধি তার কাছে আরও গভীর হয়।

জগদীশচন্দ্র বসু, কবি ও বিজ্ঞানীর ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্যের মূল্য নিরূপণ করেছেন অতি চমৎকার ভাবে :

"বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায়, সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিবারাত্রি কাজ করিতেছে বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব-ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।"

কবি ও বিজ্ঞানী দুই-ই সমান কল্পনাপ্রিয় এ কথা আগে বলেছি। কিন্তু বিজ্ঞানী বহু কৃচ্ছ্রসাধনার ভিতর দিয়ে কল্পনাকে সত্যরূপে ফুটিয়ে তুলতে চলেছেন। বিজ্ঞানীর হাতে জ্ঞানের সত্য বিস্তারে, কল্পনারও দিগন্ত যে বিস্তৃত হচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে দার্শনিকদের মতবাদের ইতিহাস পড়লে। বিশ্ববিষয়ে পূর্বদার্শনিকদের কত সত্য-দর্শন আজ মিথ্যা হয়ে গেছে। তাই এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে দার্শনিকদের চিন্তা এবং কবির উপলব্ধির গভীর যোগ আছে।

এই দুইয়ের—(অথবা তিনের) যোগ ঘটেছে জগদীশচন্দ্রে। তিনি একই সঙ্গে কবি, দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী। তিনের মধ্যে কোথাও পরস্পর বিরোধিতা নেই তাই নয়, পরস্পরের মধ্যে সখ্য আছে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল। যিনি কবি বা দার্শনিক নহেন তিনি বড় বিজ্ঞানী হতে পারেন না। আমি ছন্দে কবিতা লেখা অর্থে কবি বলছি না। আমি বলছি মনোভাবের প্রসঙ্গে। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে বলতে পারেন—

"এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়তো, সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত আমি কত দূর দূরান্তের দেশ দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত

অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রচণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়মে অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যপনা যা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্রে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।" (২০-এ অগাস্ট, ১৮৯২)

এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক জগদীশচন্দ্রের কথা—

"অমর জীববিন্দু প্রতি পুনর্জন্মে নূতন গৃহ বাঁধিয়া লয়। সেই আদিম জীবনের অংশ, বংশপরম্পরা ধরিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। আজ যে পুষ্পকলিকাটি অকাতরে বৃন্তচ্যুত করিতেছি, ইহার অণুতে কোটি বৎসর পূর্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে। প্রতি জীবের সম্মুখেও বংশপরম্পরাগত অনন্ত জীবন প্রসারিত।"

"সুতরাং বর্তমান কালের জীব অনন্তের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। তাহার পশ্চাতে যুগযুগান্তরব্যাপী ইতিহাস ও সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ। আর মনুষ্য? প্রথম জীবকণিকা মনুষ্যরূপে পরিণত হইবার পূর্বে কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। অসংখ্য বৎসরব্যাপী বিভিন্ন শক্তি গঠিত, অনন্ত সংগ্রামে জয়ী, জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব!" "আজ সেই কীটাণুর বংশধর দুর্বল জীব, স্বীয় অপূর্ণতা ভুলিয়া অসীম বল ধারণ করিতে চাহে।"

কল্পনাপ্রবণ স্বপ্নদেখা মন কোন্ পর্যায়ে পৌঁছলে সমস্ত দৃশ্যজগতের অতীত যে সত্য তাকে উপলব্ধি করা যায় তার এক আশ্চর্য সংবাদ দিয়েছেন কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ—

"......that serene and blessed mood
In which the affections gently lead us on—
Until the breath of this corporeal frame
And even the motion of our human blood,
Almost suspended, we are laid asleep
In body, and become a living soul:
While with an eye made quiet by the Power
Of harmony, and the deep Power of Joy
We see into the life of things."

মনে এমন অবস্থা আসে যখন নিঃশ্বাসবায়ু যেন স্তব্ধ হয়ে যায়, রক্তচলাচল থেমে যায়, দেহ ঘুমিয়ে পড়ে—সমস্ত সত্তা জেগে উঠে বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে

মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। সেই সমাহিত অবস্থায় সত্যকে চেনা যায় দেখা যায়। কবির এই সমাধি ঘটে, বিজ্ঞানীর এই সমাধি ঘটে। কিন্তু তবু বিজ্ঞানী শুধু বিস্ময়ে গান গেয়ে থেমে যান না। তাঁর উপলব্ধি বাস্তবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেন। অনন্ত কোটি সূর্য গ্রহময় বিশ্বপুঞ্জের দ্বারা কল্পনাতীত শূন্য-স্পেস ভরা। এর আরম্ভ কোথায় শেষ কোথায় এ প্রশ্ন সকল কবির, সকল দার্শনিকের, সকল বিজ্ঞানীর। তাই এ প্রশ্নের মধ্যেই যে কাব্য আছে তা জগদীশচন্দ্রকে বিচলিত না করে পারে নি। তিনি লিখেছেন—

"জার্মান কবি রিকটার স্বপ্নরাজ্যে দেবদূতের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। দেবদূত কহিলেন, 'মানব, তুমি বিশ্বরচয়িতার অনন্ত রচনা দেখিতে চাহিয়াছ—আইস মহাবিশ্ব দেখিবে।' মানব দেবস্পর্শে পৃথিবীর আকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেবদূতসহ অনন্ত আকাশপথে যাত্রা করিল। আকাশের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তর ভেদ করিয়া তাহারা ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সপ্তগ্রহ পশ্চাতে ফেলিয়া মুহূর্তের মধ্যে সৌরদেশে উপনীত হইল। সূর্যের ভীষণ অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত মহাপাবকশিখা তাহাদিগকে দগ্ধ করিল না। পরে সৌররাজ্য ত্যাগ করিয়া সুদূরস্থিত তারকার রাজ্যে উপস্থিত হইল। সমুদ্রতীরস্থ বালুকাকণার গণনা মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু এই অসীমে বিক্ষিপ্ত অগণ্য জগতের গণনা কল্পনারও অতীত। দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিয়া অগণ্য জগতের অনন্ত শ্রেণী। কোটি কোটি মহাসূর্য প্রদক্ষিণ করিয়া কোটি কোটি গ্রহ ও তাহাদের চতুর্দিকে কোটি কোটি চন্দ্র ভ্রমণ করিতেছে। উর্দ্ধহীন, অধোহীন, দিক্‌হীন অনন্ত! পরে এই মহাজগৎ অতিক্রম করিয়া আরও দূরস্থিত অচিন্ত্য জগৎ উদ্দেশে তাহারা চলিল। সমস্ত দিক আচ্ছন্ন করিয়া কল্পনাতীত নূতন মহাবিশ্ব মুহূর্তে তাহাদের দৃষ্টিপথ অবরোধ করিল। ধারণাতীত মহাব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য সমাবেশ দেখিয়া মানুষ একেবারে অবসন্ন হইয়া কহিল, 'দেবদূত! আমার প্রাণবায়ু বাহির করিয়া দাও! এই দেহ অচেতন ধূলিকণায় মিশিয়া যাউক। অসহ্য এ অনন্তের ভার! এ জগতের শেষ কোথায়?' তখন দেবদূত কহিলেন, 'তোমার সম্মুখে অন্ত নাই; ইহাতেই কি তুমি অবসন্ন হইয়াছ? পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখো, জগতের আরম্ভও নাই।"

জগদীশচন্দ্রের হাতে এই বাংলা অনুবাদটি মূল ইংরাজীর মতোই (যদি ইংরাজী থেকেই অনূদিত হয়ে থাকে) সুন্দর। একটুখানি উদ্ধৃত করি—

"Then the man sighed and stopped, shuddered and wept. His overladen heart uttered itself in tears and said, "Angel, I will go no further: for the spirit of man acheth with its infinity. Insufferable is the Glory of God. Let me lie down in the grave and hide me from the persecution of the Infinite,

for end I see there is none............Then the Angel lifted up his glorious hands to the heaven of heavens, saying, "End there is none to the universe of God. Lo! also, there is no beginning!

কবি জগদীশচন্দ্র অথবা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র অথবা দার্শনিক জগদীশচন্দ্র যে নামেই তাঁকে ডাকা যাক, যে দিক দিয়েই তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক—সেই দিকেই তাঁর অজস্র দানে অথবা কৃতিত্বে তিনি আমাদের চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন।

জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

অমিয়কুমার মজুমদার

দুই দিকে দুই দিকপাল—জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-লক্ষ্মীকে তাঁর সুয়োরানী করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ কাব্যসরস্বতীকে। আপাত-দৃষ্টিতে দুই পরস্পর সমান্তরাল রেখা এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছিল। দুই বিরাট প্রতিভার চিন্তাধারার সূত্র বোধহয় অনেকটা সমধর্মী। তাই তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল গভীর। বিজ্ঞান ও কাব্যের ঘর আলাদা, কিন্তু তাদের মধ্যে চলাফেরা, মেলামেশা বা দেনা-পাওনা চালাবার ছিল এক বাতায়ন। এই কারণে কবি ও বিজ্ঞানীর মনের খোরাক উভয়ে উভয়ের কাছে পেতেন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ছিল বিজ্ঞানানুগ। তাঁর প্রবৃত্তির মধ্যে ছিল বিজ্ঞানের অংশ। সাহিত্য সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র ছিলেন একই রকম। ঐ ছাড়াও জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে পরস্পরের কাছাকাছি নিবিড়ভাবে নিয়ে এসেছিল উভয়ের দেশপ্রীতি।

রবীন্দ্রনাথ যখন জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হন তখন বিজ্ঞানীর নাম মোটেই প্রচারিত হয় নি; কবির তো নয়ই। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "প্রবল সুখ-দুঃখের দেবাসুরে মিলে অমৃতের জন্যে যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল সেই সময় আমি তার খুব কাছে এসেছি। বন্ধুত্বের পক্ষে এমন শুভ সময় আর হয় না।"

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে আচার্য বসু ইউরোপ থেকে ফিরে এলে রবীন্দ্রনাথ জগদীশ-চন্দ্রের বাড়িতে গিয়েছিলেন তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে। কিন্তু তাঁকে বাড়িতে না পেয়ে টেবিলের উপরে রেখে আসেন একতোড়া ম্যাগনোলিয়া, বিজ্ঞানীর প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ।

এর পর থেকেই কবি ও বিজ্ঞানীর মধ্যে সখ্যতা বাড়তে থাকে। কবি এই বিশ্বজগতে তাঁর অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে অরূপকে দেখতে পান। তাকেই তিনি রূপের মধ্যে ধরবার চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরিয়ে যায় কবির দৃষ্টি ও ভাব সেখান থেকে অরূপের দিকে ধাবিত হয়। বৈজ্ঞানিকও ঠিক তেমনি। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু কবিত্ব সাধনার সঙ্গে তার ঐক্য আছে। শ্রুতি যেখানে নিস্তব্ধ সেখান থেকে তিনি সুরের রেশ সীমার মধ্যে টেনে নিয়ে আসেন। প্রকাশের অতীত যে বস্তু, বৈজ্ঞানিক তাকেই ব্যক্ত করে তোলেন।

তাই রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন। ১৯০০ সালে লণ্ডন থেকে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—"তিন বৎসর পূর্বে—তোমার নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাকিলে।

তারপর একটি একটি করিয়া তোমাদের অনেকের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। তোমাদের উৎসাহ ধ্বনিতে মাতৃস্বর শুনিলাম।"

কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে জগদীশচন্দ্র গবেষণার ব্যাপারে পদে পদে বিব্রত হয়ে থাকেন। বিলাতে গবেষণা করা প্রয়োজন। কিন্তু সরকার তাঁকে বেতনসহ দীর্ঘ দিনের ছুটি মঞ্জুর করবেন না, জগদীশচন্দ্রের এই ছিল ভয়। জগদীশচন্দ্রের জীবনের সেই দুর্দিনে একান্ত সুহৃদ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পত্র লেখেন, "যেমন করিয়া হোক তোমার কার্য অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়া আসিও না। তুমি তোমার কর্মের ক্ষতি করিও না; যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয়, সে ভার আমি লইব।"

জগদীশচন্দ্রকে আর্থিক সাহায্য দেবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুণগ্রাহী ত্রিপুরাধীশ মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে যে-পত্র লেখেন তার মধ্যে জগদীশচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের আরও নিদর্শন পাওয়া যায়।

"জগদীশবাবুর জন্য কিছু করিবার সময় অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার বিজ্ঞানালোচনার সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে উচ্চের দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধায় তাঁহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিলে আমাদের পক্ষে ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা থাকিবে না। মহারাজ, আপনাকে স্পষ্ট করিয়া বলি—আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের বিবেচনাদোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত না হইয়া থাকিতাম তবে জগদীশবাবুর জন্য আমি কাহারও দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না। আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম। জগদীশবাবুর জন্য আমি প্রত্যক্ষ ভাবে মহারাজের দরবার করিতে ইচ্ছুক—এজন্য আমি আগরতলা যাইতে প্রস্তুত।"

অসময়ে দেশে ফিরিয়া আসিলে পাছে জগদীশচন্দ্রের কর্ম সমাধা সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে রবীন্দ্রনাথ এই আশঙ্কা দূর করতে পারতেন না। তাই তিনি সর্বদাই উৎসাহ দিয়ে তাঁকে পত্র দিতেন।

জীবনের প্রথমাংশে বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যে জগদীশচন্দ্র তাঁর কাজ চালাতে বাধ্য হন। দীর্ঘদিনের অমানুষিক পরিশ্রম অবশেষে সাফল্যমণ্ডিত হলো। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের ব্রাডফোর্ড সভায় প্রবন্ধ পাঠ করবার পর সমস্ত বিজ্ঞানী সম্প্রদায় স্তম্ভিত হয়ে যান। Prof. Barret জগদীশচন্দ্রকে, বললেন, "We thought your time is being wasted in India, and you are hampered here. Can't you come over to England? Suitable chairs fall seldon vacant here, and there are many candidates. But there is just now a good appointment and should you care to accept it, no one else will get it."

এই অপূর্ব সুযোগের সংবাদ পেয়ে জগদীশচন্দ্র হতবুদ্ধি হয়ে যান। জন্ম

বার বার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। একদিকে অফুরন্ত সুবিধার মধ্যে গবেষণার সুযোগ অন্যদিকে চীরবসন পরিহিতা ভারতমাতার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। দিশাহারা জগদীশচন্দ্র জীবনের শ্রেষ্ঠ সুহৃদ রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন, "আমি ভবিষ্যতে কি করিব, এ সম্বন্ধে তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর লিখিও। আমার সময়ের যাহাতে সদ্ব্যবহার হয়, লিখিও।"

জগদীশচন্দ্র কত নির্ভর করতেন রবীন্দ্রনাথের উপর, এ পত্র তারই নিদর্শন। বিদেশে দিনরাত্রি কঠোর পরিশ্রমের পর মন যখন অবসন্ন ও শুষ্ক হয়ে যায় তখন রবীন্দ্রনাথের পত্র ও কবিতা জগদীশচন্দ্রকে উৎসাহিত করে তোলে। জগদীশচন্দ্র বারংবার এই কথা রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন। "সম্মুখে অজ্ঞাত রাজ্য, আমি একাকী পথ খুঁজিয়া ক্লান্ত। তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই।" লণ্ডনে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মহলে বক্তৃতা পাঠ এবং পরীক্ষার প্রদর্শনী দেখাবার পর জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছা হলো জার্মেনী, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ঘুরে তাঁর আবিষ্কার জগৎসমক্ষে প্রচার করবার। পরামর্শ চেয়ে পাঠান রবীন্দ্রনাথের কাছে। অকৃত্রিম বন্ধু রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, "যদি পাঁচ-ছ বৎসর তোমাকে বিলাতে থাকতে হয় তুমি তারই জন্য প্রস্তুত হোয়ো।... তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫/৬ বৎসর সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্য দরকার হবে।...যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত চিত্তে সেখানে কাজ করতে পার আমি বোধ হয় তার ব্যবস্থা করে দিতে পারব।"

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দীর্ঘ দিনের ছুটি নিয়ে তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন। ছুটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। জগদীশচন্দ্র দুঃখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন যে, দেশে গেলে সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ ভারত সরকার শ্রীযুক্ত বসুকে হয়তো আর ছুটি মঞ্জুর করবেন না। রবীন্দ্রনাথ মিনতি করে তাঁর বন্ধুকে পত্র দেন, "তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর—দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা উদ্ধার তুমিই করিবে। আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমি ত ফাঁকি দিয়ে স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিব।" এ পত্রের উত্তরে জগদীশচন্দ্র যে পত্র লেখেন তাতে তাঁর মনের এক অধ্যায়ের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "যদি আমার এদেশে অধিকদিন থাকা আবশ্যক মনে কর তবে তোমাকে এখানে আসিতে হইবে।" ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে Linnean Society-তে 'Electric, Response of Metal and ordinary Plants' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করবার পর জগদীশচন্দ্রের খ্যাতি আরও পরিব্যাপ্ত হয়। তিনি বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। জয়লাভের সংবাদ (প্রথমেই) জগদীশচন্দ্র পাঠান রবীন্দ্রনাথের কাছে, "আজ আমার কর্ণে এখনও রণক্ষেত্রের দুন্দুভি বাজিতেছে। কারণ এইমাত্র আমি সংগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। তুমি আমার জয়সংবাদে সুখী

হইবে। সমবেত Physiologist, Biologist প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী, তাহার মধ্যে তোমার বন্ধু একাকী এই প্রতিপক্ষকুলের সহিত সংগ্রাম করিতে নিযুক্ত। ১৫ মিনিটের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম যে রণে জয় হইয়াছে।"

জগদীশচন্দ্রকে শুধু উৎসাহ দিয়েই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি। বঙ্গদর্শন কাগজে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সহজ বাংলা ভাষায় দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত করেন। জগদীশচন্দ্রের নিজের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি বাংলায় তাঁর গবেষণার কিছু অংশ লিখবেন। কিন্তু লিখবার কথা খুঁজে না পাওয়াতে মনের ইচ্ছা চেপে রাখতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহজে বৈজ্ঞানিক সত্য অক্ষুণ্ণ রেখে জগদীশচন্দ্রের কাজের আভাস বঙ্গদর্শনে লিখতেন। জগদীশচন্দ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে বন্ধুকে প্রশংসা করেছেন এ কাজের জন্য।

রবীন্দ্রনাথ যেমন জগদীশচন্দ্রকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, ঠিক তেমনি জগদীশচন্দ্রও তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুকে জগৎ সমক্ষে প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র যখন শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতেন তখন শর্ত থাকতো প্রতিদিন একটি করে ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হবে এবং সন্ধ্যাবেলা সেটি জগদীশচন্দ্রকে পড়ে শোনাতে হবে। এমনি করে ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের অমূল্য গল্পরাজির সৃষ্টি হয়।

বিশ্বের দরবারে প্রিয়তম বন্ধুকে প্রতিষ্ঠিত করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রবল ছিল। কবিকে লেখা চিঠির মধ্যে আমরা তাঁর সেই পরিচয় পেয়ে থাকি, "তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকবে, আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইব।" তিনি লিখেছেন, তোমার পুস্তকের জন্য আমি অনেক মতলব করিয়াছি। তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই। তোমার লেখা তরজমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি। তাঁহারা অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন না। ··· Publisher-রা ফাঁকি দিতে চায়। সে যাহা হউক, তোমার ভাগে কেবল glory, লাভালাভের ভাগ আমার। যদি কিছু লাভ হয় তাহার অর্ধেক তরজমা-কারীর আর অর্ধেক কোন সদনুষ্ঠানের। ইহাতে তোমার আপত্তি নাই তো?"

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ সানন্দে সম্মতিপত্র লিখেছিলেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে আচার্য বসু যখন দ্বিতীয়বার ইংল্যাণ্ডে যান তখন রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা, গল্পটির ইংরাজী তর্জমা প্রিন্স ক্রপট্‌কিন নামক এক সমালোচককে সমালোচনার জন্যে দিয়েছিলেন। উক্ত সমালোচক ভদ্রলোক প্রভূত উচ্ছ্বাস সহকারে গল্পটির প্রশংসা করেন। ভরসা পেয়ে জগদীশচন্দ্র 'হার্পার্স ম্যাগাজিন' নামক কাগজে ঐ লেখা প্রকাশ করতে পাঠান। কিন্তু তখন পাশ্চাত্ত্য জনসাধারণ প্রাচ্যের জীবনধারায় আগ্রহী না থাকায় সে রচনা তখন প্রকাশিত হয় নি। এর পরে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে আচার্য বসু যখন শেষ বারের মত আমেরিকায় যান তখন তাঁর

গবেষণা সম্পর্কিত প্রবন্ধ 'হার্পার্স ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত হচ্ছিল। জগদীশচন্দ্র এ সুযোগ হারালেন না। রবীন্দ্রনাথের গল্পের ইংরেজী অনুবাদ সেখানে ছাপাবার বন্দোবস্ত করলেন। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে যে পত্র লেখেন তা সত্যই অপূর্ব। "বন্ধু, পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্য ভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর হইল। দেবতার এই করুণার জন্য কি করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব? চিরকাল শক্তিশালী হও। চিরকাল জয়যুক্ত হও। ধর্ম তোমার চিরসহায় হউন।"

যে মুহূর্তে জগদীশচন্দ্রের জীবনে অবসাদ আসতো সেই মুহূর্তেই তিনি চিঠি লিখতেন তাঁর প্রিয় বন্ধুর কাছে। রবীন্দ্রনাথের গল্প, কবিতা, পত্রাবলী তাঁকে অবসাদ থেকে টেনে তুলতো। তাই জগদীশচন্দ্র প্রায়ই রবীন্দ্রনাথকে লিখতেন, "তোমার নিকট কত বিষয় বলিবার আছে, কিন্তু পত্রে পরিস্ফুট করা হয় না। উৎসাহ কিংবা অবসাদের সময়ে তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করি। অধিকাংশ সময়েই তো অবসাদ, সুতরাং তোমার সান্নিধ্য অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়।"

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প জগদীশচন্দ্রকে আবিষ্ট করে ফেলতো। তিনি চলে যেতেন অতীত দিনে; কল্পনার হাওয়ায় ভর করে তিনি যৌবনের প্রথম দিনগুলির দিকে উড়ে যেতেন। কবিকে লেখা এক পত্রে তাঁর এই মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছে—"আজ আর সব কথা ভুলিয়া তোমার গৃহে অতিথি হইলাম।...সন্ধ্যার পর তোমার ঘরে যেন বসিয়াছি। আমার ক্রোড়ে আমার ছোট বন্ধুটি বসিয়া আছে (কবিকন্যা), অদূরে বন্ধু-জায়া, আর তুমি তোমার লেখা পড়িয়া শুনাইতেছ। আমি তোমার লেখাগুলি পড়িতেছিলাম, তোমার স্বর যেন শুনিতে পাইতেছি...।"

আচার্য পত্নী শ্রদ্ধেয়া অবলা বসু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন, "জীবনের শেষ বৎসরেও উনি (জগদীশচন্দ্র) প্রত্যহ গ্রামোফোনে কবির স্বর আজি হতে শতবর্ষ পরে শুনিয়া শয়ন করিতে যাইতেন।"

জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক ও কবি। উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বের হয়েছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা মনে রাখেন না, পথকে গ্রাহ্য করেন না, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পথকে উপেক্ষা করেন না। প্রমাণ দিয়ে কবি সব কিছু বিচার করতে পারেন না। সব কথাতেই কবিকে 'যেন' যোগ করতে হয়। আর বৈজ্ঞানিকের পথ অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল। কঠোর পথে সর্বদাই আত্মসংবরণ করে চলতে হয়। অপরিসীম রহস্যের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে বৈজ্ঞানিক আলোকদীপ্ত প্রান্তরে উপস্থিত হন। জড়তার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যায় সেই জ্যোতির্ময় আলোকের স্পর্শে। বৈজ্ঞানিক আত্ম-সংবরণ করতে পারেন না, বলে উঠেন, "ইহা সত্য, ইহা অভ্রান্ত।"

রবীন্দ্রনাথের রচনায় ছিল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ফল্গুপ্রবাহ, তাই জগদীশচন্দ্র

বারংবার রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন—"তুমি যদি কবি না হইতে তো শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইতে পারিতে।"

ভাষার মাধ্যমে জগদীশচন্দ্রের চিন্তাধারার প্রকাশভঙ্গী ছিল অনবদ্য। তাঁর 'অব্যক্ত' পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পরে বিস্মিত কবি তাই জগদীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন "বন্ধু, যদিও বিজ্ঞান-বাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরানী করিয়াছ তবু সাহিত্য সরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত—কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃতা হইয়া আছে।"

উদ্ভিদ্‌তাত্ত্বিক গবেষণায় আচার্য জগদীশচন্দ্র

দিবাকর সেন

না। আচার্য জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেন নি। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছিলেন উদ্ভিদজগতের সঙ্গে প্রাণিজগতের কত সাদৃশ্য। এক কথায় তিনি দেখিয়েছিলেন উদ্ভিদজীবন প্রাণিজীবনের ছায়ামাত্র। সম্পূর্ণ নতুন কথা। তখনকার ইয়োরোপীয় প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের মতবাদের পরিপন্থী। সেদিন সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সুসঙ্গত সমালোচনায় মৌলিক গবেষণার কাজ দ্রুত এগিয়ে যায় সন্দেহ নেই। কিন্তু জগদীশচন্দ্রকে যে ধরনের সমালোচনার সামনে পড়তে হয়েছিল তা স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিপ্রসূত ছিল না। বিজ্ঞান গবেষণার ব্যাপারে নতুন কথা একজন ভারতীয়ের মুখে শুনতে হবে—এ কেমন কথা! কিন্তু জগদীশচন্দ্র ছিলেন অবিচল। তিনি বিশ্বাস করতেন কোন এক বিশেষ জাতির ওপর মানুষের জ্ঞানের প্রসার নির্ভর করে না। জ্ঞানের উন্নতির জন্য মানুষকে পরস্পর নির্ভরশীল হতে হয়।

তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ভারতবর্ষে মৌলিক গবেষণা শুরু করেন। ব্রিটিশ শাসকদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচার ছিল স্বাধীন বিজ্ঞান-চিন্তা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য, ভারতীয় সভ্যতার সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই। জগদীশচন্দ্রের পদার্থ-বিদ্যাবিষয়ক (আজকের) যুগান্তকারী আবিষ্কারকে তাঁরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এর বেশী কিছু নয়। কারণ সে কাজের মূল্যায়ন করার মত যথেষ্ট অগ্রগতি তখনো হয় নি।

যে বিশেষ গবেষণার ফল তাঁকে উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ে অনুসন্ধান চালাবার ইন্ধন জুগিয়েছিল তা হল বিদ্যুৎ-তরঙ্গ গ্রাহকযন্ত্র 'কোহেরারের' ওপর কাজের ফল। তিনি নিজে এ বিষয়ে বলেছিলেন, "তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। দেখিলাম, হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়ালিপিতে সেই একইরূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষ প্রয়োগে তাহার সাড়া একেবারে অন্তর্হিত হইল।"

এ বিষয়ে তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণের ওপর একটি প্রবন্ধ পড়লেন ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের "প্যারিস ইন্টারন্যাশানাল কংগ্রেস অব ফিজিক্স-"এর সভায়। জড় পদার্থের এই সাড়াকে তিনি ভৌতরাসায়নিক প্রতিক্রিয়া বলে বললেন। বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া হ'ল মিশ্র। সম্ভবত সেইদিন থেকেই শুরু। জগদীশচন্দ্র অজান্তে পা বাড়ালেন

সংগ্রামের অজানা বন্ধুর পথে। বিষয়টি নিয়ে আরও গভীরভাবে পদার্থবিদ্ হিসেবে অনুসন্ধান চালাবার একরাশ চিন্তা নিয়ে লণ্ডনে এলেন। কিন্তু চিন্তার সাথে কাজের যথার্থ সংযোগ ঘটলো না। হবে কি করে? অসুস্থ হলেন তরুণ বিজ্ঞানী। একাকী রয়েছেন Wimbledon-এর একটি বাড়িতে। বিছানায় শায়িত। সামনে জানালা। দূরে লণ্ডনের ঘোলাটে আকাশ। আকাশের পটভূমিতে একটি 'Horse chest-nut' গাছ। একদিন গাছটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জগদীশচন্দ্রের হঠাৎ মনে হলো, এই তো কয়েকদিন আগে প্যারিসে দেখিয়ে এসেছেন জড়পদার্থের বৈদ্যুতিক সাড়া। তবে কেন এই গাছটির ভেতর এ ধরনের কোন সাড়া দেখতে পাওয়া যাবে না। শারীরতত্ত্ববিদ্‌রা তো বলে থাকেন উত্তাপ, শৈত্য, বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক আঘাত ইত্যাদি প্রয়োগ করে জান্তব তন্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটালে সেগুলি বৈদ্যুতিক সাড়ার মাধ্যমে তাদের জীবনের অস্তিত্ব প্রকাশ করে। প্রাণিপেশীতে উত্তেজনা ঘটালে তারা সঙ্কুচিত হয়, মৃত পেশীতে এরকম কোন সাড়া দেখতে পাওয়া যায় না। প্রাণী-বিজ্ঞানীরা তো আরও বলেন, প্রাণিপেশীতে সবচেয়ে সূক্ষ্ম জীবন-লক্ষণ হচ্ছে, উত্তেজনার ফলে বৈদ্যুতিক সাড়া। মনে পড়লো কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের নিজের তৈরী প্রয়োগশালার কথা। পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছেন তাঁর নিজের তৈরী "কোহেরার যন্ত্র" বিদ্যুৎ-রশ্মিপাতের ফলে ঐ ধরনের বৈদ্যুতিক সাড়া দেয়। টিনের তারে মোচড় দিয়ে দেখেছেন ঐ একই ধরনের সাড়া পাওয়া যায়। শুয়ে শুয়ে আরও মনে হলো, প্রাণী আর নির্বাক উদ্ভিদজগৎ ভিন্ন নিয়মে চালিত, স্পর্শকাতর দু-চারটি গাছ ছাড়া গাছের কোন উত্তেজনার অনুভূতি নেই—এ সব ধারণা ঠিক নাও হতে পারে।

সুস্থ হলেন জগদীশচন্দ্র। দেখা করলেন কেম্ব্রিজের শারীরবিদ্যাবিশারদ্ স্যার মাইকেল ফস্টারের সঙ্গে। সব কথা শুনে আশ্চর্য হলেন ফস্টার সাহেব। রয়াল সোসাইটিতে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। বক্তৃতার দিন কাছে এগিয়ে এলো। হাতে সময় নেই। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব কথা গুছিয়ে বলতে হবে। মনের অবস্থা উদ্বেগজনক। দিনরাত পরিশ্রম করছেন। কিন্তু উদ্বেগ বেড়েই চলেছে। সব কাজ রেখে বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে নিজের মনের উদ্বেগের কথা জানিয়ে দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। লেখার পর যেন উদ্বেগ কেটে গেল। ১০ই মে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে রয়াল সোসাইটিতে বক্তৃতা দিলেন। পুরো এক ঘণ্টা। আশ্চর্য সে কথন। যেন বিশ্ববাসীর সামনে বক্তৃতা দিচ্ছেন। দৃপ্ত বাচনভঙ্গীতে বক্তৃতা শেষ করলেন। মঞ্চ থেকে নেমে দেখা করলেন বিলেতের তদানীন্তন সর্বপ্রধান জীবতত্ত্ববিদ স্যার বার্ডন স্যেণ্ডারসনের সঙ্গে। নিজের নতুন উপলব্ধির কথা তুলে ধরলেন। অনুরোধ করলেন এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার। কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। স্যেণ্ডারসন সাহেব খানিকটা বিরক্ত হয়ে বললেন, জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি যা বলছেন সে সম্বন্ধে আমাদের

34

Response in the Living and Non-Living

completed Feb 1902

My book will be soon published printed though it will not be published till the middle of October. I do not know whether I shall ever write another, and I have therefore a great longing for putting a few lines in dedication:

"To my countrymen

"Love and Service"

or

"To my countrymen
Who will yet claim
The intellectual heritage
Of their ancestors"

actual dedication:
To my countrymen
this work is dedicated

My work here is practically ended and the future is full of uncertainty and enforced inactivity, but I still think that we have to keep up strength of mind in working for the establishment of Truth.

We live by such hopes and they lean on a rock which will endure!

একটি চিন্তার মুহূর্ত। অনেক অনিশ্চিতের মধ্যে অনেক পরিশ্রমে জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রথম গ্রন্থের লেখা শেষ করেছেন। ভাবছেন বইটি কাকে উৎসর্গ করবেন।

চেষ্টা আগে নিষ্ফল হয়েছে ; তাই আপনার কথা অসম্ভব ও অগ্রাহ্য ; এ শাস্ত্রে আপনার অনধিকার চর্চা হয়েছে। আপনি পদার্থবিদ্যার পথে যশস্বী হয়েছেন ; আপনার সামনে সেই প্রশস্ত পথে বহু কৃতিত্ব অপেক্ষা করছে। আপনার অজানা পথ থেকে আপনি নিবৃত্ত হোন।

নিবৃত্ত হওয়া গেল না। সম্ভব ছিল না। জগদীশচন্দ্রের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কোন ব্যাপারে নিবৃত্ত হওয়ার নজির তাঁর চরিত্রে কোনকালেই ছিল না। গ্রামবাংলার মুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন জগদীশচন্দ্র। প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসাও ছিল সেই ছোট্ট বয়েস থেকেই। সেই সাথে ছিল সহজাত কারিগরী প্রতিভা। এই দু'য়ের সংমিশ্রণ তাঁকে ঠেলে নিয়ে গেল সম্পূর্ণ অজানা পথে। প্রত্যেকটি শারীরবৃত্তঘটিত পরীক্ষাকে "ফিজিকো কেমিক্যাল" সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা হলো না। সঙ্কল্প থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরে আসতেই হলো। দেখতে পেলেন উদ্ভিদরাজ্যের অপার রহস্যজগতের সামনে তিনি দাঁড়িয়ে।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জন্ম হলো আজকের আধুনিক জীবপদার্থবিদ্যার। নতুন এক "জীবন গ্রন্থের" সূচনা করলেন পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে। ঠিক যেভাবে আজ থেকে প্রায় চার শতাব্দী আগে গ্যালিলিও ল অব মেকানিকস্ ও তাঁর গাণিতিক অভিব্যক্তি সম্পর্কে যুগান্তকারী গবেষণার শেষে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, "প্রাকৃতিক মহাগ্রন্থ গণিতের ভাষায় লেখা হয়েছে।"

বৃক্ষজগতের সীমাহীন সমস্যার মধ্যে তিনি ডুব দিলেন। উদ্ভিদের শরীরচর্চার জন্য তখন যে ধরনের যন্ত্রের চল ছিল সেগুলোকে দরকার মত পাল্টালেন। অদল-বদল করলেন। সুবিধে হলো না। অনুভব করলেন উদ্ভিদ সম্পর্কে সঠিক কিছু জানতে গেলে দরকার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। উপযুক্ত যন্ত্র তৈরীর অক্ষমতাই উদ্ভিদ সম্পর্কে মনগড়া মতবাদের সৃষ্টি করতে প্ররোচিত করেছে। সামান্য উপকরণকে কাজে লাগিয়ে সূক্ষ্ম কাজের উপযোগী অথচ সরল যন্ত্র নির্মাণে তিনি ছিলেন বিরল প্রতিভার অধিকারী। প্রতিভার সঙ্গে যোগ হলো কঠোর পরিশ্রম। প্রথমে ফটোগ্রাফিক ও অপ্‌টিক্যাল লিভার ব্যবস্থায় কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন। কিন্তু দেখলেন এ ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। চাই আরও নিখুঁত যন্ত্র। প্রয়োজনের সঙ্গে তালে তাল রেখে যন্ত্রের ক্রমবিকাশ শুরু হলো দ্রুত লয়ে। তৈরী হতে লাগল একের পর এক স্বয়ংলেখ যন্ত্র। দামী যন্ত্রাংশ দিয়ে নয়, সামান্য উপকরণকে কাজে লাগিয়ে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে ঘড়ি-কলের সাহায্যে। যন্ত্রগুলো গাছকে সুন্দরভাবে কথা বলাতে সক্ষম হলো। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, এইসব যুগান্তকারী যন্ত্রের যন্ত্রীরা কেউ ডিগ্রীধারী ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন না। সাধারণ কারিগর ছিলেন। ডিগ্রীধারী ইঞ্জিনীয়ার

নিয়োগ করবার মত আর্থিক সঙ্গতি তখন আচার্যদেবের ছিল না। সাধারণ কারিগরকে নিজে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। যন্ত্রগুলোর গঠন-প্রণালী আজকের দিনেও বিস্ময়। পরবর্তী কালে যন্ত্র-গুলোর গঠন-চাতুর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি প্রায়ই বলতেন, এই যন্ত্র-গুলোর অনুকরণের জন্য ইয়োরোপীয় উন্নত মানের অনেক যন্ত্রাগারে বহুবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা চেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

উদ্ভিদ আর প্রাণীর সাড়ার মধ্যে কতটা মিল আছে, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই তিনি উদ্ভিদ রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। এজন্য দেখা যায়, জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদতাত্ত্বিক গবেষণায় স্পর্শকাতর গাছগুলোই তাঁর কাছে প্রথমদিকে প্রাধান্য পেয়েছিল। সেই উপযোগী যন্ত্রও। উত্তেজনায় গাছ কি রকম সঙ্কুচিত হয় তা মাপার জন্য 'কুঞ্চনগ্রাফ' যন্ত্র তৈরী করেন। প্রাণিদেহের মত উদ্ভিদের ভেতরেও যে "রিফ্লেক্স আর্কের" অস্তিত্ব রয়েছে তা "রেজোনাণ্ট রেকর্ডার" (Resonant Recorder) যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে দেখান। লজ্জাবতী গাছে উত্তেজনা প্রয়োগ করে আরও দেখান, গাছের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে কি গতিতে তা দৌড়ে যায়। বনচাঁড়াল গাছের স্বতঃ-স্পন্দনের তরুলিপি "প্লাণ্ট ফাইটোগ্রাফ" (Plant Phytograph) যন্ত্র দিয়ে লিপিবদ্ধ করেন। এই স্পন্দনকে উনি তুলনা করলেন প্রাণিদেহের হৃদস্পন্দন-লিপির সঙ্গে। দেখালেন মিল রয়েছে যথেষ্ট। পিলোকার্পিন, আট্রোপিন, ব্রোমাইড প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে যে-সব প্রতিক্রিয়া দেখালেন তা সবই হলো প্রাণিহৃৎপিণ্ডের উপর প্রয়োগের অনুরূপ। এই যন্ত্রের সাথেই নিজের কাজের উপযোগী তৈরী একটি গ্যালভানোমিটারের সংযোগ ঘটিয়ে প্রমাণ করলেন সব গাছের ভেতরেই প্রাণীর মত বৈদ্যুতিক সাড়ার অস্তিত্ব রয়েছে। উদ্ভিদের ব্যাসের বৃদ্ধি, কাণ্ডের স্পন্দন তেরো লক্ষ গুণ বড় করে দেখার জন্য অপটিক্যাল স্ফিগ্‌মোগ্রাফ (Optical Sphygmograph) যন্ত্র তিনি তৈরী করেন। এ যন্ত্র দিয়ে দেখালেন গাছের স্পন্দনের হার প্রায় পাঁচ সেকেণ্ডে একবার। উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করে হারের হেরফেরও সুন্দরভাবে দেখান। আরও একটি মজার পরীক্ষা তিনি এ যন্ত্র দিয়ে সে যুগে দেখিয়েছিলেন। প্রাণী যে রকম আঘাতজনিত মৃত্যুর সময় যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, গাছও বিষ প্রয়োগে বা আঘাতজনিত মৃত্যুর সময় একই দৃশ্যের অবতারণা করে থাকে।

এর পরের গবেষণাগুলো আরও ব্যাপক। উদ্ভিদের বিদ্যুৎ-সক্রিয় স্তর খুঁজে বার করার জন্য "ইলেকট্রিক প্রোব" (Electric Probe) যন্ত্র। উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষের হার মাপার জন্য "ফটোসিনথেটিক বাব্‌লার" (Photosynthetic Bubbler) যন্ত্র। উদ্ভিদের বৃদ্ধি মাপার জন্য "কম্পাউণ্ড লিভার ক্রেস্কোগ্রাফ" (Compound Lever Crescograph) যন্ত্র। এই সব যন্ত্রপাতি

ছাড়াও উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজনে চল্লিশটিরও বেশী সূক্ষ্ম যন্ত্র জগদীশচন্দ্র উদ্ভাবন করেছিলেন।

:৯১৪ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র নানা ধরনের যন্ত্রপাতি নিয়ে বিশ্ব-পরিক্রমা করেন। এই পরিক্রমার সময় কম্পাউণ্ড লিভার যন্ত্রটি নিয়ে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। যন্ত্রটিকে সেকালের "সায়েনটিফিক আমেরিকা" পত্রিকা আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ বলে আখ্যা দিয়েছিল। তুলনাটি যথার্থ। কৃষি-কার্যে গাছের বৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। তখন গাছের বৃদ্ধি মাপার কোন সঠিক যন্ত্র ছিল না। কারণ, গাছের বৃদ্ধি খুবই জটিল ব্যাপার। তা ছাড়া, বৃদ্ধির হারও খুব কম। সাধারণত গাছের লম্বভাবে বৃদ্ধির পরিমাণ গড়-পড়তা সেকেণ্ডে এক ইঞ্চির এক লক্ষভাগের এক ভাগ। গাছের এই সূক্ষ্ম বৃদ্ধির তরুলিপি তিনি ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্র দিয়ে দেখান, গাছ এক সেকেণ্ডে যতটা বাড়ে তার দশ হাজার গুণ বড় করে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি মাপার জন্য আরও উন্নতমানের একটি যন্ত্র তৈরি করেন। নাম ম্যাগনেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ (Magnetic Crescograph)। তা দিয়ে উদ্ভিদের আসল বৃদ্ধির চেয়ে দশ লক্ষ গুণ বড় করে বৃদ্ধির হার লিপিবদ্ধ করেন। উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগে বৃদ্ধির প্রতি-ক্রিয়ার ওপরও নানাধরনের চাঞ্চল্যকর তথ্যের আবিষ্কার করেন।

আজকের দিনের যে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের স্বীকৃতি আদায়ের পথ মোটামুটিভাবে যথাযথ নিয়মে বাঁধা। কিন্তু সে যুগে জগদীশচন্দ্রের পক্ষে উদ্ভিদ-তাত্ত্বিক গবেষণার স্বীকৃতি আদায় সহজসাধ্য ছিল না। এদেশ থেকে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হতো দেশ হতে দেশান্তরে। গাছপালাও সাথে নিয়ে যেতে হতো। বছরের যে সময়ে পরীক্ষা দেখাবার প্রয়োজনীয় গাছপালা ইয়োরোপে পাওয়া সম্ভব হতো তখন সে সময়ে সেখানকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছুটি থাকতো। তাই প্রয়োজনীয় গাছপালা নিয়ে যেতেই হতো। নিয়ে গেলে কি হবে! প্রায়ই পথে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কিছু গাছ মরে যেত। বাকি গাছগুলোর অবস্থাও প্রায়ই খারাপ হয়ে যেত। লণ্ডনে যতবারই পরীক্ষা দেখাতে গেছেন ততবারই অনেক চেষ্টাচরিত্র করে লণ্ডন বোটানিকাল গার্ডেনের তদানীন্তন অধিকর্তা মিঃ কেল্প-কে (Mr. Kelp) রাজী করাতে হয়েছে বাগানের "হট হাউজে" গাছপালা রাখার জন্য। পরীক্ষা দেখাবার দিন খুব সকালে গাছ এনে প্রয়োগশালার 'গ্যাসহিটিং'-এর সামনে রেখে দিতে হতো। তা ছাড়া, সুদূর কলকাতা থেকে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নিয়ে যাওয়ার পথে প্রায়ই খারাপ হয়ে যেত। একবার তো যন্ত্রপাতি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। নিষ্ফল হলো সেবারের যাত্রা। পরীক্ষা দেখাবার তথাকথিত নিরপেক্ষ স্থানও নির্বাচন করেন প্রতিপক্ষ বিজ্ঞানীরা। সেই নিরপেক্ষ জায়গায় পরীক্ষা দেখাবার সুযোগ কতটা তা যাচাই করা হতো না। পরীক্ষা দেখাবার দিন সকাল থেকে তিনি লেগে পড়তেন যন্ত্রপাতি ও গাছপালা

নিয়ে। সঙ্গে থাকতেন দুই প্রিয় ছাত্র। বশীশ্বর সেন আর জ্যোতিপ্রকাশ সরকার। পরীক্ষা দেখাবার প্রস্তুতিতে অনেক সময় ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানকর্মীরা তাঁকে সাহায্য করতে চাইতেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র কখনোই তাঁদের সাহায্য নিতেন না। পরীক্ষা-মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রথমে যন্ত্রের বর্ণনা দিয়ে আলোকচিত্র সহযোগে বক্তৃতা দিতেন। পরে সবকিছু দেখেশুনে পরীক্ষা দেখানো শুরু করতেন। কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও যদি কোন কারণে পরীক্ষা যথাযথ না হত তবে বেশীর ভাগ দর্শক বিজ্ঞানীসমাজ সামান্য শিষ্টতাটুকু ভুলে সমানে চিৎকার শুরু করে দিতেন।

পরীক্ষা প্রদর্শনের ব্যাপারে পরবর্তীকালে প্রিয় ছাত্র বশীশ্বর সেন তাঁর নিজের একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। প্যারিসে জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা দেখাচ্ছেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু "বিষ প্রয়োগে উদ্ভিদের মৃত্যু"। যন্ত্রে বনচাঁড়াল গাছের স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হচ্ছে। জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বশীশ্বরবাবুকে বললেন পরীক্ষাধীন গাছটিতে 'পটাশিয়াম সায়ানাইড' প্রয়োগ করতে। তীব্র বিষ। এখুনি গাছটির স্পন্দন চিরতরে থেমে যাবে। স্তব্ধ দর্শক বিজ্ঞানীরা। কিন্তু একি! গাছ তো বিষক্রিয়ায় ঢলে পড়ছে না। পাতার চলন বন্ধ হচ্ছে না। মঞ্চে দাঁড়ানো নির্বাক জগদীশচন্দ্র প্রিয় ছাত্র বশীশ্বরকে বিষের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে বললেন। মাত্রা বাড়ানো হল। এবার ফল আরও বিস্ময়কর। পাতার চলন বেড়ে গেল। অন্যদিকে অবিশ্বাসের গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ক্রমশ তীব্রতা বাড়ছে। খানিকটা চুপ করে কি যেন ভাবলেন জগদীশচন্দ্র। চারদিকে তাকালেন। দেখলেন দূরে টেবিলের ওপর রয়েছে একটি ক্লোরোফর্মের শিশি। সোজা এগিয়ে গেলেন। নিজহাতে 'ক্লোরোফর্ম' প্রয়োগ করলেন গাছটির ওপর। ফল হলো। পাতার চলন এবার ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। বক্তৃতামঞ্চ থেকে নেমে ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখলেন অবশিষ্ট পটাশিয়াম সায়ানাইডটুকু। সন্ধ্যের পর সব কিছু পরিষ্কার হলো। বশীশ্বরবাবু এক পরিচিতা মহিলাকে দোকানে পাঠিয়েছিলেন পটাসিয়াম সায়ানাইড কিনে আনতে। মহিলাটি উপযুক্ত প্রমাণপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলেন। ওষুধের দোকানের মালিক মহিলার মুখের কথা বিশ্বাস করেন নি, নিছক একটি প্রাণরক্ষার তাগিদে কর্তব্য-পরায়ণ হয়ে বিষের পরিবর্তে কিছুটা চিনি গুঁড়ো করে মহিলা খরিদ্দারকে সন্তুষ্ট করেছিলেন।

এসব অগ্নিপরীক্ষা ছাড়াও আর একটি বিস্ময়কর পরীক্ষা জগদীশচন্দ্রকে দিতে হয়েছিল। তখন তিনি একের পর এক নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করে উদ্ভিদ-তত্ত্ব বিষয়ে নতুন তথ্য হাজির করেছেন ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানীদের কাছে। প্রচলিত ধ্যান-ধারণা বালির বাঁধের মত ভেঙে তছ্‌নছ্‌ হয়ে যাচ্ছে। চারদিক থেকে প্রস্তাব উঠছে জগদীশচন্দ্রকে "রয়াল সোসাইটির" সভ্য করা হোক।

এরকমই একটা সময়ে রয়াল সোসাইটির তদানীন্তন সভাপতি অদ্ভুত একটি ঘোষণা করলেন। বললেন প্রবীণ অনেক জীবনবিজ্ঞানী এখনো ঠিক মেনে নিতে পারেন নি জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রপাতি ও তাঁর পরীক্ষা। তাই এ অবস্থার মধ্যে কি করে সম্ভব তাঁকে সোসাইটির সভ্য করা। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুদিনের মধ্যে রয়াল সোসাইটির সভ্যরা এক জরুরি সভায় মিলিত হলেন। সভা একটি কমিটি গঠন করলেন। কমিটির প্রধান হলেন রয়াল সোসাইটির দুই প্রবীণ সদস্য। স্যার উইলিয়ম বেলিস ও স্যার উইলিয়াম ব্রায়াগ্। জগদীশচন্দ্রকে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখাতে হলো। একদিন নয়, বেশ কয়েকদিন ধরে। তারপর কমিটির পক্ষ থেকে তাঁদের 'রিপোর্ট' পেশ করা হলো। ৪ঠা মে, ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন টাইমস্ পত্রিকায় কমিটির রিপোর্ট বড় হরফে প্রকাশিত হলো। বলা হলো কমিটি জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপে সন্তুষ্ট। এটা নিশ্চিতভাবে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি। তা সত্ত্বেও সে যাত্রায় আরও কিছুকাল জগদীশচন্দ্রকে বিদেশে কাটাতে হয়েছিল নিজের বৈজ্ঞানিক ফলাফলকে স্থায়ী রূপ দিতে।

পরবর্তী কালে অবশ্য আমরা দেখতে পাই যখন জগদীশচন্দ্র বিদেশে বক্তৃতা দিতে গেছেন তার বহু আগেই পরীক্ষার প্রয়োজনীয় গাছপালা সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়েছেন বক্তৃতার উদ্যোক্তাগণ। প্রয়োজনে ভারতবর্ষ থেকে গাছের উপযোগী মাটিও লোক পাঠিয়ে সংগ্রহ করেছেন তাঁরা। এসব অবশ্য জগদীশ-চন্দ্রের জীবনের শেষদিকের কথা। খ্যাতির শিখরে ওঠার পর।

একজন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের কোন একটি বিশেষ শাখায় পুরোধা হয়েছেন এটা বিরল নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের বহুমুখী দিকে পুরোধা হয়েছেন দেখা যায় না। আচার্য জগদীশচন্দ্র তাই ছিলেন। শিল্পে অনগ্রসর ও পরাধীন একটি দেশে বিজ্ঞানচর্চার সংগ্রাম শুধু ভাবজগতে সীমাবদ্ধ থাকে না। দেশের পরাধীনতা ও চাপিয়ে দেওয়া অনুন্নত অবস্থা থেকে সৃষ্ট বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘসংগ্রামই ছিল জগদীশচন্দ্রের সমস্ত জীবন। উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ে মোট ৩৩ বছর তিনি গবেষণা করেন। মোট চৌদ্দখানি বই তিনি এ বিষয়ে লিখে গেছেন। উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর সমস্ত গবেষণা খুঁটিয়ে যাচাই করলে তাঁকে ডারউইন-এর উত্তরসূরী হিসেবে আখ্যা দিতে হয়।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদবিজ্ঞানে গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল বহুমুখী। তবে মূল সুর ছিল একটিই। তা হলো, উদ্ভিদের জীবন-রহস্য খুঁজে বার করা। সে রহস্যের অন্যতম হলো সবুজ উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া (Photo-synthesis)। সঙ্গত কারণেই উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ওপরও তিনি নানাধরনের আশ্চর্যজনক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তাঁর এই চমকপ্রদ গবেষণা-পদ্ধতি এবং তার পরীক্ষালব্ধ ফলাফল সে-যুগের বুদ্ধিজীবী মহলকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল।

বিজ্ঞানী অলিভার লজের অনুরোধে বিলেতের 'ইণ্ডিয়া হাউজে' পরীক্ষা দেখাচ্ছেন জগদীশচন্দ্র। পরীক্ষার বিষয়বস্তু উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষণ বিষয়ক। পরীক্ষামঞ্চে উঁচু টেবিলের ওপর বসান আছে একটি যন্ত্র। স্বয়ংক্রিয় অথচ সরল। নিজে হাতে তৈরী। যন্ত্রটি জলজ উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষণের হার লিপিবদ্ধ করতে পারে।

জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করে দেখাতে লাগলেন কি গতিতে গাছ সালোক-সংশ্লেষণ করে থাকে। পর্যায়ক্রমে পরীক্ষামঞ্চেই লিপিবদ্ধ হতে থাকলো বিভিন্ন উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগে সংশ্লেষণের হারের তারতম্য।

আর একটা মজার পরীক্ষাও তিনি পরীক্ষামঞ্চে দেখালেন। পরীক্ষাধীন গাছকে সবসময় আলোর সামনে না রেখে এক সেকেণ্ড অন্তর অন্তর আলোক পাতের ফলে সংশ্লেষণের হার শতকরা ২১ ভাগ বেড়ে যায়। কিন্তু আলোর অনুপস্থিতির সময় দ্বিগুণ অথবা দীর্ঘতর করলে সংশ্লেষণের হার কমে যায়।

দর্শকমণ্ডলীর প্রথম সারিতে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাগডোনাল্ড। পাশে বসেছেন জর্জ বার্নার্ড শ, বিজ্ঞানী অলিভার লজ ও ভারতের প্রাক্তন গভর্নর জেনারেল হার্ডিঞ্জ। এক সময় বক্তৃতা শেষ হলো। মঞ্চ থেকে নেমে এলেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র। কিছুটা কাছাকাছি আসতেই বার্নার্ড শ প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে তাঁর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলে উঠলেন—

"ডঃ বোস শীঘ্রই হয়তো এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করবেন, যা দিয়ে রাজনীতিবিদ্ ও অন্যান্যদের কার্যক্ষমতা যন্ত্রলিপির মাধ্যমে এঁকে দেখাবেন এবং বিভিন্ন ধরনের কাজে ওঁদের দক্ষতাও নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করতে সক্ষম হবেন।"

সালোক-সংশ্লেষণের হার মাপার জন্য তিনি যে যন্ত্রটি দিয়ে পরীক্ষা দেখাচ্ছিলেন তার নাম "Photosynthetic Bubbler Instrument।" এই যন্ত্র কাজে লাগিয়ে মাঝে মধ্যে কিছু হেরফের করে "আলোর প্রাখর্য ও স্থিতিকালের সঙ্গে সংশ্লেষণের সম্বন্ধ, সালোক-সংশ্লেষণের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও ক্লোরোফিলের পরিমাণগত সম্বন্ধ, উষ্ণতার প্রভাব, উত্তেজনা, অবসাদক পদার্থ ও বিষ প্রয়োগের ফলাফল, কার্বন ডাই-অক্সাইডের অনুপস্থিতিতে সালোক-সংশ্লেষণ, সালোক-সংশ্লেষণে সৌরশক্তির সংহত অংশের পরিমাণ, সংশ্লেষণের উপর আলোর বর্ণের প্রভাব ইত্যাদি আরও বহুরকমের চমকপ্রদ পরীক্ষা তিনি সে সময় করেছিলেন।

বলা বাহুল্য, সেদিন 'ইণ্ডিয়া হাউজে' তিনি যে সালোক-সংশ্লেষণের পরীক্ষা দেখিয়েছিলেন, তা ছিল এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডের বিন্দুমাত্র। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, সালোক-সংশ্লেষণের ওপর বর্ণের প্রভাব খতিয়ে দেখার জন্য তিনি সে যুগে আর একটি আশ্চর্যজনক যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। নাম "রেডিওমিটার"। এই যন্ত্র দিয়ে তিনি "আপতিত বর্ণালীর বিকিরিত শক্তি"

কতটা তা সঠিকভাবে দেখিয়েছিলেন। যন্ত্রটির প্রসারণ ক্ষমতা ছিল পঞ্চাশ লক্ষ গুণ।

প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে যে-কথা বলবো তা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রকে নিয়ে নয়, ছাত্র জগদীশচন্দ্রকে ঘিরে, এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার নিজস্ব আত্ম-আলাপনের দলিলকে কেন্দ্র করে। ব্যাপারটি প্রথম জানা যায় আচার্য জগদীশচন্দ্রের মহাপ্রয়াণের পর। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "পালিত অধ্যাপক" দেবেন্দ্রমোহন বসু তখন সবে বসুবিজ্ঞান মন্দিরের কর্ণধার হিসেবে যোগ দিয়েছেন। সাথে বিজ্ঞান কলেজ থেকে এসেছেন তরুণ ছাত্র আজকের অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়। তখনও আচার্যপত্নী শ্রদ্ধেয়া অবলাদেবী বেঁচে ছিলেন। ছাত্র শ্যামাদাসকে তিনি আগে থেকেই চিনতেন। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় শ্যামাদাসবাবুকে তিনি ডেকে পাঠালেন। হাতে তুলে দিলেন একটি পকেট ডায়রী। ডায়রীটির রং কিছুটা ধূসর। বললেন, পড়ে দেখো।

ডায়রীটি ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের। ৫ই মার্চ রোববার ছুটির দিনে বসে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র জগদীশচন্দ্র লিখছেন—

"বিষুব অঞ্চলে যে অফুরন্ত সৌরশক্তি নষ্ট হয় তা কোন উপায়ে কাজে লাগানো যায় কিনা; তাহা লইয়া আমি অনেকদিন ধরিয়াই ভাবিতেছি। অবশ্য গাছপালা সৌরশক্তিকে কাজে লাগায়। কিন্তু এই প্রবহমান সৌর-শক্তিকে সরাসরি কাজে লাগাবার কি অন্য উপায় নাই? তাপশক্তি প্রয়োগে উদ্ভূত ফলাফলকে কাজে লাগাইয়া সৌর এঞ্জিন (যাহা একটি তাপ এঞ্জিন ছাড়া কিছুই নহে) তৈরী করিবার চেষ্টা হইয়াছে। যে-কোন সংযোগস্থলে তাপ প্রয়োগ করিয়া আমরা তাপ বৈদ্যুতিক প্রবাহও পাইতে পারি। কিন্তু এ রকম তাপ-বৈদ্যুতিক ব্যাটারী প্রকৃতপক্ষে কোন কাজেই লাগে না। প্রচুর শক্তিও পরিবহনের সময় নষ্ট হয়। এখন আমার চিন্তা সৌরশক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎ প্রবাহে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে কিনা!

ক্লোরোফিলের সাহায্যে সূর্যকিরণ কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বিশ্লিষ্ট করিয়া কার্বন জমা করে এবং এর ফলে Kinetic Energy পরিণত হয় Potential Energy-তে। এই রাসায়নিক ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়ায় লাল-হলুদ রং-এর সূর্যরশ্মি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

ধরা যাউক, ভাঙার জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড পাওয়া গেল না। তাহা হইলে শোষিত সৌরশক্তি কি রূপ লইয়া নির্গত হইবে? সম্ভবত তাপ-শক্তিরূপে। কিন্তু শোষিত সূর্যশক্তি হইতে আমরা কি বৈদ্যুতিক শক্তি পাইতে পারি?"

এ বিষয়ে ডায়রীটিতে আর কিছু লেখা নাই। তবে রয়েছে কিছু খসড়া। খসড়াটি খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায়, এই সমস্যাটি নিয়ে তিনি সে সময় বেশ কিছুকাল মনোযোগ দিয়েছিলেন।

সবুজ উদ্ভিদ কি করে প্রবহমান (Kinetic) সৌরশক্তিকে স্থৈতিক (Potential) শক্তিতে রূপান্তরিত করে—অল্প কথায় আজকের ধারণা হল, স্বয়ংপ্রভ সূর্যের অভ্যন্তরে নানাধরনের জটিল পারমাণবিক প্রক্রিয়ার ফলে যে প্রচণ্ড ও প্রচুর পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়, তা সৌরজগতের প্রায় সব শক্তির চাহিদাই পূরণ করে। আমরা হাজার হাজার বছর ধরে যে শক্তি ব্যবহার করে আসছি, তা মূলত সূর্য থেকেই পাওয়া। তবে, সৌরশক্তির সামান্যই ভূ-পৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়। বাকী অংশটুকু বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয় কিম্বা মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরূপী শক্তিই সালোক-সংশ্লেষে অধিক প্রয়োজন। কিন্তু উদ্ভিদের সবুজ অংশে পতিত আলোক শক্তির সবটাই সালোক-সংশ্লেষণের কাজে লাগে না। দৃশ্য সৌর বর্ণালীর বেগুনী-নীল (violet-blue) এবং লাল অংশই প্রধানত সবুজ উদ্ভিদ সালোক-সংশ্লেষের জন্য গ্রহণ করে। ভূপৃষ্ঠ যে পরিমাণ সৌরশক্তি পায় তার প্রায় ১% উদ্ভিদের সবুজ কণাগুলো সালোক-সংশ্লেষের কাজে লাগায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্র বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা সেকালে দেখিয়েছিলেন, উদ্ভিদের পাতায় পতিত সৌরশক্তির বেশ কিছু অংশ পাতা ভেদ করে চলে যায় এবং শোষিত সৌর তেজের মধ্যেও বেশ খানিকটা নষ্ট হয়। তবে তিনি জলজ উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখান যে, শোষিত সৌর তেজের অপচয় জলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে রোধ করা যেতে পারে।

সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা আলোকরশ্মিগুলোকে কল্পনা করা যেতে পারে তীব্র বেগে আসা কণারূপে। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ফোটন' (Photon)। একটি ফোটনে যে পরিমাণ শক্তি থাকে তাকে বলা হয় এক 'কোয়াণ্টাম' (Quantum)। ক্ষুদ্র তরঙ্গের আলোকরশ্মির প্রতি ফোটনে শক্তির পরিমাণ দীর্ঘতর তরঙ্গের আলোকরশ্মির প্রতি ফোটনের শক্তির পরিমাণের চেয়ে বেশী।

আলোকের এই প্রবহমান শক্তি (যাকে জগদীশচন্দ্র Kinetic Energy বলেছিলেন) কণারূপে ক্লোরোফিল অণুকে আঘাত করলে অণুর ইলেকট্রন ফোটনের সেই অতিরিক্ত শক্তি গ্রহণ করে পরবর্তী শক্তিস্তরে যায়। সেই উজ্জীবিত ইলেকট্রনের অতিরিক্ত শক্তি নানাভাবে ব্যয়িত হয়। তার মধ্যে অন্যতম হল ADP-র সঙ্গে অজৈব phosphate যোগ করে ATP ও একটি বিজারক $NADPH_2$ তৈরী করে—যে দুটো পরবর্তী পর্যায়ে CO_2-কে বিজারিত করে কার্বোহাইড্রেটে পরিণত করতে সাহায্য করে। এই ভাবে আলোক-শক্তি কার্বোহাইড্রেটের রাসায়নিক বন্ধনীতে স্থৈতিক শক্তিরূপে স্থিতিলাভ করে।

কিন্তু সে সময় ধারণা ছিল সূর্যশক্তি সংগ্রহ করে গাছের ক্লোরোফিল CO_2-কে ভেঙে 'C' এবং 'O_2' তৈরী করে, পরে 'C'-এর সঙ্গে 'H_2O' মিলিত হয়ে কার্বোহাইড্রেট তৈরী হয়।

জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সম্পর্কে তো আজ সবারই জানা। যে কোন কারণেই হোক, গবেষক জীবনে এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার অবকাশ তিনি পান নি। স্বপ্ন সফল হয় নি। আচার্যের সেই স্বপ্ন আংশিকভাবে সফল হল তাঁর মহা-প্রয়াণের পঁয়ত্রিশ বছর পরে। স্বপ্ন বাস্তবায়িত করলেন নোবেল বিজ্ঞানী মেলভিন কেলভিন। বিজ্ঞানী কেলভিন দেখালেন সূর্যরশ্মির প্রভাবে উদ্ভিদের ক্লোরোফিল একটি 'Semi-conductor'-এ ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে। তিনি হিসেব করে দেখালেন যে, দশ বর্গমিটার জায়গাসহ একটি 'ক্লোরোফিল ফটো-এলিমেণ্ট' এক কিলোওয়াট শক্তি তৈরী করতে পারে।

মনে প্রশ্ন জাগছে, আজ যদি জর্জ বার্নার্ড শ জীবিত থাকতেন আর ছাত্র জগদীশচন্দ্রের নিজে হাতে লেখা ডায়রীর কথা ক'টি পড়তেন—আজ তিনি কি বলতেন?

বিজ্ঞান-সাধক সাহিত্যিক

অজয় চক্রবর্তী

'যদিও বিজ্ঞান-বাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরানী করিয়াছ, তবু সাহিত্য-সরস্বতী সে পদ দাবি করিতে পারিত। কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃতা হইয়া আছে।' আচার্য জগদীশচন্দ্রের লেখা গ্রন্থ 'অব্যক্ত' পড়ে তাঁর কবি-বন্ধু রবীন্দ্রনাথ এ কথা লিখেছিলেন। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-সাধনায় মগ্ন ছিলেন, তাই সাহিত্যের আঙিনায় বিচরণ করার অবকাশ বড়ো একটা পান নি। কিন্তু বাংলাভাষায় যে-কয়েকখানি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তিনি লিখে গেছেন সেগুলো বাংলার বিজ্ঞান-সাহিত্যে মূল্যবান সামগ্রী হয়ে আছে। তাঁর লেখা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলো নিছক বিজ্ঞান নয়, রচনাভঙ্গীর মাধুর্যে ও বৈশিষ্ট্যে তা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তাঁর লেখা বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলোতে বিজ্ঞানের গাম্ভীর্য অনুপস্থিত, সাহিত্য-সুষমায় সেগুলো পরিপূর্ণভাবে সম্পৃক্ত।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্যের ইতিহাস তেমন প্রাচীন নয়। তবু এরই মধ্যে কিছু শক্তিমান লেখক বাংলার বিজ্ঞান-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন অক্ষয়কুমার দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং জগদানন্দ রায়। কিন্তু আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাহিত্য ভিন্নধর্মী। এর কারণ হলো, জগদীশচন্দ্র প্রধানত লিখেছেন তাঁর নিজস্ব আবিষ্কারের কথা, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির কথা, নিজস্ব দর্শনের কথা। 'অব্যক্ত' গ্রন্থটি জগদীশচন্দ্রের সমগ্র বাংলা-রচনার সংকলন। গ্রন্থটির নামকরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রহস্যময় বিশ্বজগতের কতটুকুই বা আমাদের জানা! জগতে বহু কিছুই আমাদের কাছে অপ্রকাশিত, অব্যক্ত। অনেক আলোই আমরা দেখতে পাই না। অনেক শব্দই আমরা শুনতে পাই না। আমাদের চারপাশে যে-সব গাছপালা রয়েছে তাদের অনুভূতি, তাদের জীবনধারণ-রীতি আমাদের কাছে অব্যক্ত। জড় পদার্থের স্বরূপও আমাদের অজানা। এসব অজানা ও অব্যক্ত বিষয়কে ব্যক্ত করার সাধনাই ছিল জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার লক্ষ্য। 'অব্যক্ত' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নানা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও অভিভাষণে উদ্ভিদ ও জড়-জগতের এসব অব্যক্ত বিষয়গুলোর উপরই আলোকপাত করেছেন।

গ্রন্থটির ভূমিকায় জগদীশচন্দ্র লিখেছেন, 'চতুর্দিক ব্যাপিয়া যে-অব্যক্ত জীবন প্রচারিত তাহার দু'একটি কাহিনী বর্ণিত হইল।' জীব ও জড় জগতের অকথিত বাণীকে যন্ত্রের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র। যে-সব ভাষাহীন উদ্ভিদ আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, অথচ যাদের অনুভূতির কথা আমাদের

কাছে অব্যক্ত, তাদের জীবন-স্পন্দন যন্ত্রের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, জীব ও জড়ের মধ্যে যে-জীবনধর্মের লীলা চলেছে কোথাও তার ছেদ নেই। দু'য়ের মধ্যে কোন স্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করা যায় না। কোথায় জড় প্রকৃতির শেষ, আর কোথায় প্রাণধর্মের শুরু তা বলা যায় না। 'অব্যক্ত' গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে একটি ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

তাঁর বিজ্ঞান-সাধনাও ঐ একই সুরে বাঁধা। আচার্য জগদীশচন্দ্র বিশ্বের সমস্ত অণু-পরমাণুতে একই মহাশক্তির প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'এক মহাশক্তি জগৎ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রতি কণা ইহা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট।' এই ঐক্যের সাধনায় তিনি যেন প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদেরই উত্তর-সাধক।

অব্যক্ত গ্রন্থে প্রকাশিত রচনাগুলোকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(ক) সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, (খ) দার্শনিক চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, (গ) বিজ্ঞান-বিষয়ক অভিভাষণ এবং (ঘ) বিজ্ঞান-ভিত্তিক কল্প-কাহিনী।

'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ' প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্র পদার্থ, শক্তি ও আকাশের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শক্তি কীভাবে সঞ্চালিত হয় সে-প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জড় পদার্থের কম্পন এবং তা থেকে উদ্ভূত শব্দের কথা উল্লেখ করেছেন, আলোচনা করেছেন তাপ-তরঙ্গ, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ও আলোক-তরঙ্গের কথা। কম্পন সংখ্যা বাড়তে থাকলে শব্দতরঙ্গ কীভাবে শ্রুতির সীমা পেরিয়ে যায়, আলো কেমন করে দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে যায় এ প্রবন্ধে তা অতি সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্র একদিকে আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির সীমাবদ্ধতা এবং অন্যদিকে বিশ্বের অনন্ত বিস্তারের কথা উপস্থাপন করে পাঠকের মনে এক বিস্ময়বোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। বিশ্বের বিরাটত্বের তুলনায় মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তি কত অকিঞ্চিৎকর! 'আমরা বধির ও অন্ধ! কি দেখিতে পাই, কি শুনিতে পাই? কিছুই নয়। দুই একখানা ভগ্ন দিক্‌দর্শনশলাকা লইয়া আমরা মহাসমুদ্রে যাত্রা করিয়াছি।' পরিবর্তনশীল এই জগতের সমস্ত ঘটনাবলীর মূলেই আছে শক্তির রূপান্তর। শক্তির রূপান্তরই জগৎকে গতিময় ও জীবন্ত রেখেছে। শক্তি ও পদার্থের রূপান্তর আছে; কিন্তু বিনাশ নেই। কাজেই, জড়-জগতের যে-পরিবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ করি তা বাহ্যিক। এর পর জগদীশচন্দ্র এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জড় জগতের পরিবর্তন যেমন বাহ্যিক, জীবজগতের পরিবর্তনও তেমনি বাহ্যিক। দেহীর মৃত্যু আছে, তবে জীবনপ্রবাহ চিরন্তন। এখানে জগদীশচন্দ্র জীবন সম্পর্কে ভারতীয় মতবাদেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি বলেছেন, 'প্রতি জীবনে দুইটি অংশ আছে। একটি অজর, অমর; তাহাকে বেষ্টন করিয়া নশ্বর দেহ। এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া

থাকে। অমর জীববিন্দু প্রতি পুনর্জন্মে নূতন গৃহ বাঁধিয়া লয়। সেই আদিম জীবনের অংশ, বংশপরম্পরা ধরিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আজ যে পুষ্প-কলিকাটি অকাতরে বৃন্তচ্যুত করিতেছি, ইহার অণুতে কোটি বৎসর পূর্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে।' আদিম জীব বহু যুগ ধরে বিবর্তিত হয়ে মানুষে পরিণত হয়েছে। সত্যিই বিস্ময়কর এই মানুষ! অতি ক্ষুদ্র হয়েও অসীম বিশ্বকে অনুধাবন করতে প্রয়াসী। জগদীশচন্দ্র এ বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, জীবনের এই ক্রম-উদ্বর্তন আজও শেষ হয় নি। 'যে-শক্তি আদিম জীববিন্দুকে মনুষ্যে উন্নীত করিয়াছে, যাহার উচ্ছ্বাসে নিরাকার মহাশূন্য হইতে এই বহুরূপী জগৎ ও তদ্‌বৎ বিস্ময়কর জীবন উৎপন্ন হইয়াছে, আজিও সেই মহাশক্তি সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। উর্দ্ধাভিমুখেই সৃষ্টির গতি। তার সম্মুখে অন্তহীন কাল এবং অনন্ত উন্নতি প্রসারিত।'

জগদীশচন্দ্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হলো 'অদৃশ্য আলোক'। লেখক এ প্রবন্ধে দৃশ্য এবং অদৃশ্য আলোর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। অদৃশ্য আলো এবং দৃশ্য আলো মূলত অভিন্ন—আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতার জন্যই এদের ভিন্ন বলে মনে হয়। এর পর লেখক বিভিন্ন বস্তুর ঔজ্জ্বল্য বা আলো সংহত করার ক্ষমতা সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। চীনাবাসনের অদৃশ্য আলো সংহত করার ক্ষমতা হীরকের চেয়ে অনেকগুণ বেশী। এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যে-সরস মন্তব্যটি করেছিলেন তা সত্যিই উপভোগ্য।

'প্রথমবার বিলাতে যাইবার সময় অভ্যস্ত কুসংস্কার হেতু চীনাবাসন স্পর্শ করিতে ঘৃণা হইত। বিলাতে সম্ভ্রান্ত ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া দেখিলাম যে, দেওয়ালে বহুবিধ চীনা-বাসন সাজানো রহিয়াছে। ইহার এমন কি মূল্য যে, এত যত্ন? প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, এখন বুঝিয়াছি ইংরাজ ব্যবসাদার। অদৃশ্য আলো দৃশ্য হইলে চীনা-বাসন অমূল্য হইয়া যাইবে। তখন তাহার তুলনায় হীরক কোথায় লাগে! সেদিন শৌখিন রমণীগণ হীরকমালা প্রত্যাখ্যান করিয়া পেয়ালা-পিরিচের মালা সগর্বে পরিধান করিবেন এবং অচীনধারিণী নারীদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন।"

এ প্রবন্ধে বক ও কচ্ছপের দৃষ্টান্ত সহযোগে তিনি আলোকে সমবর্তিত বা একমুখী করার পদ্ধতির যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সরস ও সুবোধ্য। চুলের মধ্য দিয়ে আলো পাঠালে তা একমুখী হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে তিনি যে-মন্তব্য করছেন তার সূক্ষ্ম ব্যঙ্গরস বিশেষভাবে উপভোগ্য।

"বিলাতের নরসুন্দরদের দোকান হইতে বহু জাতির কেশগুচ্ছ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে ফরাসী মহিলার নিবিড় কৃষ্ণকুন্তল বিশেষ কার্যকরী, এ বিষয়ে জার্মান মহিলার স্বর্ণাভ কুন্তল অনেকাংশে হীন। প্যারিসে

যখন এই পরীক্ষা দেখাই তখন সমবেত ফরাসী পণ্ডিতমণ্ডলী এই নূতন তত্ত্ব দেখিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন। ইহাতে বৈরী জাতির উপর তাহাদের প্রাধান্য প্রমাণিত হইয়াছে, ইহার কোন সন্দেহই রহিল না। বলা বাহুল্য, বার্লিনে এই পরীক্ষা প্রদর্শনে বিরত হইয়াছিলাম।'

'স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্র বাহ্যিক উত্তেজনায় উদ্ভিদের সাড়া (response) সম্পর্কে নিজস্ব গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তিনি এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, প্রাণিদেহে যেমন স্নায়ুতন্ত্র আছে, উদ্ভিদ্‌দেহেও তেমনি স্নায়ুতন্ত্র আছে। স্নায়ুর মধ্য দিয়ে উত্তেজনা কীভাবে প্রবাহিত হয় এ প্রবন্ধে তিনি তা এমন সহজবোধ্য ভাষায় এবং সরল দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন যে, বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ পাঠকও তা সহজে অনুধাবন করতে পারে। এর পর তিনি বাহিরের শক্তি ও ভিতরের শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি নানা যুক্তির সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বাহিরের শক্তি ও ভিতরের শক্তি প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন—বাহিরের শক্তি থেকেই জীব তার ভিতরের শক্তি আহরণ করে।

'ভিতর ও বাহিরের শক্তি-সংগ্রামেই জীবন বিবিধ রূপে পরিস্ফুটিত হইতেছে। উভয়ের মূলে একই মহাশক্তি, যার দ্বারা অজীব ও সজীব, অণু ও ব্রহ্মাণ্ড অনুপ্রাণিত, সেই শক্তির উচ্ছ্বাসেই জীবন অভিব্যক্ত। সেই শক্তিতেই মানব দানবত্ব পরিহার করিয়া দেবত্বে উন্নীত হইবে।'

'নির্বাক জীবন' শীর্ষক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি আচার্য জগদীশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। এ প্রবন্ধে উদ্ভিদ-জগতের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ও মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। জগদীশচন্দ্র তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের চাঞ্চল্য ও মৃত্যু-যন্ত্রণার স্বরূপ লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, উদ্ভিদ্ ভাষাহীন হলেও মৃতবৎ অনুভূতিবিহীন নয়। উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগতের মধ্যে যে কৃত্রিম ব্যবধান রচিত হয়েছিল তা দূরীভূত হলো। উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগৎ যে একই জীবনধর্মের লীলাক্ষেত্র তাও নিশ্চিত-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো।

জগদীশচন্দ্রের রচনাগুলোর মধ্যে 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা, এ প্রবন্ধটি দার্শনিক চিন্তাসমৃদ্ধ উচ্চাঙ্গের রচনা। রূপকধর্মী এ প্রবন্ধটির সূচনা হয়েছে একটি মৌলিক দার্শনিক প্রশ্ন দিয়ে। প্রবহমান গঙ্গার তীরে বসে কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে বালক জগদীশচন্দ্র কত কথাই না শুনতে পেতেন! নদীকে তাঁর গতি-পরিবর্তনশীল জীব বলে মনে হতো। এ অন্তহীন স্রোত কোথা থেকে আসছে? বালক জগদীশচন্দ্র নদীকে প্রশ্ন করতো, 'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' বালকের এ প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে জীবন-প্রবাহের উৎস সম্পর্কে বিস্ময়াবিষ্ট মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসা।

পৌরাণিক বিশ্বাসের মূল থেকে জবাব আসতো, 'মহাদেবের জটা হইতে।' পরিণত বয়সে জগদীশচন্দ্র হিমালয়ের পথে পাড়ি দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যে পৌরাণিক বিশ্বাসের ভিত্তি খুঁজতে। শেষ পর্যন্ত নন্দাদেবী শৃঙ্গের উপরের এক বিরাট ধূম্রময় জ্যোতির মধ্যে মহাদেবের জটার উপমা পেলেন। তুষারমণ্ডিত ও কুয়াশাচ্ছন্ন জ্যোতিঃপুঞ্জের দ্বারা আবৃত অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ জগদীশচন্দ্রের যেন এক আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হলো। যে-জল সাগর থেকে বাষ্পাকারে উত্থিত হয়ে গিরিশৃঙ্গে এসে জমা হয় সে জলই আবার সাগরের দিকে যাত্রা করে। জলের এই চক্রবৎ পরিক্রমা এক বৈজ্ঞানিক সত্য। এই সত্যের মধ্যে জীবনচক্রের উপমা পেলেন আচার্য জগদীশ। উপলব্ধি করলেন, যিনি শিব, তিনিই আবার রুদ্র; যিনি রক্ষক তিনিই আবার সংহারক। যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই আবার প্রলয় ঘটিয়ে বিশ্বকে নতুন সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত করে তোলেন।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কোনরূপ বিভেদ জগদীশচন্দ্র স্বীকার করতেন না। তাঁর মতে, বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা একই সত্যের অনুসন্ধানে ব্রতী—যে-সত্যে উপনীত হলে বিশ্বের সমস্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনার নিয়ন্ত্রণকারী বিশ্বসূত্রটি অনুধাবন করা যাবে। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে (১৯১১ খ্রীস্টাব্দ) সভাপতি হয়ে তিনি 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' শীর্ষক যে-অভিভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন:

"এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার অসংখ্য দ্বার। প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিৎ, জীবতত্ত্ববিৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন; মনে করিয়াছেন সেই মহলেই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদকে, সচেতনকে তাঁহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিক দেখা একথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে একই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া উপস্থিত নহে। সেইজন্যই প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতি-তত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।"

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যে কোন বিভেদ নাই, আচার্য জগদীশচন্দ্র নিজের জীবনেই তার প্রমাণ রেখেছেন। তাঁর বিজ্ঞান সাধনায় জীবনবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞানের সীমারেখা অপসৃত হয়েছিল।

সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের মধ্যেও তিনি মিলন-সেতুর সন্ধান পেয়েছিলেন। কবি এবং বিজ্ঞানীর যোগ সম্পর্কে উক্ত অভিভাষণে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন:

'কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া অরূপকে দেখিতে পান। তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায়, সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। ...বৈজ্ঞানিককে যে-পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়।'

সাধারণভাবে যে-জগৎ মানুষের অগোচরে থাকে বিজ্ঞান-বুদ্ধিতে উদ্ভাবিত যন্ত্রাদির সাহায্যে মানুষ সে-জগৎকেও প্রত্যক্ষ করতে পারে। অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষ তার দৈহিক ও মানসিক সীমাবদ্ধতাকে বহুলাংশে অতিক্রম করতে পারে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জগদীশচন্দ্র বলেছেন :

"দৃশ্য আলোকের বাহিরে যে অদৃশ্য আলোক আছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলে আমাদের দৃষ্টি যেমন অনন্তের মধ্যে প্রসারিত হয়, তেমনি চেতন রাজ্যের বাহিরে যে-বাক্যহীন বেদনা আছে তাহাকে বোধগম্য করিলে আমাদের অনুভূতি আপনার কেন্দ্রকে বিস্তৃত করিয়া দেখিতে পায়।"

মানুষের অনন্ত সম্ভাবনার প্রতি আস্থাবান হলেও জগদীশচন্দ্র জ্ঞানের অপূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বহু যুগের নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় তিলে তিলে গড়ে উঠেছে মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডার। কিন্তু বিশ্ব-জগৎ সম্পর্কে অনেক কিছুই এখনো অজানা রয়ে গেছে। তবে তিনি এ বিশ্বাসে অটল ছিলেন যে, মানুষের সাধনা ও অধ্যবসায়ের বলে মানুষ একদিন অজ্ঞানতার অন্ধকারকে অপসারিত করে পরম জ্ঞানের আলোকে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে। 'অদৃশ্য আলোক' শীর্ষক প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্রের এ আশাবাদী মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

"আধার লইয়া আরম্ভ, আধারেই শেষ, মাঝে দুই একটি ক্ষীণ আলোক-রেখা দেখা যাইতেছে। মানুষের অধ্যবসায় বলে ঘন কুয়াশা অপসারিত হইবে এবং একদিন বিশ্বজগৎ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিবে।"

'পলাতক তুফান' শীর্ষক কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী সম্পূর্ণ নতুন ধরনের লেখা। এর আগে বাংলাভাষায় এ ধরনের লেখা আর কেউ লিখেছেন বলে জানি না। বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে জগদীশচন্দ্র এখানে গল্পের রস পরিবেশন করেছেন। সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান অনেক আপাত অসম্ভব ঘটনার স্রষ্টা। কাজেই

বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে লেখা গল্পের সুবিধে হলো, বৈজ্ঞানিক সত্যটা সামনে রেখে অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য ঘটনাকেও বাস্তবানুগ করে তোলা যায়। তেল চঞ্চল জলের চাঞ্চল্য হ্রাস করে। এটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। 'পলাতক তুফান' শীর্ষক গল্পে জগদীশচন্দ্র এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে কাজে লাগিয়ে নিপুণভাবে গল্পের মালা গেঁথে গেছেন।

জগদীশচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-সাধনায় এক অদৃশ্য শক্তির প্রেরণার কথা স্বীকার করেছেন। 'অব্যক্ত' গ্রন্থের 'হাজির' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,

'এখন বুঝিতে পারিতেছি, বাহির ছাড়া ভিতর হইতেও হুকুম আসিয়া থাকে।...কোনদিন লিখিতে শিখি নাই। ভিতর হইতে কে যেন আমাকে লিখাইতে আরম্ভ করিল।'

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার কথা মনে পড়ে। 'চিত্রা' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'অন্তর্যামী' কবিতায় তিনি তাঁর কাব্যপ্রয়াসের নেপথ্যে অধিষ্ঠাত্রী এক মহাশক্তির লীলার কথা ব্যক্ত করেন :

'অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিলায়ে আপন সুর।'

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র লিখেছেন, 'আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই— এ একটা ব্যাপার, যাহার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে।' এই অদৃশ্য শক্তিকেই 'জীবনদেবতা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রও তাঁর জীবনের সকল কর্মপ্রেরণার অন্তরালে এমনি এক শক্তির উপস্থিতি অনুভব করতেন—যাঁর প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'তোমার নাম হুকুম, আমার নাম তালিম।'

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর ঐসব পত্রপত্রিকার সম্পাদকদের কাছ থেকে তাঁর কাছে লেখার জন্য অসংখ্য তাগিদ ও অনুরোধ আসতো। কিন্তু বিজ্ঞান-সাধনায় একনিষ্ঠ জগদীশচন্দ্র সেসব অনুরোধ রক্ষা করতে পারতেন না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দাসী' পত্রিকায় ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্রের দু'টো নিবন্ধ প্রকাশিত হয়— 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' তাদের অন্যতম। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রদীপ' পত্রে লেখার জন্য জগদীশচন্দ্র বারবার অনুরুদ্ধ হন। উত্তরে জগদীশচন্দ্র লেখেন,

"আমি তোমার কাগজে লিখিতে পারিলে বাস্তবিকই খুসী হইতাম। কিন্তু নানা কার্যে জড়িত হইয়া আমি এখন অনেক সুখে বঞ্চিত হইয়াছি।

কিন্তু যে-কার্যে ব্রতী হইয়াছি, তার কূল-কিনারা দেখিতে পাই না—অনেক সময়েই কেবল অন্ধকারে ঘুরিতে হয়। বহু ব্যর্থ প্রযত্নের পর কদাচ অভীষ্টের সাক্ষাৎ পাই।"

বিজ্ঞানের তপস্যায় মগ্ন ছিলেন বলেই সাহিত্য-চর্চায় তিনি সময় দিতে পারতেন না। তাই তাঁর লেখা জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। তবে, সংখ্যায় অল্প হলেও জগদীশচন্দ্রের রচনাগুলো সাহিত্যিক উৎকর্ষতায় বিশিষ্টতার দাবি রাখে। কাজেই, সাহিত্য-সরস্বতীও যে জগদীশ-চন্দ্রের সুয়োরানীর পদটি দাবি করতে পারতো—রবীন্দ্রনাথের এ কথায় বাস্তবিকই কোন অতিশয়োক্তি ছিল না।

জগদীশচন্দ্র ও ভারতীয় বিজ্ঞান

অধ্যাপক দেবব্রত বসু

চিঠি লিখছেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র। তারিখ চৌঠা আগস্ট, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ। লিখছেন শিল্পপতি মূলরাজ খাটাউকে।

"আপনার হয়তো মনে আছে আমি বলিয়াছিলাম কৃষিকাজে উন্নতি করিতে গেলে গাছের জীবন বৃত্তান্ত ও তার বৃদ্ধির নিয়ম ভালভাবে জানা আবশ্যক। এর জন্য আমেরিকাতে কোটি কোটি টাকা খরচ হইতেছে। আমাদের ভারতবর্ষেও চেষ্টা চলিতেছে।

আমাদের বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্দেশ্য আপনি জানেন। ইহার মূল উদ্দেশ্য হইল উদ্ভিদজীবনকে আরও ভালভাবে জানা। সেই সঙ্গে প্রাণী ও উদ্ভিদের মূলগত সাদৃশ্যকে খুঁজিয়া বাহির করা। এইসকল সমস্যা সমাধানের পথেই কৃষিকাজের উন্নতি হইবে। সেই সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রয়োজনীয় ঔষধের সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আপনাকে ধন্যবাদ। উদ্ভিদবিজ্ঞানের গবেষণার প্রয়োজনে আপনি যে দান করিয়াছেন তাহাতে কৃষিকাজের যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই।

যাহাই হোক আপনি হয়তো জানেন আধুনিক বেতারের উন্নতি সাধনের কাজে আমার বিজ্ঞান-মন্দিরের কিছু আবিষ্কার রহিয়াছে। ইহা একার চেষ্টায় সম্ভব হয় নাই। বহু লোকের সম্মিলিত চেষ্টায় ইহা সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে উদ্ভিদবিজ্ঞানে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার আমি করিয়াছি, ভবিষ্যতে ইহার ফলাফল হয়তো মানুষের কাছে খুব প্রয়োজনীয় হইবে, বিজ্ঞান অগ্রসর হইবে। হয়তো ইহার ব্যবহারিক গুণাগুণের জন্য ভারতের কাছে বিশ্ববাসী কৃতজ্ঞ থাকিবে।"

আজ ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে। এই চিঠি লেখার পর অনেক বছর কেটে গেছে। কিন্তু যে কথাগুলি তিনি চিঠির শেষের দিকে লিখেছিলেন তা তাৎপর্যপূর্ণ। এখন যাকে আমরা মৌলিক গবেষণা বলে থাকি পরবর্তী কালে সেটাই পর্যবসিত হয় ফলিত গবেষণায়। যেমন বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রমাণিত হয়েছে ইলেকট্রনসমূহ নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘোরে। এই ধ্যান-ধারণাই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তুলতে এবং এ্যাটম বোমা বানাতে পথ নির্দেশ দিয়েছে।

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহে এই মহান বিজ্ঞানীর জন্ম। পিতার ইচ্ছায় গ্রামের একটি বিদ্যালয়ে অন্য সাধারণ বালকদের সঙ্গে মাতৃভাষায় জগদীশচন্দ্র লেখাপড়া করেন। যেখানেই পুরাণ এবং বেদপাঠ

হতো সেখানেই তাঁকে দেখতে পাওয়া যেত। বালক জগদীশচন্দ্র একমনে শুনতেন। নাটক এবং যাত্রা দুটোই তাঁর কাছে ছিল খুব প্রিয়। এই দুই আসরে সন্ধ্যেবেলায় তাঁকে দেখতে পাওয়া যেত।

বাল্যকাল কেটে গেল। শুরু হল উচ্চশিক্ষা। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা থেকে বি. এ. ডিগ্রী পেলেন। এরপর জগদীশচন্দ্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। সেখানে ইলেকট্রনের আবিষ্কারক স্যার জে জে. থমসনের নিকট অধ্যয়ন করেন ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে 'ট্রাইপোস' লাভ করেন। এরপর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি. এসসি. পাশ করেন। ভারতে ফিরে কলকাতার 'প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হন। এরপর একের পর এক সম্মান আসতে থাকে। তার মধ্যে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এসসি. ডিগ্রী লাভ অন্যতম। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে তিনি রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। এর পরেই ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে লীগ অফ নেশনসের ইণ্টেলেকচুয়াল কো-অরডিনেশন কমিটির সদস্যও হন। সেই সঙ্গে আর একজন সদস্য ছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র ছিলেন মৌলিক গবেষক। মানবজাতির উন্নতি ও কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তাঁর জীবনের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, "কোন বৈদ্যুতিক পরিবাহীর মধ্যে বিদ্যুৎশক্তি স্পন্দিত হতে থাকলে তার চারিপাশের মাধ্যমে এক বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে এবং বৈদ্যুতিক তরঙ্গের গতিবেগটি আলোর গতিবেগের সমান হয়।" ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে বৈজ্ঞানিক হাৎ'জ প্রত্যক্ষ পরীক্ষার সাহায্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণ দেখালেন। এই সময় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রও ক্ষুদ্র তরঙ্গ বিষয়ে পরীক্ষা করছিলেন। বৈজ্ঞানিক হাৎ'জ চেষ্টা করছিলেন তরঙ্গকে ছোট করতে। কিন্তু সে-প্রয়াসে সাফল্য লাভের আগেই হাৎ'জ মাত্র ৩৬ বছর বয়সে মারা যান। জগদীশচন্দ্র হাৎ'জের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে সফল হলেন।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র প্রথম সক্ষম হলেন ক্ষুদ্র তরঙ্গটি তৈরি করতে যার দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ মিলিমিটার। পৃথিবীতে প্রথম কৃত্রিম উপায়ে মাইক্রোওয়েভ সৃষ্টি হল। মাইক্রোওয়েভস্ বা ক্ষুদ্র তরঙ্গের মাধ্যমে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের গবেষণায় আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে জগদীশচন্দ্র বসু অগ্রণী হয়ে আছেন।

তখনকার দিনের বিজ্ঞানীরা ক্ষুদ্র তরঙ্গের গুরুত্ব এবং তার প্রয়োজন তত অনুভব করেন নি। অনুভব করলেন, যখন দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিল তখন। আক্রমণকারী বিমানগুলির গতি-প্রকৃতি জানবার তখন অবধি

কোন উপায় ছিল না। ফলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রচণ্ড অসুবিধা দেখা দেয়। অবশেষে দেখা গেল ক্ষুদ্র তরঙ্গ আক্রমণকারী বিমান থেকে প্রতিবিম্বিত হয়ে তার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করতে সক্ষম। আবিষ্কার হল র‍্যাডার। আজকের দিনে টেলিভিশন সিগন্যাল পাঠানোর ব্যাপারেও ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ প্রয়োজন। মহাকাশ যাত্রার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র তরঙ্গ ব্যতীত সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব নয়।

জগদীশচন্দ্রের গবেষণায় এই আবিষ্কৃত যন্ত্রসমূহ আজ ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান ও শিল্পে ব্যবহার করা হয়। এর উল্লেখ পাওয়া যায় জে. জে. থমসনের লেখা 'ইলেকট্রিসিটি এণ্ড ম্যাগনেটিস্‌ম' নামক গ্রন্থে। র‍্যামসে ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে তথ্যগুলি একত্রিত করে বিজ্ঞানী বসুকে 'আধুনিক ক্ষুদ্র তরঙ্গ শিল্পের জনক' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

তাঁর গবেষণার অন্যতম একটি অবদান ধনধর্মী (p-type) এবং ঋণধর্মী (n-type) সংসক্তক (coherer) আবিষ্কার। পরবর্তী কালে এটি ধনধর্মী এবং ঋণধর্মী অর্ধপরিবাহী (semiconductor) নামে পরিচিত হয়। তাঁর এই অবদানের কথা উল্লেখ করেন বিজ্ঞানী ব্রাটেন যিনি সেমিকণ্ডাক্টর গবেষণায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

মহান বিজ্ঞানীর গবেষণা বোধ হয় কখনও থামে না। একের পর এক গবেষণা চলতে থাকে জগদীশচন্দ্রের। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে তিনি ফটো-সেল বা আলোক-কোষ তৈরি করলেন। পরে তিনি এর নাম দিয়েছিলেন তেজোমিটার (Tejometer)। তাঁর এক বন্ধু এই যন্ত্রটিকে পেটেণ্ট করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। সেই অনুসারে আমেরিকাতে পেটেণ্টের জন্য আবেদন করা হয় ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে। তিন বছর পর ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র ২৯-এ মার্চ তারিখে পেটেণ্টটি পান। (U. S. Patent No. 755840)। এই আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে জগদীশচন্দ্র লিখলেন, "এই যন্ত্র নির্দেশক ও তথাকথিত কোহেরারের সমতুল্য। ইহা বৈদ্যুতিক তড়িৎ চাঞ্চল্য, হার্ৎজীয় তরঙ্গ, আলো ও অন্যান্য বিকিরণ নির্দেশ করে। এর উদ্দেশ্য এই জাতীয় যন্ত্রের স্পর্শকাতরতা ও গতির উন্নতি সাধন।" এই গবেষণাজগতের দিকপাল ব্রুনো ল্যাঙ্গে তাঁর 'ফোটো-ইলিমেণ্ট' গ্রন্থে বলেছেন, "গ্যালেনা (Lead Sulphide), টেলুরিয়াম এবং অন্যান্য খনিজ নির্দেশকের আবিষ্কার হইয়াছিল সুদূর পূর্বপ্রাচ্যে কলিকাতায় জগদীশচন্দ্র বসু-কর্তৃক। এই তথ্যটির সন্ধান পাওয়া যাবে আমেরিকার একটি পেটেণ্টে (755840)।" একটি সমালোচনায় তিনি বলেন "ভারতীয় পদার্থবিদ্‌ এই আবিষ্কারের উপযোগিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন। সেইজন্য বসু তাঁর ফটো-সেল যন্ত্রটিকে একটি কৃত্রিম চোখের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বসু নিজে এই 'আলোক প্রকাশকারী' যন্ত্রটির নাম দিয়েছিলেন 'তেজোমিটার', যেটি সংস্কৃত শব্দ 'তেজ' হতে সংগৃহীত। বিজ্ঞানী ল্যাঙ্গের মতে, বসুর এই আবিষ্কার অনেক আগে হলেও

পশ্চিমের দেশগুলিতে সকলের কাছে তা প্রায় অজ্ঞাত ছিল। কারণ এসব দেশে তাঁর গবেষণাপত্রগুলির প্রবেশাধিকার আদৌ সহজ ছিল না। এজন্য বসুর ক্রিস্টাল ফোটো-সেল পুনরায় আবিষ্কারের প্রয়োজন হয় এবং তা সম্ভব হয় ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে "(Photo-elements, Rainhold, New York, 1938, pp. 39-40)। জগদীশচন্দ্রের এই মাইক্রোওয়েভ, সেমিকণ্ডাক্টর ও ফোটো-সেল আজকের ইলেকট্রনিক শিল্পের ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তি।

উদাহরণস্বরূপ, ধনধর্মী ও ঋণধর্মী কোহেরার অথবা সেমিকণ্ডাক্টর এবং ফটো সেলের উদ্ভাবনের কথা বলা যায়, যার থেকে ইলেকট্রনিক যন্ত্রশিল্পের পত্তন হয়েছে। আজকের যুগের মানুষ ইলেকট্রনিক যন্ত্র ছাড়া একেবারে অচল। রেডিও, টেলিভিশন, টেপ-রেকর্ডার, কমপিউটার প্রভৃতি যেমন চালু হয়েছে তেমনি ব্যবহারিক গবেষণার কাজের জন্য নতুন নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে গবেষণাক্ষেত্রে ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাফি, ইলেকট্রো-সার্জারী প্রভৃতি উল্লেখ্য। এক্স-রে, স্পেক্ট্রোগ্রাফি, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি, আলট্রাসনিক যন্ত্র, রেডিওগ্রাফি, রেডিও-অ্যাকটিভ ট্রেসার এলিমেণ্ট প্রভৃতি ছাড়া উচ্চমানের গবেষণা প্রায় অচল। র‍্যাডার, নৌপরিবহণের পরিচালন ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল কাজেই ইলেকট্রনিক শিল্পের প্রসার এবং উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র বিশ্বে প্রতিরক্ষার কাজে ইলেকট্রনিক শিল্পের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে, কোথাও কম কোথাও বেশী। ইলেকট্রনিক বিদ্যা আজকে যেমন শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়েছে তেমনি নতুন নতুন গবেষণার সুযোগ এনে দিয়েছে।

জীব এবং জড় এই দুই নিয়েই বিশ্ব। জড়ের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক কি? বিশ্বের এই গভীর রহস্যের কারণ অনুসন্ধান করা ছিল জগদীশচন্দ্রের শেষ বয়সের সাধনা।

জগদীশচন্দ্র দেখলেন, উদ্ভিদের অনুভব শক্তি জন্তু ও ধাতব পদার্থের প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী অবস্থা। এই আবিষ্কার তাঁকে জড় জগতের গবেষণা থেকে জীবজগতের গবেষণার পথে ঠেলে দেয়। এরপর একের পর এক তিনি নতুন যন্ত্র তৈরী করেন যা দিয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন কাজের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ লিপিবদ্ধ করা যায়। আলো, তাপ, ক্লোরোফর্ম এবং বিভিন্ন রকমের গ্যাস উদ্ভিদের উপর প্রয়োগ করলে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে এই সমস্ত যন্ত্রের মাধ্যমে তা লিপিবদ্ধ করা যায়। ফলে উদ্ভিদের শারীরতত্ত্বে অনেক নতুন তথ্যের সংযোজন হয়েছে। সালোকসংশ্লেষ, উদ্ভিদের বৃদ্ধি, উদ্ভিদের স্পর্শকাতরতা, রসের উৎস্রোত প্রভৃতি গবেষণায় তাঁর আবিষ্কার নতুন পথ দেখায়। এই সকল কাজের ভিত্তিতে উদ্ভিদজগৎ সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য জানা সম্ভবপর হয়েছে। বসুর মতবাদ আজও অদ্বিতীয়। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, বনচাঁড়াল গাছের পার্শ্ববর্তী পত্র দুটি ছিন্ন করে জলের মধ্যে রাখলেও তার স্বাভাবিক স্পন্দনটি ঠিক থাকে। 'রিনগার সলুসনে' একটি ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডে ঠিক একই রকম স্পন্দন

দেখা যায়। তিনি আরও প্রমাণ করেন, প্রতি ৫° ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতা-বৃদ্ধি হলে কোষের স্পন্দনের হার দ্বিগুণ হয়ে যায়।

তারপর তিনি দেখালেন, উদ্ভিদের দেহে যান্ত্রিক উদ্দীপকের অনুভূতি তড়িৎ-চাঞ্চল্যের সঙ্গে সমগামী। এমন কি, যখন যান্ত্রিক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না তখনও দেহে তড়িৎ-চাঞ্চল্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ শুধু পদার্থবিদ্যাকে ঘিরে নয়, সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন জৈব-পদার্থবিদ্। সম্প্রতি জৈব-রসায়নে অনেক উন্নতি হয়েছে। আজ প্রয়োজন এই উভয় বিষয়ের গবেষণার ফলগুলির মধ্যে পরস্পর সমন্বয় সাধন করা। অবশেষে জৈব-রসায়নের আবিষ্কার ব্যাখ্যা করা পদার্থবিজ্ঞানের দায়িত্ব। আচার্য সম্বন্ধে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মন্তব্য হোলো, "জগদীশচন্দ্র বসুর সমস্ত গবেষণার সারাংশ থেকে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে, তাঁর কাজ এত উন্নত ও তিনি এতদূর গেছেন যে, এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে তার সম্বন্ধে সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়।"

বর্তমান জগতে জ্বালানী-শক্তির সঙ্কট দিনে দিনে তীব্র হয়ে উঠছে। এই সময় খাটাউকে যে চিঠি জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন, তা আমরা উল্লেখ করেছি। সেই চিঠি আমাদের কাছে যেন ভবিষ্যদ্বাণী।

সমগ্র মানবজাতির খাদ্য, অক্সিজেন, ঔষধ এবং জ্বালানী সংগ্রহের জন্য আমরা উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। অধিক জ্বালানী-সম্পন্ন বৃক্ষ রোপণ তাই আজ অপরিহার্য। যে সূর্যকিরণ, জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের সাহায্যে গাছ তার রসদ যোগাড় করে, সেই ব্যবস্থা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র বহুদিন ধরে গবেষণা করেছিলেন। মানুষও এর সুযোগ নিয়ে শক্তি আদায় করতে পারে। সে সম্বন্ধে তিনি কিছু নোট লিখে গেছেন। আমরা জানি যে, সবুজ পাতা সূর্যকিরণ, কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলের সাহায্যে কার্বোহাইড্রেট তৈরি করে। যদি দেশের বৈজ্ঞানিকেরা উদ্ভিদকে নকল করে কৃত্রিম সালোক-সংশ্লেষ ঘটাতে পারে তাহলে দেশ খুব সহজে খাদ্য ও শক্তি পাবে।

পরাধীন অবস্থায় ভারতীয় বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ উপলক্ষে স্বদেশী স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ছাড়া আর কোন রাস্তা খোলা ছিল না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেসব দেশ অগ্রসর হয়েছে, তারা সবাই স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতেই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। কারণ তাঁরা অভিজ্ঞতা মারফৎ বুঝেছিলেন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং আমলাতন্ত্রের লাল ফিতার ফাঁস একসঙ্গে চলতে পারে না। আমলাতন্ত্র সর্বদাই সবকিছু তার আইনকানুনের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করে। এ কথা বিরোধী সমালোচনা নয়, কেবলমাত্র আমলাতন্ত্রের প্রকৃতির ব্যাখ্যা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বিদেশী সরকারের

অধীনে গবেষণাকেন্দ্রগুলির স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী উপলব্ধি করা গিয়েছিল। দেশের বিজ্ঞানী সমাজ এবং স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা সেদিন মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি করেছিলেন।

বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে আচার্য জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, "আমি এই গবেষণাগার দান করিলাম যাহা শুধু গবেষণাগার নহে, একটি বিজ্ঞান-মন্দির। বত্রিশ বৎসর হইল শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করিয়াছি। বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহু দেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকার্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসীরা যে কেবল ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য কোনদিনই তাহাদের নহে, সেই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র-নির্মাণও এদেশে কোনদিনও হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে-ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্বে অদ্যকার দিনে এই সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন, সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথ-প্রদর্শকও কেহ ছিল না। বহু বৎসর ধরিয়া একাকী তাহাকে প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এতদিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে।..."

এমনই একটি জাতীয় গবেষণা মন্দির গড়ে তোলার আবেদনে সমগ্র দেশ সাড়া দিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন। আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়ে **'Young India'** কাগজে তিনি লিখলেন, "আজ সকল ভারতবাসী আচার্য জগদীশচন্দ্রকে দেশবাসীরূপে পাইয়া গর্বিত এবং ধন্য। কারণ তিনি শুধু একজন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নন, একদিন তাঁহার আবিষ্কারগুলি বিশ্বে শিল্প-বিপ্লব ঘটাইবে। এই জগতে বসু বিজ্ঞান-মন্দির একটি মহান স্থান অধিকার করিবে। এই বৃহৎ শহরের নাগরিকবৃন্দের কর্তব্য এই ভারতীয় বিজ্ঞানীকে—যিনি ভারতের গৌরব দেশ-বিদেশে পৌছাইয়া দিয়াছেন তাঁহাকে সংবর্ধনা জানান। ইহাতে বোম্বাই শহরের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি হইবে।"

এগার বৎসর পরে জগদীশচন্দ্রের সংবর্ধনা উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী এক চিঠি লেখেন। উত্তরে ডিসেম্বর ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন, "আমার স্মরণ আছে দীর্ঘ এগার বছর পূর্বে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে বিশেষ ভূমিকা আপনি লইয়াছিলেন, তখন যাহা আমি আশা করিয়াছিলাম তাহা আজ পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। বিজ্ঞান-মন্দির বিদ্যাগৃহরূপে ভারতের

মহান ঐতিহ্য পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। আপনার শুভেচ্ছাতে আমি অভিভূত। আশা করি, আপনার শরীর শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিবে।"

আচার্যের ডাকে সেদিন ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য এসেছিল। বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা ভাষণে জগদীশচন্দ্র একটি চিঠি থেকে উল্লেখ করেছিলেন "পশ্চিম প্রদেশের কতিপয় ছাত্রীর নিকট হইতে পত্র পাইয়া আমি গভীরভাবে অভিভূত। তাহারাও মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য সামান্য দান পাঠাইয়াছে।" ধনী, ব্যবসায়ী, রাজ পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকেও অনুরূপ আর্থিক সাহায্য এসেছিল। যদিও সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয় তবুও কয়েকটি নাম উল্লেখ করা যায়। যেমন, মহীশূর এবং পাতিয়ালার মহারাজা, শ্রীমূলরাজ খাটাউ ও জাতীয় কংগ্রেসের অর্থসচিব শ্রীযমুনালাল বাজাজ। মূলরাজ খাটাউ ৫ই মে, ১৯২২ তারিখে মহাবালেশ্বর থেকে লিখেছিলেন "আপনার আবিষ্কারগুলির কথা জানিতে পারিয়া আমি অভিভূত। আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি আপনি আরও আশ্চর্য ধরনের আবিষ্কারের সম্মানে ভূষিত হউন, যে আবিষ্কার কোন ইউরোপীয়, কোন আমেরিকান অথবা কোন শ্বেতাঙ্গ আজও করিতে পারে নাই। পিতাজী আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছেন। আমাদের সলিসিটর 'দানপত্র' তৈরী করিতেছেন, সেটি সম্পূর্ণ হইলে পিতা আপনার নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠাইবেন।"

জগদীশচন্দ্র সেই শিল্পপতিকে জানিয়েছিলেন, "আপনি সহজেই অনুধাবন করিতে পারিবেন আমি বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্য কতটা চিন্তিত। কারণ দেশবাসীর ইচ্ছা বিজ্ঞান-মন্দির যেন চিরকাল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন না থেকে স্বাধীনভাবে জাতীয় উন্নতি সাধন করতে পারে। যদি ইহাকে আমাদের চেষ্টায় চিরস্থায়ী না করতে পারি তবে তা খুবই অসম্মানজনক হবে। আপনি মনে রেখেছেন কৃষির যথাসাধ্য উন্নতি সম্ভব নয় যদি না গাছের বৃদ্ধির নিয়ম এবং তাহার জীবন ব্যবস্থা ভালভাবে অনুসন্ধান করা যায়। কোটি কোটি টাকা আমেরিকা ও ভারতবর্ষে প্রতিবছর কৃষিকাজের জন্য খরচ করা হচ্ছে। কিন্তু যথাযথ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। আমার বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রধান উদ্দেশ্য হল উদ্ভিদজীবন, প্রাণিজীবন এবং তাদের উভয়ের সাদৃশ্য নিয়ে গবেষণা করা। এই গবেষণার আবিষ্কারের ফলে শুধু যে কৃষির উন্নতি সাধিত হবে তা নয়, চিকিৎসা ও অন্যান্য বিজ্ঞানও যথেষ্ট উপকৃত হবে। আপনি এ কথা বুঝেছিলেন ও উদ্ভিদজীবন সম্পর্কে গবেষণায় অর্থদান করেছিলেন। এই থেকে স্বাভাবিক ভাবে কৃষির উপকার অনিবার্য।"

জাতীয় নেতারা বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের ভবিষ্যৎ নিয়ে সেদিন চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। এটি কি ব্রিটিশ শাসনমুক্ত রাখা সম্ভব হবে? কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কোষাধ্যক্ষ শ্রীযমুনালাল বাজাজ আচার্যের কাছে জানতে

চাইলেন বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে কিনা। জগদীশচন্দ্র পত্র পেয়ে তখনি বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের পরিচালক সমিতিকে এক চিঠিতে জানালেন:

এই মন্দিরটি আমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি এই উদ্দেশ্যে যে, ভারতীয়রা বিশ্বের বিজ্ঞানের উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিবে এবং নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইবে। আমি বিশ্বাস করি, এই বিজ্ঞান-মন্দিরের সত্যিকার উন্নতি সাধন সম্ভব হইবে যদি ইহার পরিচালন ব্যবস্থা ভারতীয়ের দ্বারা হয়। সরকারী নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আবদ্ধ হইলে ইহার গবেষণার উন্নতিতে ব্যাঘাত ঘটিবে। অধিকাংশ দাতারা বিশেষভাবে এই মতে বিশ্বাসী। সত্যি কথা বলতে, সমস্ত দাতাদের শর্তই ছিল বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের পরিচালন ব্যবস্থায় কোন সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না। রাজ্যের সচিব এবং তার পারিষদবর্গ যখন এই বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্য ইমপিরিয়াল গ্রাণ্ট অনুমোদন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ইহার পরিচালন ব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসন মেনে নিয়েছিলেন। আমি বিজ্ঞান-মন্দিরের পরিচালক সমিতিকে এই নীতি রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করছি।

ইতি—
জগদীশচন্দ্র বসু
অধিকর্তা
বসু বিজ্ঞান-মন্দির।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরিচালক সমিতি জগদীশচন্দ্রের মন্তব্য কার্যকর করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবটি যমুনালাল বাজাজকে পাঠানো হয়।

উত্তরে শ্রীবাজাজ জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন:

183/185 Kalbadevi Road
Bombay 24th May, 1922

বিগত ১৫ই মে, ১৯২২ তারিখের বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের পরিচালক সমিতির সভায় যে-প্রস্তাবটি অনুমোদন লাভ করে তাহার সারাংশটি আমি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, পরিচালক সমিতি দার্জিলিং এবং Abbey হোমের ও স্যাংটামের বাড়ি এবং জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। দার্জিলিং-এর জমি অধিগ্রহণের জন্য যে-অর্থ প্রয়োজন তাহার বাকী দশ হাজার টাকা পাঠাইতেছি। সরকারী নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পরিচালক সমিতির নিকট আপনার পত্র এবং এ বিষয়ে পরিচালক সমিতির গৃহীত প্রস্তাব আমাদের মতে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের ভবিষ্যৎ রক্ষা করিবে। আমাদের প্রস্তাব পরিচালক সমিতি গ্রহণ করায় আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি, বসু বিজ্ঞান-মন্দির বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে এবং

ইহার উপর কোন সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না। আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আপনার উদ্বেগে আমি খুবই অভিভূত। মহাত্মাজী এবং আপনার কাছ থেকে যে-আশীর্বাদ এবং স্নেহ পাইয়াছি এবং পাইতেছি তাহাতে আমার সব ভয় কাটিয়া গিয়াছে। তা সত্ত্বেও আপনার সহৃদয় উপদেশ ভুলিব না এবং শরীরকে আরও যত্ন করিতে সচেষ্ট থাকিব। শ্রীমতী অবলা বসু এবং আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

ইতি

বাজাজ

আজকে স্বাধীন ভারতে যাঁরা উচ্চ-শিক্ষা এবং গবেষণার ব্রতী তাঁদের স্মরণ করা উচিত তাঁদের পূর্বসূরীদের এই সংগ্রামের ইতিহাস, যে-সংগ্রামের ফলশ্রুতি হল আজকের বসু বিজ্ঞান-মন্দির। বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের ইতিহাস প্রসঙ্গে এপ্রিল ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে আচার্য জগদীশচন্দ্র উল্লেখ করেছিলেন, "এই বিজ্ঞান-মন্দিরের পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্যরা হলেন ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাক্তার নীলরতন সরকার, শ্রী এস. আর. দাশ (দেশবন্ধুর ভ্রাতা), শ্রীমতী অবলা বসু, ডক্টর পি. কে. আচার্য।"

বিজ্ঞান গবেষণা ও তার শৃঙ্খলা বোধ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন "আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমাকে এই শিক্ষাই দিয়াছে, আমার ছাত্ররা শুধু সত্যের সন্ধান এবং আবিষ্কারে তাহাদের গবেষণা সীমিত করিবে না। সেইজন্য আমার ছাত্র নির্বাচনে চরিত্র, কর্তব্যকাজে নিষ্ঠা ও আত্মদানকে আমি প্রাধান্য দিয়া থাকি। আমি বিশ্বাস করি, আমার ছাত্ররা বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে গবেষণায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া বুদ্ধিজীবীদের সাধনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবে। গোড়াতেই উচ্চ ভাবধারা সৃষ্টি করিতে প্রয়োজন একটি শৃঙ্খলাবোধ কার্যকরী করা। একবার দৃঢ়ভাবে আয়ত্তে আসিলে ইহার প্রবাহ বজায় রাখিতে অসুবিধা হইবে না।"

"গবেষণা কথাটিকে অনেকে ভুল বোঝেন এবং সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। অনেক সময় যে কাজের বৈজ্ঞানিক মূল্য অল্প অথবা নেই বললেই চলে সেই সব কাজকে গবেষণা বলে ভূষিত করা হয়। অজানাকে খুঁজে বের করা ও তার অনুসন্ধান করা এবং নব আবিষ্কৃত ঘটনাবলীর নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করা অতি কঠিন ব্যাপার। সাফল্য কেবল মাত্র আবিষ্কার করা ও সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে বিশেষ শিক্ষা দিলেই সম্ভব। আবিষ্কার ও সৃষ্টির ক্ষমতা অর্জন করতে গেলে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। তখনই সাফল্য সম্ভব। এইভাবেই যুগান্তকারী আবিষ্কারসমূহ ঘটে এবং বিজ্ঞানের বাস্তবিক উন্নতি সাধিত হয়। তদন্তের নতুন উপায় আমার শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এই শিষ্যরা এরই মধ্যে আমার সঙ্গে মিলিতভাবে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে। সে পত্রগুলি রয়াল সোসাইটি দ্বারা গৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে। আমি

সজোরে বলতে পারি যে, সাধারণ গবেষণার মাপকাঠির তুলনায় আমার ছাত্রদের কাজ অনেক উচ্চমানের।" শিষ্যদের প্রতি তাঁর মনোভাব ও তাঁর উৎসর্জনে অনেকে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকে বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্য নানান ত্যাগ স্বীকারে এগিয়ে আসেন। বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের ইতিহাসে উনি লিখেছেন, —"বসু বিজ্ঞান-মন্দির নির্মাণ করিবার জন্য আমি পাঁচ লক্ষ টাকা, জমি, গৃহ-যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ দান করিলাম। সেই সঙ্গে সরকারী মুদ্রায় দান হিসাবে এক লক্ষ টাকা। আমার বসতবাটীর মূল্যস্বরূপ ছয়লক্ষ টাকা দলিলে উল্লেখ আছে। এই টাকা বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের থাকিবে। সর্ব-সাকুল্যে আমার দান বার লক্ষ টাকার মত হইবে। জনসাধারণের কাছ থেকেও মন্দিরের জন্য দান গ্রহণ করা হইয়াছে।"

জনসাধারণের দান এবং সেই সঙ্গে আচার্যের ত্যাগে তাঁর ছাত্রদের কাছ থেকে সাড়া মিলেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়, ভারতেও তার প্রভাব এসে পৌছায়। সরকার সর্বক্ষেত্রে অর্থের ব্যয়-বরাদ্দ কমাতে শুরু করেন। তখন জগদীশচন্দ্রের গবেষক-ছাত্ররা ১১ই আগস্ট তারিখে আচার্যকে নিম্নলিখিত পত্রটি লেখেন:

"স্যার, বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষক ছাত্ররা সরকারের অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সচেতন আছে। এই অবস্থার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তাহারাও চিন্তিত এবং আপনার সহিত সহযোগিতা করিতে বদ্ধপরিকর। তাহারা এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে-কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত এবং এ বিষয়ে সর্বদা আপনার সহানুভূতি ও উৎসাহপ্রার্থী।

আমরা আপনাকে আরও নিশ্চিত আশ্বাস দান করিতেছি, বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

ইতি
শ্রীগুরুপ্রসন্ন দাস
ও
সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস

এই ভাবেই সংগ্রাম এবং ত্যাগে দেশ গড়ে উঠেছে। এই শিক্ষাই আমাদের যুগে যুগে আয়ত্ত করা দরকার।

ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত করা তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য নয় একথা জগদীশচন্দ্র অনেক সময় বলেছিলেন। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ৩০-এ নভেম্বর তারিখে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এক ভাষণে তিনি বলেন, "মানুষ একদিন উপলব্ধি করিতে পারিবে এই বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মধারার স্বরূপ কী? বিচিত্র ঘটনার মধ্যে এক শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশ্বকে বুঝিতে পারিবে কি? ভারতবর্ষ তার স্বকীয়

চিন্তাধারার জন্য এই কাজে বিশেষভাবে উপযুক্ত। এই চিন্তাধারা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের বিভক্তিকরণের সীমারেখায় গবেষণা করিতে আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়াছে। অনেক সময় ইহা সচেতনভাবে অনুভব করি নাই। ইহা ক্রমাগত তাত্ত্বিক গবেষণা হইতে ফলিত কাজে, জড় জগৎ হইতে প্রাণি-জগতের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিকাশের চাঞ্চল্যে, এমন কি, অনুভূতি সম্বন্ধে গবেষণায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।" তিনি আরও বলেন, "বৈদিক যুগে এক মহিলাকে যখন সম্পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয় তখন উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা মৃত্যুকে কি অতিক্রম করা সম্ভব হইবে? ইহা যদি অমরত্ব লাভে সাহায্য না করে তাহা হইলে সেই সম্পদ কোন্ কাজে লাগিবে? ইহাই ভারত আত্মার সর্বকালের আকাঙ্ক্ষা।"

ব্রিটিশ শাসনকালে বিগত দিনের ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা তখনকার চিন্তাশীল মনীষীদের মধ্যে রামমোহন থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত পর্যালোচনা করেছিলেন। ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবে তিনটি প্রতিক্রিয়া বোঝা গিয়েছিল। (১) ভারতের অবদানকে তুচ্ছ বলে বাতিল করা; (২) সমস্ত ইয়োরোপীয় সংস্কৃতিকে বাতিল করে ভারতীয় বলতে যা কিছু বোঝায় তাকে রক্ষা করা; (৩) ভারতীয় ভাবধারায় যথার্থ উন্নত দিকটি পরীক্ষা করে তার সঙ্গে বিদেশী সংস্কৃতির উন্নত দিকটির সমন্বয়সাধন করা। তৃতীয় এই পথই রামমোহন রায় অনুসরণ করেছিলেন। এই পথই অনুসরণ করেছিলেন প্রথিত-যশা বুদ্ধিজীবীরা। যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসুর শিল্পকলা আধুনিক ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক। বিজ্ঞানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রাচীন ভারতের রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস এবং ভেষজবিদ্যার ইতিহাস রচনা করেছিলেন। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রাচীন হিন্দুদের প্রকৃতি-বিজ্ঞান অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই সব মনীষীর অনেকেই ভারতীয় দর্শন, বেদান্ত, সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ জৈন ও অন্যান্য সমপর্যায়ের ধর্মশাস্ত্রের পূর্ণ অনুশীলন করে তাদের আজকের দিনের তাৎপর্য আলোচনা করেছিলেন। এই সব মনীষী জগদীশ-চন্দ্রের কলকাতার বাড়িতে প্রায়ই সমবেত হতেন। এই বাড়িতেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্যরচিত স্বদেশী সঙ্গীতগুলি নিজে গাইতেন। সেই গান হেমেন্দ্রমোহন বসু তাঁর ফ্যাথিফোন যন্ত্রে রেকর্ড করতেন।

জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বসুর শিশুশিক্ষার ব্যাপারে নিজস্ব একটি দৃঢ় মতবাদ ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় প্রয়োজন ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা শুরু করা দরকার। তাই তিনি জগদীশ-চন্দ্রকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করে দিয়েছিলেন। এখানে জগদীশচন্দ্রের সহপাঠীরা অধিকাংশই ছিল গ্রামের চাষী ও জেলের সন্তান।

জগদীশচন্দ্র শুধুমাত্র একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন ভারতের মহান বিজ্ঞানী। তাঁর গবেষণার একটি মূল উৎস ছিল স্বদেশের বৈজ্ঞানিক ভাবধারা—যে ভাবধারা ভারতীয় বিজ্ঞান—চরক, শুশ্রুত এবং আর্যভট্টের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, যে-বিজ্ঞান প্রথম পথ দেখিয়েছিল বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কার্যক্ষমতা। মহাবিশ্বের ইতিহাস, জীব ও জড় ও উদ্ভিদ জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। সেইসঙ্গে তিনি অনুধাবন করেছিলেন বিজ্ঞানের সকল শাখার মধ্যে একটি একতার সূত্র। জগদীশচন্দ্রের গবেষণা ঐতিহ্যহীন আকস্মিক ব্যাপার নয়। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সাধকরা বিজ্ঞানের যে-ঐতিহ্য গড়ে গেছেন জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান গবেষণা তারই অনুসারী।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে চিন্তাশীল মনীষীদের বৈশিষ্ট্য ছিল মৌলিক প্রশ্নের সমাধান খোঁজা। নচিকেতা যমকে প্রশ্ন করেছিলেন "মৃত্যু কি ?" ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্দালক আরুণী তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুর সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন, স্মৃতি ও চিন্তার স্বরূপটি কি ? ঘটনা থেকে এদের কি 'স্বতন্ত্র' করা যায় ? শ্বেতকেতু পিতার নির্দেশে পরীক্ষা-মূলকভাবে বিনা খাদ্যে কিছুদিন কাটাতে সম্মত হয়েছিলেন। তখন দেখা গেল তিনি বেদশাস্ত্র স্মরণ করতে পারছেন না। পুনরায় খাদ্য গ্রহণ করার পর তাঁর স্মৃতিশক্তি ফিরে আসে। জগদীশচন্দ্রও স্মৃতিশক্তির অনুরূপ পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁর পরীক্ষাগুলির একটিতে আলোক-বিচ্ছুরণকারী ধাতব প্লেটের ওপর নক্সাখচিত কার্ডবোর্ডের মধ্য দিয়ে আলোর প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখলেন প্রতিফলিত স্থান আলোকিত হলো। এরপর কার্ডবোর্ডটিকে অপসারণ করে প্লেটের ওপর অন্য একটি আলো ফেললেন। দেখা গেল আগের নক্সার ছাপ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মানুষের উপলব্ধির সত্যটির উৎস কোথায় ? তার জ্ঞান যে সত্য তারই বা প্রমাণ কি ? নাগার্জুন, বুদ্ধপালি, চন্দ্রকীর্তি এবং শ্রীধর প্রমুখ বৌদ্ধ দার্শনিকেরা এই সমস্যা গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন। অবশেষে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের সত্যতার প্রমাণ নেই। আমরা হয়তো এই ধারণার সঙ্গে একমত নাও হতে পারি, তথাপি এই সমস্যা অনুশীলনে আমরা লাভবান হতে পারি। তবে কিছু শিক্ষিত লোকে একসময় মনে করেছিলেন সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। হয়তো তাৎক্ষণিক উপলব্ধি অনেক সময় অন্তর্নিহিত সত্যটিকে ঢেকে রাখে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্যভট্ট দেখিয়েছিলেন পৃথিবীর দৈনিক গতিই এই ভ্রান্তির কারণ। এই ভ্রান্ত অনুভূতি এতই জোরদার ছিল যে, আর্যভট্টের সূত্রটি প্রতিষ্ঠিত হতে হাজার বছর সময় লেগেছিল। অর্থাৎ কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিওর সময় পর্যন্ত। আধুনিক কোয়ানটাম পদার্থবিদ্যা আজ দেখাচ্ছে, পরমাণুগুলি পদার্থ ও শক্তি দুই-ই। সীমিত ইন্দ্রিয়বোধের জন্য আমাদের পক্ষে একসঙ্গে কোন বস্তুকে

পদার্থ ও তরঙ্গ বোধ করা দুষ্কর। আজ অবধি মানুষ তার চাক্ষুষ প্রতিফলনের ভিত্তিতে চিন্তা করছে। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করলে সেই জগৎ সম্বন্ধে চাক্ষুষ প্রতিফলনের সাহায্যে চিন্তা করা অসুবিধাজনক। হয়তো বা অসম্ভবও। কিন্তু এই অবস্থায় মানুষের কি করণীয়? অঙ্কের যুক্তি দ্বারা চিন্তা করা। ধরা যাক, জগদীশচন্দ্রের বেতারের গবেষণাটি। বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং প্রকৃতি এমনই যে তা মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তা শোনা যায় না। কোন গন্ধ নেই। অনুভবও করা যায় না। সেই শক্তিকে বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে শব্দে রূপান্তরিত করলে তবেই তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল তড়িং-চুম্বক জগৎ সম্পর্কে নিশ্চিত তত্ত্বের ভিত্তিতে এবং গণিতের সাহায্যে বেতার তরঙ্গের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছিলেন। এই ধরনের তাত্ত্বিক ধারণা সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে গবেষণা করা তখনই সম্ভব যখন মানুষের যুক্তিক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর অটুট আস্থা থাকে। জগদীশচন্দ্রের ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গের আবিষ্কার এই দৃঢ় বিশ্বাসের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

পরিবর্তনশীল মহাবিশ্বের ঘটনা জগদীশচন্দ্রের মনে রেখাপাত করেছিল। জড় পদার্থ থেকে জীবের উৎপত্তির অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা এই মহাবিশ্বে পরিবর্তনের একটি ঘটনা। এই চিন্তাধারাই তাঁকে হয়তো নদীতীরে বসবাস করবার প্রেরণা জুগিয়েছিল। জীবনের প্রথম দিকে চন্দননগরে নদীর ধারে বসবাস করেছিলেন। পরবর্তী কালে ফলতাতে একটি মনোরম গৃহ নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে গৃহের যে-কোন জায়গা থেকে নদী দেখা যায়। তিনি মাঝে মাঝে ঘর, বাড়ি, মন্দির, জলাশয় প্রভৃতির ছোট ছোট মডেল তৈরী করেছিলেন। তাঁর কলকাতার বাড়ির উদ্যানে এই জাতীয় মডেলের সাক্ষাৎ মেলে। ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে তিনি হিমালয়ে গিয়েছিলেন এবং এ সম্বন্ধে একটি অবিস্মরণীয় প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

কোন্ অবস্থায় এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল? ধরা যাক, সময়ের সীমারেখায় আমরা যদি সর্বদাই পেছনের দিকে চলে যাই তা হলে এই যাত্রার কোন শেষ পাওয়া যাবে না। সংক্ষেপে বলতে হয়, এই মহাবিশ্ব দেশ ও কালের গতিতে অনন্ত। মহাবিশ্বের মহাকালের আদি নেই, অন্তও নেই। এই বস্তুটিকে এক কথায় ভারতীয় দর্শন সাংখ্যে প্রকাশ করা হয়েছে অব্যক্ত অথবা প্রকৃতি নামে। জগদীশচন্দ্রও তাঁর উপলব্ধি একত্রিত করে তাঁর প্রবন্ধ সংকলনের নাম দিয়েছিলেন 'অব্যক্ত'। সাংখ্য দর্শনে অজ্ঞাত প্রকৃতিকে কল্পনা করা হয়েছে প্রথমে স্থায়ী রূপে। এই স্থিত অবস্থা ভাঙবার পর প্রকৃতির ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এই ক্রমবিকাশের কোন এক স্থানে একদিকে প্রাণ ও চেতনার উৎপত্তি, অন্যদিকে জড়সঙ্গমের আবির্ভাব দেখা দেয়। সাংখ্যের ভাষা হয়তো আমাদের কাছে আজ অপরিচিত। সাংখ্যের মতো আরও অন্যান্য সাধারণ দর্শনের রচনায়

পর ব্যক্তিগত 'ফেনোমেনার' গভীরতর গবেষণার প্রয়োজন দেখা দিল। তখন পৃথক পৃথক ভাবে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও প্রাণতত্ত্বের উৎপত্তি হল। এইগুলি পুনরায় বিভক্ত হয়ে আরও বিভিন্ন উপবিভাগে পরিণত হল। কিন্তু বিজ্ঞান আজ এমন অবস্থায় এসে পৌঁচেছে যে, বিভিন্ন বিভাগের একত্রীকরণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানের সব ঘটনাই একে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সুবিধার জন্য হয়তো বিভাগগুলির বিভক্তিকরণ প্রয়োজন হয়েছিল কিন্তু আজ উপলব্ধি করা গেছে বিজ্ঞান অথবা জ্ঞান এক এবং অদ্বিতীয়। এ বিষয়ে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, "পশ্চিমের দেশসমূহে আধুনিক বিজ্ঞানে অত্যধিক বিভাগের জন্য মৌলিক তত্ত্বের বিষয়বস্তু হইতে দূরে সরিয়া যাইবার আশঙ্কা বর্তমান।" তাঁর মতে, সকল বিভাগের লব্ধ জ্ঞান থেকেই মৌলিক সত্যটি পরম সত্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সাংখ্যমতে জীব সৃষ্টি হয়েছিল অবিভেদিত 'অব্যক্ত' থেকে। ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকরা মনে করতেন আত্মা হল 'দ্রব্য'। যেমন অন্যান্য দ্রব্য মাটি, বাতাস, জল, আগুন, মহাকাশ এবং ইথার। দেহ ও অনুভূতি (অন্তর) এবং বাহ্য অনুভূতি ও বাহ্যবস্তুর সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয় 'চেতনা'। দ্রব্য আবার পরমাণু দিয়ে তৈরী। বর্তমান পরমাণু প্রাণবিদ্যা (Molecular Biology) বলে, কতকগুলি পরমাণুর বিশেষ যোগাযোগে জৈব ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

সীমাবদ্ধ ঘটনা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে এরকম আরও উল্লেখযোগ্য অনুমানের উদাহরণ রয়েছে। যেমন, বুদ্ধের পরবর্তী কালের দার্শনিকদের কাছে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে মহাবিশ্বের স্থান এবং কাল—এ দুটো জিনিসকে আলাদা-ভাবে বিচার করা উচিত নয়। মহাবিশ্ব এবং কালের (সময়) অন্তর্নিহিত ঘটনাসমূহ বিচ্ছিন্ন নয়। অর্থাৎ স্থান ও কাল একই সূত্রে বাঁধা, স্বরূপটি অভিন্ন। প্রত্যেক বিন্দুরূপী মুহূর্তগুলি একাধারে কালের কণা অন্যদিকে মহাবিশ্বের আকারের কণা, বস্তুত তারা অভিন্ন। এই চিন্তাধারা আইনস্টাইনের দেশ ও কাল (Space-time) সম্পর্কিত মতবাদের সঙ্গে তুলনীয়।

এই বক্তব্যগুলি অবশ্য আনুমানিক। পরীক্ষার মাধ্যমে এর সত্য প্রমাণ করা প্রয়োজন। প্রফুল্লচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন, শ্রমজনিত কাজ ও গবেষণামূলক পরীক্ষা ও পরিচালনা করা এদেশে কম হত। তা ছাড়া, ছিল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব।

পরীক্ষা মারফৎ জগদীশচন্দ্রই প্রমাণ করলেন যে, বৈদ্যুতিক যান্ত্রিক উত্তেজনা এবং বিষপ্রয়োগে ধাতু, উদ্ভিদ ও প্রাণীর তন্তু সবই সমভাবে সাড়া দেয়। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন "বিচিত্র জীবনের প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে জড় পদার্থের প্রতিক্রিয়ারই স্বরূপ। এটি কোন রহস্য বা আকস্মিক ঘটনা নহে। এটি কোন অযান্ত্রিক জৈবশক্তি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। যে অযান্ত্রিক জৈবশক্তি পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকানুন বাতিল অথবা

অস্বীকার করে সেই শক্তি মেনে চলার কোন প্রয়োজন নেই। এই বিবিধ প্রতিক্রিয়ার মাঝে কি ধাতু কি উদ্ভিদ কি জীবের মাঝে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। (Response in the living and non-living, 2nd impression, p. 189)।

জগদীশচন্দ্রের গবেষণা একাধারে ভৌতবিজ্ঞান অন্যদিকে জীববিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বের ভেদাভেদ অপসারণ করেছে। বিংশ শতাব্দীতে জৈব রসায়ন গবেষণার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং বর্তমানকালে RNA ও DNA আবিষ্কার হওয়ার পর ভৌতবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের যোগসূত্রের পথ আরও জোরদার করেছে। জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগুলির ওপর জৈব রসায়ন সম্পর্কিত গবেষণা করে তাঁর সূত্রগুলি পরীক্ষা করলে এই গবেষণা আরও উন্নত হবে। বর্তমানে অণু-পদার্থবিদ্যার অগ্রগতি জৈব রসায়ন তত্ত্বের অনেক তথ্য ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে। সামগ্রিক দৃষ্টিতে জীবনের ভৌত উপাদানের ভিত্তি প্রমাণিত হয়ে চলেছে। জীবিত বস্তুর প্রোটিন বিচিত্র অ্যামিনোএ্যাসিড দিয়ে তৈরি। একটি জলপূর্ণ পাত্রে মিথেন, অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন গ্যাস মিশ্রিত করে আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন অথবা তড়িৎ-প্রবাহ প্রেরণ করলে বিভিন্ন রকম অ্যামিনোঅ্যাসিড তৈরি হতে দেখা গেছে। এই অ্যামিনোঅ্যাসিডই হলো প্রোটিনের রাসায়নিক উপাদান। এই উপাদানগুলির সংযোগ রীতি ব্যাখ্যা করতে জৈব পদার্থবিদ্যা এখন অগ্রণী।

লায়েল প্রমাণ করেছিলেন পৃথিবীর ক্রমবিকাশ। কেন্ট ও ল্যাপলাস জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের ক্রমবিকাশ প্রমাণ করেছিলেন। ডারউইন প্রাণিজগতের বিবর্তন প্রমাণ করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করেছিলেন জড় বস্তু থেকে জীবনের বিবর্তন আর এই গবেষণায় তিনি আজও অগ্রণী হয়ে আছেন। এরকম ভাবে তিনি প্রাচীন সাংখ্যদর্শনের অনুমানকে প্রমাণ করেছিলেন। প্রমাণ করেছিলেন যে, জীবন জড় পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে অব্যক্ত থেকে। রয়্যাল সোসাইটির বক্তৃতামালার একটিতে তিনি জাগতিক রীতির একতা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বেদান্ত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন, 'বিশ্বের এই পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্যের মাঝে যাঁরা একতা দেখেন তাঁরাই চিরসত্য উপলব্ধি করেন। আর কেহ নয়।' জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু (যিনি বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের পরবর্তী অধিকর্তা ছিলেন) জগদীশচন্দ্রের সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "সেই সময় (১৯১৬-১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে) দার্জিলিঙের মায়াপুরীতে গ্রীষ্মকালীন অবকাশে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নীলরতন সরকার, জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি. এন. শীল, অধ্যাপক এম. ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সমাবেশ হতো। অধ্যাপক পি. গেডিস্ ও সাহিত্যিক কাজিন্‌স্ গ্রীষ্মকালে দার্জিলিং আসতেন এবং এখানে সামার স্কুলে বক্তৃতা দিতেন।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে ইয়োরোপ থেকে ফিরে এসে দার্জিলিং-এ এই দলের কার্যকলাপ দেখেছিলাম। দুটি স্মৃতি আজও আমার মনকে উদ্বেলিত করে। প্রথমটি একটি বক্তৃতা। বক্তৃতাটি মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের উপর। বক্তৃতা দিয়েছিলেন মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারক আমার কলেজের সহপাঠী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নির্বাচিত সমাবেশে সি. আর. দাশ জগদীশচন্দ্রের বৈঠকখানায় বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের সেই প্রাক্-ঐতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতা নিদর্শনের স্থানে যাবার পরিকল্পনা সার্থক হয়েছিল চার বছর পরে, যখন তিনি ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে লাহোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। সেই সময় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডেপুটি ডাইরেকটর জেনারেল রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহানি হরপ্পা পর্যটনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই দলে জগদীশচন্দ্র ও অবলা দেবীর সঙ্গীরা ছিলেন অধ্যাপিকা মিসেস কম্পটন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা এবং আমি।

জগদীশচন্দ্রের চিরসুহৃদ রবীন্দ্রনাথও ছিলেন আমৃত্যু বিজ্ঞান-পিপাসু। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কাজের খবরাখবর ছাড়াও অনেক চিঠিপত্রে ও লেখায় এর সাক্ষ্য মেলে।

কিছুকাল পরে রাশিয়ার বালটিক স্টেট থেকে বিখ্যাত শিল্পী-অধ্যাপক নিকোলা রোয়েরিখ জগদীশচন্দ্রের গৃহে অতিথি হয়ে এসেছিলেন। সেই দলে তাঁর স্ত্রী এবং দুই পুত্র দার্জিলিঙের লেবঙে অবস্থিত 'হারমিটেজ কুটির'-এ কয়েকমাস অতিবাহিত করেন। দলটি মঙ্গোলিয়া এবং তিব্বতের মালভূমির মধ্য দিয়ে ভারতে এসেছিলেন। তাঁরা যখন জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁরা এসেছিলেন ঘোড়ায় চেপে, পায়ে ছিল বুট জুতো। দেখে মনে হলো ছবির মতো। আমাকে যখন তাঁরা নেমন্তন্ন করলেন, আমি খুশি হলাম। যখন দেখা করতে গেলাম অধ্যাপক রোয়েরিখ তাঁর সবেমাত্র শেষ করা কতকগুলি চিত্রশিল্প দেখিয়েছিলেন যার মধ্যে ছিল অনেকগুলি চিত্তাকর্ষক মঙ্গোলিয়ান ক্যাম্পের রাত্রিকালীন দৃশ্য যেখানে প্রতিটি চিত্রে একটি সাদা ঘোড়া হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য ছিল। এগুলি ছিল গৌতম বুদ্ধের দ্বিতীয়বার আগমন সম্পর্কে মঙ্গোলিয়ান পৌরাণিক উপাখ্যানের চিত্ররূপ।

জগদীশচন্দ্র মনীষী। তাঁর কাছে জীবনের চরম ধর্ম ছিল কর্ম। দেরাদুনের কাছে কলুঙ্গ দুর্গ দাঁড়িয়ে আছে। এককালে এই দুর্গে ইংরেজদের সঙ্গে দুর্গবাসী নেপালীদের এক অসম যুদ্ধ হয়েছিল। নেপালীদের সেনাপতি বলভদ্র থাপা লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন। শত্রু দুর্গ দখল করতে পারল না। অবশেষে বলভদ্র থাপা যখন দেখলেন যে, তাঁর গোলাবারুদ শেষ হয়ে আসছে তখন তাঁর সৈন্যদের আদেশ করেন ভোজালি দিয়ে শত্রুর মধ্যে পথ কেটে

পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হতে। এই যুদ্ধের কাহিনী জগদীশচন্দ্র বর্ণনা করেছিলেন 'অগ্নিপরীক্ষা' প্রবন্ধে। জগদীশচন্দ্রের কাছে কর্মবীর আদর্শবাদী কর্ণই হলেন মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বীর। এ কথা তিনি বহুবার বলেছেন। ভারতবর্ষে বহুদিন ধরে লোকের সামনে তিনটি যোগ তিনটি মার্গ উপস্থিত করা হয়েছে—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ। কিন্তু চিন্তা করলে প্রশ্ন জাগে যে জ্ঞানে কর্মের স্ফুরণ নেই সে জ্ঞানের মূল্য কি? যে ভক্তি জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত নয় এবং কর্মের পূরণ হয় না তার মূল্য কি? এবং যে কর্মের পেছনে মানুষের প্রতি ভক্তির অনুপ্রেরণা নেই এবং জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত নয় তারই বা মূল্য কি? এই তিনটি যোগকে পৃথক করা বিপদ। কেউ কেউ বলেন যে, অতীতে কেবলমাত্র একটিই যোগ ছিল—একটিই পথ, যার তিনটি অঙ্গ। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম। অতীতে এদেশে কিছু দার্শনিক যুক্তি দিয়েছিলেন, যেহেতু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কালে ও পরিমাণে অনন্ত এবং মানুষের জীবন ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তাই মানুষ এই বিশ্বকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। উপসংহারে তাই তাঁরা প্রস্তাব করেছিলেন যে, মানুষের এই বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা এবং তাঁর পরিবেশকে পরিবর্তন করার চেষ্টা বৃথা। জগদীশচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে বিশ্ব অনন্ত। কিন্তু তাঁরা কথায় এবং কাজে দেখিয়েছিলেন তাকে বোঝার চেষ্টা এবং পরিবেশ পরিবর্তন করার সংকল্প মানুষের শ্রেষ্ঠধর্ম।

[লেখকের ইংরেজী প্রবন্ধ থেকে পবিত্রানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় ও দিবাকর সেন-কর্তৃক অনূদিত। প্রবন্ধকার-কর্তৃক প্রবন্ধটির সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।]

বসু বিজ্ঞান-মন্দির ও তার রূপায়ণ

[আচার্য-ভবন থেকে]

বর্তমান প্রবন্ধে উপজীব্য বসু বিজ্ঞান-মন্দির—তার পরিকল্পনা ও রূপায়ণ। বিষয়টি জানতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। কারণ, বিজ্ঞান-মন্দিরের পরিকল্পনা হয় জগদীশচন্দ্রের প্রথম রয়াল সোসাইটিতে বক্তৃতার পর। জানা যায় পত্নী অবলা বসুর বর্ণনায়। বর্ণনাটি আজ জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা ও বিজ্ঞান-মন্দিরের পরিকল্পনার ঐতিহাসিক দলিল। তিনি লিখেছিলেন, "সভাপতির পার্শ্বে আমি বসিলাম, যে স্থানে ডেভি ও ফ্যারাডে বক্তৃতা দিতেন, সেই হলে ও সেই টেবিলে যখন এই তরুণ বাঙালী বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইলেন তখন আনন্দে আমার জীবন সার্থক মনে হইল। ভারতের জয়-পতাকা আবার নূতন করিয়া বিশ্বের সম্মুখে তোলা হইল, মনে করিলাম। অন্যান্য সভার রীতির মতন এই সভাতে বক্তার পরিচয় দেওয়ার রীতি নাই। কারণ এখানে যিনি বক্তৃতা দেন তাঁহাকে সকলেই জানে। সুতরাং ঘড়িতে নয়টা বাজিবামাত্র আচার্য বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এক ঘণ্টা নীরবে সকলে বক্তৃতা শুনিলেন এবং বক্তৃতা অন্তে সকলেই আচার্যকে ঘিরিয়া অভিবাদন করিলেন। লর্ড র‍্যালে বলিলেন যে, এরূপ নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কখনও হয় নাই,—দু'একটি ভুল হইলে মনে হইত যেন জিনিসটা বাস্তব; এ যেন মায়াজাল। আমি যখন আচার্যের সহিত ইংলণ্ডে যাই তখন জড়পিণ্ডবৎ ছিলাম। কিন্তু এই সব লোকের সংস্পর্শে আসিয়া দেখিতে দেখিতে অনেক শিখিলাম। এই রয়াল ইন্‌স্টিটিউশনের কার্যপদ্ধতি দেখিয়া তখন হইতেই আমাদের দেশে এরূপ কোন স্থান করিবার বাসনা আমার মনেও উদয় হইল এবং বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের সূচনা ও কল্পনা তখন হইতেই আরম্ভ হইল।"

দেশে ফিরলেন জগদীশচন্দ্র। বিদ্যুৎ তরঙ্গ-গ্রাহক যন্ত্র 'কোহেরার'-এর উন্নততর আবিষ্কারের কাজে হাত দিলেন। এতদিন পর্যন্ত বিদ্যুৎ তরঙ্গ-গ্রাহক যন্ত্র হিসাবে যে-সব যন্ত্রের চল ছিল, সেগুলোতে অর্ধপরিবাহী স্ফটিক (Semi-conducting crystal) ব্যবহারের চল ছিল না। প্রায় সবই ছিল প্রথম আবিষ্কৃত কোহেরার যন্ত্রের কমবেশী উন্নততর মডেল। জগদীশচন্দ্র অর্ধপরিবাহী স্ফটিককে গ্রাহক যন্ত্র হিসেবে কাজে লাগালেন। 'গ্যালেনা' নামে এক ধরনের স্ফটিক ব্যবহার করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। হঠাৎ এ সময়ে একটি অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে গেল। তারিখটি ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ২৭-এ ডিসেম্বর। কলকাতায় এসেছেন জগদীশচন্দ্রের প্রাক্তন অধ্যাপক বিলেতের রয়াল সোসাইটির অন্যতম সদস্য বৈজ্ঞানিক লর্ড র‍্যালে। তিনি হাজির হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। জগদীশচন্দ্রের গবেষণা খুঁটিয়ে দেখলেন। কাজের

প্রশংসা করলেন। উৎসাহ দিলেন প্রচণ্ডভাবে। কিন্তু, সেদিন বিকেলেই জগদীশচন্দ্র একটি চিঠি পেলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্যাডে লিখেছেন প্রিন্সিপাল। অনেকটা চার্জশীট গোছের। তাতে লেখা—I learn from Lord Rayleigh that he visited the Presidency College this morning and inspected the laboratory over which he was shown by you. I should be glad to hear by what authority you have received outsiders into the laboratory……"

প্রতিবাদ করলেন জগদীশচন্দ্র। এতে ফল হলো বিপরীত। গবেষণার কাজ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এলেন। এ কথা জানা যায় ত্রিপুরার মহিমচন্দ্র দেববর্মণের 'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থে। তিনি লিখেছিলেন, "একদিন রবিবাবুর তলবে জগদীশবাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, প্রাইভেট কার্যে কলেজের বিজ্ঞানাগার ব্যবহার করা কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্রের গবেষণাকে কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত কাজ হিসেবেই চিহ্নিত করেছিল)। রবিবাবু ইহাতে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন। বিশেষত বুঝিলেন, জগদীশবাবুর নিজের বিজ্ঞানাগার না হইলে তাঁহার বিজ্ঞানের নূতন তথ্য আবিষ্কারের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। পরামর্শ হইল ২০,০০০ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। ১০,০০০ টাকা রবিবাবু নিজের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন। বাকী টাকার জন্য ত্রিপুরার দরবারে ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইবেন।"

কিন্তু এত পরিশ্রম সত্ত্বেও বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা তখনই বাস্তবে রূপায়ণ সম্ভব হলো না। কেটে গেল অনেকগুলো বছর নানান কাজে ও নিজের বৈজ্ঞানিক মতকে স্থায়ী রূপ দিতে। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ৩০-এ নভেম্বর তারিখে জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর নিলেন। তবে পুরোপুরি ভাবে নয়। কলেজের পরিচালক সমিতি এক সভায় তাঁর কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছরের জন্য বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, জগদীশচন্দ্রকে কলেজের Emeritus Professor হিসেবে কাজ করতে হবে।

এবার জগদীশচন্দ্র বহু আকাঙ্ক্ষিত বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দিলেন। সাধারণত দেখা যায়, অতীত সংকল্প যখন বাস্তবের কাছাকাছি আসে তখন সংকল্পের সামর্থ্যে ঘাটতি পড়ে। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের কাছে তা হলো বিপরীত। তিনি সমস্ত জীবনের কষ্টার্জিত সঞ্চয়কে একত্রিত করে বিজ্ঞান-মন্দির তৈরীর কাজ শুরু করলেন। আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা চেয়ে চিঠি দিলেন শুভানুধ্যায়ীদের। জগদীশচন্দ্র তাঁর শিক্ষক অধ্যাপক ভাইনস্‌কে লিখলেন, দেশের ভাবীকালের অনাগত বিজ্ঞানকর্মীরা যেন তাঁর মত অসহায় অবস্থার সম্মুখীন না হয়, সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই তিনি বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করতে
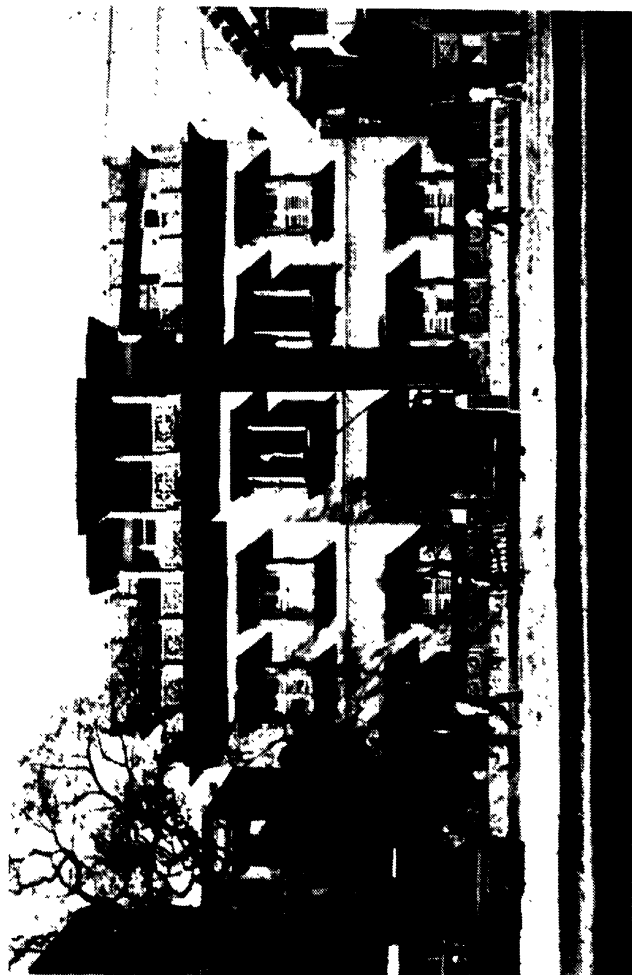
আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বসু বিজ্ঞান-মন্দির

চলেছেন। তিনি আরও বললেন, "আমার স্ত্রী ও আমি এই গবেষণাগারের জন্য সর্বস্ব দান করছি।" প্রস্তুতি পর্বের শেষ লগ্নে বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে আমেরিকা যেতে হয়। তিনি সেখান থেকে জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন, "তোমার বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে আমি যদি থাকতে পারতুম তা' হ'লে আমার খুব আনন্দ হ'ত। বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে আনেন তা' হ'লে তোমার এই বিজ্ঞান-যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে এ কথা মনে রইল। এতদিন যা তোমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল আজকে তার সৃষ্টির দিন এসেছে। কিন্তু এ ত তোমার একলার সঙ্কল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের সঙ্কল্প, তোমার জীবনের মধ্য দিয়ে এর বিকাশ হ'তে চলল। জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের উদ্বোধন হয়—তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী করে দিয়ে যাবে—তারপর থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই সে এগিয়ে চল্‌তে থাকবে।......"

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে নিজের জন্মদিন ৩০-এ নভেম্বর তারিখে বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব শুরু হল বিজ্ঞান-মন্দিরের সদ্যনির্মিত বক্তৃতাশালায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তৃতা মঞ্চের নীচে দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্য রবীন্দ্রনাথ-রচিত সঙ্গীতটি :

"মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন
কর মহোজ্জ্বল আজ হে!
শুভ শঙ্খ বাজ হে বাজ হে···।"

মঞ্চটির ডান পাশে তাম্রফলকে জগদীশচন্দ্রের হস্তাক্ষর অনুসরণে লেখা—

"ভারতের গৌরব ও জগতের
কল্যাণ কামনায়
এই বিজ্ঞান মন্দির
দেব চরণে নিবেদন করিলাম"

১৪ই অগ্রহায়ণ সংবৎ ১৯১৭ শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

ঠিক সন্ধ্যে ছ'টা। জগদীশচন্দ্র তাঁর ভাষণে বললেন, "বাইশ বৎসর পূর্বে যে স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম তাহা এতদিন পরে দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে।......কি সেই মহাসত্য যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও আরাধনা কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না; তখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু যাঁহারা কর্মসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে

মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদেরই জন্য।......"

"বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণও এদেশে কোনদিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্বে অন্ধকার দিনে এই সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন, সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথপ্রদর্শকও কেহ ছিল না। বহু বৎসর ধরিয়া একাকী তাহাকে প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এতদিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে।"

"......যে-সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা কি একজনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটি মাত্র বিষয়ের জন্য বীক্ষণাগার নির্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়; আর এইরূপ অতি বিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞানের বিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, এ কথা বিজ্ঞজন মাত্রেই বলিবেন। কিন্তু আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলেই চিরজীবন চলিয়াছি; ইহা তাহারই মধ্যে অন্যতম। 'হইতে পারে না' বলিয়া কোনদিন পরাঙ্মুখ হই নাই; এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্যেই নিয়োগ করিব।......"

বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের ছাত্রদের উদ্দেশে বললেন, "...জীবন সম্বন্ধে একটি মহাসত্য এই যে, যেদিন হইতে আমাদের বাড়িবার ইচ্ছা স্থগিত হয় সেইদিন হইতেই জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধে একই কথা। যেদিন হইতে আমাদের বড়ো হইবার ইচ্ছা থামিয়াছে সেদিন হইতেই আমাদের পতনের সূত্রপাত হইয়াছে।..." "জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, শক্তি সঞ্চয় দ্বারাই জীবন পরিস্ফুটিত হয়। তাহা কেবল নিজের একাগ্র চেষ্টা দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে, যে কোনরূপ সঞ্চয় করে না, যে পরমুখাপেক্ষী, যে ভিক্ষুক, সে জীবিত হইয়াও মরিয়া আছে।......"

"......এজন্য কেবল অল্প কয়েকজনকে আহ্বান করিতেছি। দু-এক বৎসরের জন্য নহে; সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনার জন্য।...মানসিক শক্তিতেই জীবনের চরমোচ্ছ্বাস। দেখ, তাহারই বলে এই পুণ্য দেশ সঞ্জীবিত রহিয়াছে। সেবা দ্বারা, ভক্তি দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা মানুষ একই স্থানে উপনীত হয়। তোমরাও তাহার একটি পথ গ্রহণ করো।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রথম ছাত্ররা ছিলেন—গুরুপ্রসন্ন দাস, সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস, নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, বশীশ্বর সেন, জ্যোতিপ্রকাশ সরকার,

নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সত্যেন্দ্রচন্দ্র দে, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্র-চন্দ্র গুহ।

কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। তার সবল স্থায়িত্ব রক্ষা করাও অতি দুরূহ ব্যাপার। বিশেষত যেখানে কোন পরাধীন দেশের নাগরিক দাবী করে বসেন, প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির সদস্য হতে প্রাথমিক যোগ্যতা হলো সদস্যকে দেশের সন্তান হতে হবে। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করেই প্রথমে একটি তত্ত্বাবধায়ক সমিতি গঠন করলেন। সমিতির সদস্য হলেন জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবলা বসু, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (Lord Sinha), নীলরতন সরকার, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সুধাংশুমোহন বসু ও সতীশরঞ্জন দাশ (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতা)। জগদীশচন্দ্র কিছুদিনের মধ্যেই বিজ্ঞান-মন্দিরের কর্মধারাকে বিধিসম্মত করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সমিতির একটি নিয়ামকমণ্ডলী গঠন করলেন। এই নিয়ামকমণ্ডলীর সদস্যরা হলেন জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবলা বসু, নীলরতন সরকার, সুধাংশুমোহন বসু, শীতলরঞ্জন দাস, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, বনোয়ারীলাল চৌধুরী। কোন ইংরেজ প্রতিনিধি নিয়ামক-মণ্ডলীতে নেওয়া হলো না, বরং ঘোষণা করা হলো, বিজ্ঞান-মন্দিরের কোন ব্যাপারে সরকারের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। এ ছাড়াও তিনি এক অছি পরিষদ গঠন করে বললেন,—

"In founding the Institute I contributed about 5 lakhs for land, building and equipment ; I also made over to the Institute 1 lakh of rupees in G. P. notes for Endowment. My residuary property worth about 6 lakhs, will under my will be subsequently made over to the Institute. My total contribution will therefore be about 12 lakhs of rupees. Donations have also been received from the public."

বিজ্ঞান-মন্দিরের কাজকর্ম চালাতে আরো অনেক অর্থের প্রয়োজন। সরকারের তরফ থেকে ভারত সচিব এক চিঠিতে জানালেন, কিছু অর্থসাহায্য হয়তো বিজ্ঞান-মন্দিরকে দেওয়া যেতে পারে ; তবে তা দেওয়া হবে, জনগণের তরফ থেকে কি পরিমাণ সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য আসে তার ভিত্তিতে। জগদীশচন্দ্র আবেদন করলেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে। বললেন, "আমার স্বোপার্জিত অর্থে পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্ব শুরু হয়েছে মাত্র। এই মন্দিরের বৈজ্ঞানিক কর্মধারাকে আমি বহুদূর প্রসারিত করতে চাই। তার জন্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।" অর্থসাহায্যে সামিল হলেন দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ। রাজা-মহারাজা, ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দীনদরিদ্র কেউ বাদ গেলেন না। এঁদের মধ্যে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজা গায়কোয়াড়, বোমনজী, মূলরাজ খাটাউ-এর ভূমিকা বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া, এগিয়ে এলেন মহাত্মা গান্ধী ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা। জগদীশচন্দ্রও থেমে রইলেন না। অর্থসংগ্রহের জন্য জানুয়ারি ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু করলেন ধারাবাহিক বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রদর্শনের ব্যবস্থাও। টিকেটের মান ধার্য হল ২৪ টাকা, ১২ টাকা, ৮ টাকা ও ৪ টাকা। আর, একটি বক্তৃতা শোনার জন্য দুটাকা ও এক টাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আজকের এই অপসংস্কৃতির যুগে অবাক লাগে, বিজ্ঞানের বক্তৃতা ও পরীক্ষা দেখবার কোন টিকেটই পড়ে থাকতো না। বিজ্ঞান-মন্দিরের বক্তৃতা কক্ষে বক্তৃতা শুরুর অনেক আগেই বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের সামনের রাস্তা পরিপূর্ণ হয়ে যেত। দেখা যেত শুধু মানুষের ভীড় সামলাবার জন্য বিপ্লবী পুলিন দাস ও তাঁর সহযোগীরা হিমসিম খেতেন। এই ধারাবাহিক বক্তৃতাগুলির মধ্যে "Life Unvoiced", "Invisible Light", "Universal Sensitiveness of Matter", "Photo-dynamics" এবং "The Electric Response of Plants" বক্তৃতাগুলি আজ অমর বক্তৃতা-গুচ্ছে পরিণত হয়েছে। এই বক্তৃতামালা ছাড়াও জগদীশচন্দ্র অর্থ সংগ্রহের জন্য অন্য একটি ব্যবস্থা করলেন। বললেন, বিজ্ঞান-মন্দিরের আজীবন সদস্য হিসেবে এককালীন ৫০০ টাকা ও 'Life Associate' হিসেবে ২৫০ টাকা বিজ্ঞান-মন্দিরকে দান করলে আজীবন বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের সমস্ত অনুষ্ঠানে দুটি আমন্ত্রণ পত্র ও বিজ্ঞান-মন্দির থেকে গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হলে একটি করে পত্রিকা পাওয়া যাবে। এতেও বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ হলো।

এরই মধ্যে জগদীশচন্দ্র রওনা হলেন বোম্বাই ও জম্মু শহরে। উদ্দেশ্য, বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ। সঙ্গে নিয়ে গেলেন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রপাতি। এই উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী 'Young India' কাগজে লিখলেন,

"All Indians are proud to claim Sir Jagadish as a country-man because he is not only one of the greatest scientists of the world but a time will come when his discoveries will revolutionise the industries of the world. The Bose Institute of Calcutta is destined to fill a great place in the world. Now it is for the citizens of this great city to give the Indian Scientist who has carried the fame of India all over the world such a welcome as will redound to the honour and glory of Bombay."

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরবর্তী কালে জগদীশচন্দ্র এক চিঠিতে বিজ্ঞান-মন্দির রূপায়ণে মহাত্মা গান্ধীর সাহায্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি লিখেছিলেন,

"I remember how prominent a part you took in the foundation of the Institute eleven years ago......"

নাগপুর মেল এসে থামলো বোম্বাই শহরের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে। স্টেশনে জগদীশচন্দ্র ও পত্নী অবলা দেবীকে সংবর্ধনা জানাতে অগণিত ছাত্র ও সাধারণ মানুষ আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন। ২১-এ জানুয়ারি ১৯১৮ তারিখে বক্তৃতার দিন ধার্য হলো রয়াল অপেরা হাউজে। অনুষ্ঠান শুরুর আগে শ্রোতাদের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বাল গঙ্গাধর তিলক বললেন, "জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের জন্য শুধু আমরা ভারতবাসীরা গর্বিত নই; সমস্ত পৃথিবী তাঁর জন্য গর্বিত।" জগদীশচন্দ্র 'Invisible Light'-শীর্ষক বক্তৃতাটি পরীক্ষা সহযোগে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বক্তৃতা উপলক্ষে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্য উঠেছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। এই অভাবনীয় সাড়ায় তৎকালীন 'Hindi Punch' পত্রিকা বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের চিত্র সহযোগে 'Well of knowledge' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে তাঁরা লেখেন, "The people of Bombay—men, women and children—have lost their heart at advent of Sir J. C. Bose and Lady Bose. Thou powerful alchemist! To coin Rs. 50,000 at one lecture! We knew him as a wizard in Science, but did not realise the witchery of his tongue! Such wild enthusiasm has never been recorded. Bravo Sir Jagadish, bravo the Bombay worshippers of knowledge, bravo the Bose Reseasch Institute!"

আরো কিছু অর্থসংগ্রহ ও বক্তৃতার পর জগদীশচন্দ্র কলকাতায় ফিরলেন। এক বছরের মধ্যে প্রকাশ করলেন প্রাপ্ত দানের তালিকা—বসু বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনার উদ্যোগ পর্ব থেকে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। তালিকাটি জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তি-চরিত্রের দিক থেকেও অনুধাবনযোগ্য। দানের অঙ্ক দু'লাখ টাকা থেকে এক টাকা পর্যন্ত ছিল। তিনি কোন দাতাকেই অবহেলা করেন নি। তালিকাটি প্রস্তুত করেছিলেন টাকার অঙ্কের ভিত্তিতে নয়। প্রাপ্ত তারিখের ভিত্তিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জনসাধারণের দানের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "A note that touched me deeply came from some girl students of the Western Province, enclosing their little contribution for the Service of our common mother land."

১৯১৮ পর্যন্ত প্রাপ্ত দানের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র:

১.	এস্. আর. বোমনজী	এক লক্ষ টাকা
২.	মূলরাজ খাটাউ (মূলরাজ খাটাউ জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্য অস্থত্র টাকা লগ্নী করেছিলেন। শর্ত ছিল, লগ্নীকৃত টাকার শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রাপ্য)	১২ হাজার ২২১ টাকা

৩. মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী — দুই লক্ষ টাকা
৪. মহারাজা গায়কোয়াড় (লগ্নীকৃত ১,২৫,০০০ টাকার সুদ) — ৬,২৫০ টাকা (নিয়মিত বার্ষিক)
৫. জনগণ ও ছাত্র সমাজের দান (বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রথম মুখপত্রে প্রত্যেক দাতার নাম ও আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ মুদ্রিত আছে) — ২১,১৮৯ টাকা
৬. বোম্বাই সফরের সময় জনগণ ও ছাত্র সমাজের দান (বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রথম মুখপত্রে দাতার নাম ও আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ মুদ্রিত আছে) — ৪৩,৪৩৫ টাকা

এই সব দান ছাড়াও দান হিসেবে তিনটি নিয়মিত ছাত্রবৃত্তির উল্লেখ রয়েছে মূল তালিকায়। ইতিমধ্যে জনগণের অভূতপূর্ব সাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কিছুটা সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েছিলেন। এবার বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রসারণের জন্য গবেষণাগার সংলগ্ন আরও কিছু জমির ব্যবস্থা করে দিলেন। দু'টি ছাত্রবৃত্তিও সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হলো। কলকাতা কর্পোরেশন ঘোষণা করলেন, বসু বিজ্ঞান-মন্দিরকে কোনদিন পৌরকর দিতে হবে না।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ; এই দীর্ঘ কুড়ি বছর বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের ইতিহাসকে গঠনের ইতিহাস হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মাঝে কখনও কম, কখনও কিছু বেশী সরকারী সাহায্য এসেছিল বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্য। তাতে বিজ্ঞান-মন্দিরের কর্মধারা ব্যাহত হয় নি। জনগণ ও বিজ্ঞানী সমাজের অকুণ্ঠ সমর্থন বরাবর একই রকম ছিল। একথা জানা যায় তখনকার পত্র-পত্রিকায় ও চিঠিপত্রে।

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'Nature' পত্রিকায় বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের কার্যবিবরণী বর্ণনা প্রসঙ্গে পত্রিকা-সম্পাদক লিখলেন, **"The Prime Minister paid a tribute to Sir J. C. Bose's achievements as a Scientific worker. The growth of the Bose Institute proves also that India possesses men of great public spirit......"**

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের সরকারী অর্থসাহায্য বাড়িয়ে দেবার জন্য লণ্ডনের বিজ্ঞানীমহল ভারতের গভর্নর জেনারেলকে এক খোলা চিঠিতে বলেন, ...**We venture, therefore, to express the opinion that the Government of India will be well advised to continue and extend its assistance for the expansion of the Institute......** । স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে **Sir Charles Sherrington**

(President of Royal Society), E. F. Starling (Professor of Royal Society), Sir James Frazer F.R.S., Lord Rayleigh F.R.S., Sir Oliver Lodge F.R.S., Sir St. Clair Thomson (President, Royal Society of Medicine) ছাড়াও আরো অনেক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা ছিলেন।

এসব চিঠিপত্র ও সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতেও সরকারী অর্থ সাহায্য বাড়ে নি। যদিও ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরকে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা অনুদান মঞ্জুর করে তদানীন্তন ভারত সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, ভবিষ্যতে অর্থসাহায্য বাড়ানো হবে। তবে এসময় বিজ্ঞান-মন্দিরের আশ্চর্য কার্যকলাপে মুগ্ধ দেশবাসী বিজ্ঞানাগারের কর্মধারাকে প্রসারিত করতে অর্থসাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন।

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ। ভারত সরকার এক চিঠি পাঠালেন জগদীশচন্দ্রকে। জানালেন অনিবার্য কারণে বিজ্ঞান-মন্দিরের আর্থিক সাহায্য কমানো হবে। সেদিন এই সমস্যা মোকাবিলায় প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের ছাত্র ও কর্মীরা। তাঁরা ১১ই আগস্ট তারিখে এক চিঠিতে জগদীশচন্দ্রকে সমস্যা মোকাবিলার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাঁদের প্রাপ্য মাসিক বৃত্তি ও মাইনে কমিয়ে দিতে অনুরোধ করেছিলেন।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩-এ নভেম্বর। একটি চিরস্মরণীয় যুগের অবসান হলো। জগদীশচন্দ্র মারা গেলেন। বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের কর্ণধার হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পালিত অধ্যাপক' দেবেন্দ্রমোহন বসু। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয়। নতুন দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েই তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম জানিয়ে লিখলেন, "বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবার প্রারম্ভে আমি আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। আপনার হয়তো মনে না থাকিতে পারে যে, ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন আমার মামার কাছে বিজ্ঞানের কাজ আরম্ভ করি, সেই সময়ে তিনি আমাকে আপনার কাছে লইয়া যান। সেইদিন আমার বিজ্ঞানে প্রথম দীক্ষা হইল। সেইদিনের কথা স্মরণ করিয়া আজ আপনাকে প্রণাম জানাইতেছি।"

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ জানিয়ে দেবেন্দ্রমোহনকে লিখলেন, "বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের পৌরোহিত্য ভার তুমি গ্রহণ করেছ এই শুভ সংবাদে আমার মন একান্ত আশ্বস্ত হয়েছে। সাধনার প্রদীপে তুমি নতুন শিখা জ্বালিয়ে তুলবে সন্দেহমাত্র নেই। দেশের কল্যাণে সার্থক হোক তোমার মহৎ অধ্যবসায়। এই আমার সর্বান্তঃকরণের কামনা।"

১৯৩৭ থেকে ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দ। দীর্ঘ ত্রিশ বছর দেবেন্দ্রমোহন বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের কর্ণধার ছিলেন। শুধু সংরক্ষণই নয়, বিজ্ঞান-মন্দিরকে সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব তিনি নিজ হাতে নিয়েছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিজ্ঞান-

মন্দিরে, নতুন নতুন বিষয়ের গবেষণার সূচনা করেন। কাজগুলো আন্তর্জাতিক খ্যাতিও লাভ করে। সেই সুবাদে ভারতবর্ষে কিছু কিছু নতুন বিজ্ঞান ধারার পথিকৃৎ হিসেবে বসু বিজ্ঞান-মন্দির চিহ্নিত হয়েছিল। আজ সময়ের ব্যবধানে জগদীশ-উত্তর বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের সম্প্রসারণ ও কাজের ধারা খুঁটিয়ে বিচার করলে অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহনকে প্রতিষ্ঠাতার একনিষ্ঠ ধারক ও বাহক হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়। কারণ জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, "ক্রমবিকাশোন্মুখ বিজ্ঞানের অসংখ্য সমস্যা নিয়ে পূর্ণতর তথ্যানুসন্ধানে ব্রতী হতে হবে।..."

[দ্রষ্টব্য :—সম্প্রতি দু-একজন বলেছেন, নিবেদিতা বসু বিজ্ঞান-মন্দির সৃষ্টির মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতাই এ-ধরনের প্রচারের কারণ।]

নির্দেশিকা

১. বাঙালী মহিলার পৃথিবী ভ্রমণ—অবলা বসু
২. জগদীশ সংগ্রহ (চিঠিপত্র)—আচার্য ভবন
৩. চিঠিপত্র (রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড)
৪. জগদীশ সংগ্রহ পাণ্ডুলিপি—(আচার্য ভবন)
৫. 'অব্যক্ত'—নিবেদন
৬. **First Transactions of the Bose Research Institute**
৭. **Capital, Nov. 29, 1982**
Jagadish Ch Bose (The beginning of modern Science—D. Bose)
৮. শ্রদ্ধাঞ্জলি—৭ই আষাঢ়, ১৩৮২ (অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসুর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রকাশিত)
৯. **13th anniversary No. of the Calcutta Municipal Gazette, 1937**

[এই প্রবন্ধটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে ২৯-এ এপ্রিল, 1983 তারিখের 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত।]

ভারতে বিজ্ঞান-চেতনা ও জগদীশচন্দ্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ভারতবর্ষ চিরকাল যে শুধু ধর্ম, আচার, অনুষ্ঠান নিয়েই আছে তা নয়। ইতিহাসের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখি যে, পৃথিবীর বহু দেশের আগেই ভারতবর্ষেই বহু দিক থেকে বিজ্ঞানমনস্কতা ছিল। দু'চারটি উদাহরণ হিসেবে বর্ণমালার শব্দগত বিশ্লেষণ ও বিন্যাস এবং গণিতের 'শূন্য' আবিষ্কারের সূচনা যে এই ভারতবর্ষেই হয়েছে সেকথা স্মরণ করা যায়। সে-সব অতীতে যাই হয়ে থাক, বহু যুগ ধরে ভারতবর্ষ তার সেই বিজ্ঞানমনস্কতা হারিয়ে ব্যষ্টি ও সমাজজীবনে অন্ধ কুসংস্কারের শিকার হয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সাগরপারের বিদেশীদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ও সংঘর্ষে নিজেদের স্বাধীনতা হারালেও পাশ্চাত্ত্য জগতের নতুন বিজ্ঞানভাবনার সঙ্গে আমাদের তখনই প্রথম পরিচয় হয়। উনবিংশ শতাব্দীতেই এই নতুন বিজ্ঞানচেতনার দীপ্তি যে-ক'জন ভারতীয়ের মধ্যে প্রথম দেখতে পাই এই বঙ্গভূমির সন্তান জগদীশচন্দ্র তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। যে-তীব্র বিজ্ঞানের কৌতূহল নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন, তা তাঁকে বস্তুজগতে কোন একটি বিশেষ রহস্যের উদ্ঘাটনে যেন তন্ময় হয়ে থাকতে দেয় নি। পারলে সমস্ত দেশের হয়ে তিনি যেন তাঁর সময়কার প্রায় সর্বদিকের বিজ্ঞানসাধনার সাধক হতেন।

সামান্য যে-টুকু জানি তাতে তখনকার অভাবিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তড়িৎ-তরঙ্গের (যাকে আমরা এখন বেতার তরঙ্গ বলি) ক্রিয়ার রহস্য সন্ধান ও তার প্রয়োগ-কৌশল উদ্ভাবন থেকে শুরু করে উদ্ভিদজগতের স্নায়ুতন্ত্র আবিষ্কার পর্যন্ত কত দিকে যে তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন কাজ করেছে তার পরিচয় পেলে বিস্মিত হতে হয়।

বিজ্ঞান-ভিত্তিক সাহিত্য রচনাতেও তিনি অনন্য অগ্রপথিক। তাঁর রচিত প্রবন্ধ-সংগ্রহ 'অব্যক্ত' গ্রন্থখানি আমার মতে বর্তমানকালের বিজ্ঞানসাহিত্যে আদর্শরূপে গণ্য হতে পারে। বিজ্ঞান-সাধনায় কী ধরনের বাধা ও প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সেকালে তাঁকে যুজতে হয়েছিল সেকথা ভাবলে তাঁর কৃতিত্বের যথাযোগ্য মূল্য আমরা বুঝতে পারি। এখনকার দিনের বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান-সাধনার পথ একেবারে মসৃণ ও নিষ্কণ্টক তা বলছি না। কিন্তু জগদীশচন্দ্রকে সে-যুগে যে-ভাবে তাঁর বিজ্ঞান তপস্যায় নিরত থাকতে হয়েছে তার সঙ্গে এখনকার তুলনা করলে একটা উপমার কথাই মনে আসে। এখনকার বৈজ্ঞানিকদের অসুবিধা যতই থাক, রন্ধনকার হিসেবে ধরলে তাঁরা একটি রন্ধনশালা ও তৈজসপত্রের সঙ্গে রান্নার উপকরণ ও জলন্ত একটা উনুন অন্তত পেয়ে থাকেন। কিন্তু সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বলতে হয় যে,

জগদীশচন্দ্রকে রন্ধনশালা থেকে শুরু করে তার যাবতীয় উপকরণ যেন নিজে থেকে সংগ্রহ ও নির্মাণ করতে হয়েছে।

উদ্ভিদ-বিষয়ক গবেষণায় যে-সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র তিনি ব্যবহার করেছেন তা তিনি শুধু উদ্ভাবনই করেন নি, সাধারণ কারিগরের অপটু হাত দিয়ে তা নির্মাণও তাঁকেই করাতে হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-সাধক হিসেবে যেন একটি নতুন মহামানব গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে বলে আমরা দেখতে পাই। অসীম সৃষ্টিরহস্যের একান্ত ও অক্লান্ত গূঢ় সত্যসন্ধানী হিসেবে জাতিধর্ম নির্বিশেষে এঁরা সমস্ত মানব সমাজের নমস্য। জগদীশচন্দ্র এই চিরনমস্যদেরই একজন, এই আমাদের গর্ব এবং তাঁর জীবনাদর্শই আমাদের চিরন্তন প্রেরণা।

রমঁ্যা রলঁা ও জগদীশচন্দ্র বসু

অবন্তীকুমার সান্যাল

রমঁ্যা রলঁার ভারত-মনস্কতা আজন্মকালের হলেও তা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের পরিচয় লাভের পর থেকে। প্রথম মহাযুদ্ধের বিরোধিতায় রলঁা সঙ্গী পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর বিখ্যাত যুদ্ধবিরোধী পুস্তিকা 'জনগণের হত্যাকারী'-র সঙ্গে তিনি ছেপেছিলেন রবীন্দ্রনাথের (অনুমতি না নিয়েই) টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার মার্কিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন 'জাপানের উদ্দেশে ভারতের বাণী'। যুদ্ধের পর রলঁা পড়েছিলেন আর এক নতুন মানসিক ও নৈতিক সংকটে। রুশ বিপ্লবকে তিনি সমর্থন করেছিলেন, অকুণ্ঠ সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী বিপ্লবী কর্মপন্থাকে সমর্থন করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। বিপ্লবের মত ও পথ এবং বিপ্লবে বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব সম্পর্কে আঁরি বারব্যুস ও 'ক্লার্তে' গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁকে তিক্ত বিতর্কে নামতে হয়েছিল। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে তিনি আর একবার (২০ এপ্রিল, ১৯২২) স্বেচ্ছা-নির্বাসনের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন সুইজারল্যাণ্ডকে। সেখানে লেমঁা হ্রদের তীরে ভিলন্যুভ গ্রামে ভিলা অলগা-র নির্জনতায় তিনি সাম্প্রতিক ভারত সম্পর্কে গভীর অনুশীলন করতে থাকেন। এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হতে থাকে অসংখ্য ভারতীয়ের। খ্যাত-অখ্যাত যে-কোনো ভারতীয় ছিল তাঁর সম্মানিত অতিথি, ভারতের প্রতিটি সংবাদ ছিল তাঁর কৌতূহলের বস্তু। প্রকৃতপক্ষে এই পর্বে রমঁ্যা রলঁা যেন ভারতকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন। পনের বছর পরে তিনি এ প্রসঙ্গে নিজেই লিখেছিলেন:

> লেমঁা হ্রদের তীরে এসে বাস শুরু করার পর কয়েক বছর ধরে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গান্ধী, লাজপৎ রায়, জওহরলাল নেহরু, ডাঃ আনসারী, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ ভারতের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলাম। ...রবীন্দ্রনাথ ও স্যার জগদীশচন্দ্রের বন্ধুত্ব, কালিদাস নাগ ও লাজপৎ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ভারতের সঙ্গে প্রচুর পত্র বিনিময় এবং বাংলাদেশের পত্রিকাগুলো পাঠ করার ফলে আমি ভারতীয় মনে আরও গভীরভাবে প্রবেশ করলাম। সে মনের সঙ্গে আমার মনের কোনো কোনো বিষয়ে গভীর সাদৃশ্য দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। আমার ভাবজগতের এমন অনেক রহস্যলোক ছিল যাদের এত দিন ভেবে এসেছি কেবলমাত্র ফরাসী চিন্তা-জগতেরই জিনিস, সেদিন দেখলাম ভারতে তারও দোসর মেলে।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর সঙ্গে রমঁ্যা রলঁার পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় এবং দীর্ঘকালের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ধারাবাহিক

বিবরণ আছে রলাঁর 'ভারতবর্ষ-দিনপঞ্জী'তে ও রবীন্দ্রনাথ-রলাঁ পত্রাবলীতে। রলাঁর পরিকল্পিত জীবনীগ্রন্থ রচনার তালিকায় রবীন্দ্রনাথের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু সে জীবনী রচনা করে উঠতে না পারলেও, রলাঁ লিখেছিলেন, গান্ধীর জীবনী (পরে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের)—যে গ্রন্থের কল্যাণে স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী আধুনিক ভারত ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক পরিচিতির সুযোগ লাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর সঙ্গে আর যে ভারতীয়কে রলাঁ একাসনে বসিয়েছিলেন তিনি জগদীশচন্দ্র বসু। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রলাঁর পরিচয় ও তাঁর মতামত সম্পর্কিত তথ্যাদি আমাদের খুবই কম জানা।

রমাঁ রলাঁর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের প্রথম যোগাযোগ পত্রের মাধ্যমে। ১৯২৩-২৪ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র ইউরোপে ষষ্ঠবার বৈজ্ঞানিক অভিযানে বেরিয়েছিলেন। লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ, প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়, ড্যানিশ বোটানিক্যাল সোসাইটি, কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়, লণ্ডন ইম্পিরিয়াল কলেজ এবং লণ্ডন রয়্যাল সোসাইটি অব মেডিসিনে তিনি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল: 'উদ্ভিদের পরিপাক ক্রিয়া ও রস সঞ্চালন'। ইণ্ডিয়া অফিসে লর্ড হার্ডিঞ্জ, জর্জ বার্নার্ড শ' প্রমুখ শ্রোতৃবৃন্দের সামনে 'উদ্ভিদের বৃদ্ধির ঘটনাবলী' সম্পর্কে এক বক্তৃতা করেন। পারীর ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম এবং পারী বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি বক্তৃতা করেন ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে। দেশে ফেরার আগেই পারী থেকে একটি চিঠি লেখেন (২৮ মার্চ) সুইজারল্যাণ্ডে অপরিচিত রমাঁ রলাঁকে। চিঠির সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন তাঁর ইংরেজি পুস্তিকা 'সারকুলেশন অ্যাণ্ড অ্যাসিমিলেশন অব প্ল্যাণ্টস্'। চিঠিতে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন: 'মহাত্মা গান্ধী এবং কবি রবীন্দ্রনাথ আমার শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিগত বন্ধু'। তাঁর সংক্ষিপ্ত চিঠিটি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে রলাঁর দিনপঞ্জীতে।

এর আগে জগদীশচন্দ্রের নামের সঙ্গে রলাঁ পরিচিত হলেও তাঁর বৈজ্ঞানিক কর্ম সম্পর্কে মোটেই পরিচিত হবার সুযোগ পান নি। এবারে তিনি জগদীশচন্দ্রের পুস্তিকা এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন আলোচনা সংগ্রহ করে পড়তে শুরু করলেন। দেশে ফিরে গিয়ে জগদীশচন্দ্র আর একখানি হৃদ্যতাপূর্ণ চিঠি লিখেছিলেন (২০ মে) রলাঁকে। তাতে তিনি রলাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কলকাতায় নিজের বাড়িতে। সেই সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন দুটি গ্রন্থ: 'রেস্পনস্ ইন দ্য লিভিং অ্যাণ্ড নন্-লিভিং' (১৯০২) এবং প্যাট্রিক গেডেসের 'দ্য লাইফ অ্যাণ্ড ওয়ার্ক অব্ স্যার জে. সি. বোস'। গেডেসের বইটি ছোট বোন মাদলিনের সাহায্যে পড়ে রলাঁ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন।

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে আরও তিন বছর পরে ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে। এই তিন বছরে ভারত সম্পর্কে রলাঁর কৌতূহল পরিণত হয়েছে প্রখর দায়িত্ববোধে। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি মহাত্মা গান্ধীর জীবনী লিখেছেন; ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ইতালি প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথকে মুসোলিনির মোহমুক্ত করেছেন; তার পর থেকে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনী রচনার আয়োজন করেছেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে তিনি জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব ও সাধনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছেন, চাক্ষুষ দেখা না হলেও মনে মনে এক গভীর হার্দ্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।

১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্রের অষ্টম ইউরোপ অভিযান। সেবারও তিনি ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করেন; পরে লীগ অব্ নেশনসের 'কমিটি অন ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন'-এর অধিবেশনে যোগ দিতে জেনেভায় আসেন এবং সেই সময়েই ভিলন্যুভে দেখা করতে আসেন রলাঁর সঙ্গে।

সেদিন ৯ জুলাই। জগদীশচন্দ্র এসেছেন মধ্যাহ্নভোজনে আমন্ত্রিত হয়ে এবং অপরাহ্ণ কাটাতে। সঙ্গে লেডি বসু 'পরনে ভারতীয় পোশাক, তাঁর মধ্যে স্বামীর চেয়ে জাতিগত লক্ষণ অনেক বেশি স্পষ্ট'। রলাঁ বোনের সঙ্গে মত্রঁ স্টেশনে গিয়েছিলেন মোটরে করে তাঁদের নিয়ে আসতে। প্রথম সাক্ষাতেই রলাঁ এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর দিনপঞ্জীতে প্রথমেই উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছিলেন:

> তিন চার ঘণ্টা ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই মানুষটি যে প্রাণশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, উত্তাপ ছড়ালেন তার একটা ধারণা কী করে দিই! মানুষটি ছোটখাট, বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখ, কালো ভুরু, রূপোলি চুল; একটু সেমিটিক রক্ত-মেশা ভূমধ্যসাগরাঞ্চলের মানুষের মতো রোদে-পোড়া গায়ের রঙ, ছোটখাট দুটি শুকনো হাতের (প্রতিভাবানের হাত) নখ ছোট করে কাটা, বয়সের তুলনায় এক অবিশ্বাস্য (আমার সমান বা আমার চেয়েও উচ্চস্তরের) তারুণ্য এবং বলার, চিন্তা করার, বেঁচে থাকার এক আনন্দ—আমাকে মনে পড়িয়ে দেয় গৌরবময় আবিষ্কারের ঠিক পরেকার (১৯১৫) আইনস্টাইনকে।

জগদীশচন্দ্র ছিলেন অক্লান্ত বক্তা, বিশেষ করে রলাঁর মতো উৎসাহী শ্রোতাকে পেয়ে তাঁর আলোচনা হয়ে উঠেছিল বিচিত্র ও বহুমুখী। প্রকৃত-পক্ষে প্রথম দর্শনে রলাঁর কাছে তিনি তাঁর আজন্ম বৈজ্ঞানিক সাধনার মর্ম-কথা উদ্‌ঘাটিত করার প্রবল উৎসাহ বোধ করেছিলেন। রলাঁ লিখেছেন:

> তাঁর বিচিত্র বিষয়ের হিসেব রাখা কঠিন, তবুও তারা তাঁর প্রায় গোটা জগতকে ঘিরেই ঘোরে; এই নতুন জগতের তিনি আবিষ্কর্তা—যেমন আমি তাঁকে বলেছি, তিনি হচ্ছেন, মনোজীবন, উদ্ভিদ

ও অজৈব পদার্থের সংবেদনশীলতার : মনের নতুন মহাদেশের ক্রিস্টোফার কলম্বাস।

রলাঁ। জগদীশচন্দ্রের মুখ থেকে শুনলেন, তিরিশ বছর আগে অসুস্থ অবস্থায় ঘরের বিছানায় শুয়ে জানলার সামনে কাঠবাদাম গাছের দুলুনি দেখে তিনি কেমন করে উপলব্ধি করেছিলেন উদ্ভিদের সংবেদনশীলতার রহস্য ; সেটা তাঁর কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছিল আধা-ধর্মীয় 'ইনটুইশন'-এর মতো ; কেমন করে উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা পরিমাপের যন্ত্র বানিয়েছিলেন, কেমন করে নিজের আঙুলগুলোকে তৈরি করে নিপুণ হাতের অধিকারী হয়েছিলেন। উদ্ভিদ যে বধির তা রলাঁ। জগদীশচন্দ্রের মুখে শুনলেন এবং জানলেন এই বধিরতা পুষিয়ে নিতে আলোর সমস্ত ঘাটে—প্রতিটি বৈদ্যুতিক ও সৌরস্পন্দনে—উদ্ভিদ বিস্ময়করভাবে সংবেদনশীল।

রলাঁ। জগদীশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন ভারতের বিজ্ঞানের অতীত সম্পর্কে। তিনি উত্তরে বললেন : 'দু হাজার বছর আগেই ভারতবর্ষে রসায়নের দ্বৈত প্রস্থান ছিল : এক প্রস্থান পদার্থের ছদ্ম-ধর্মকে ঈশ্বরে, ও যে-মন তাদের কল্পনা করে তাতে আরোপ করত। অন্য প্রস্থান অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক ভাবেই স্বরূপেই পদার্থের পর্যবেক্ষণ করত, এবং এই তত্ত্বটি নিষ্কাষিত করেছিল : যে-কোনো পদার্থই পরম ভালো বা পরম মন্দ নয়, প্রত্যেকেই ক্ষেত্রানুসারে (এবং মাত্রানুসারে) ভালো অথবা মন্দ।'

জগদীশচন্দ্র রলাঁকে সেই বছরেই প্রকাশিত তাঁর 'প্ল্যাণ্ট অটোগ্রাফ অ্যাণ্ড্ দেয়ার রিভিলেশনস্' গ্রন্থটি পাঠিয়েছিলেন। টেবিলের উপরে ফেলে রাখা সেই বইটি হাতে নিয়ে জগদীশচন্দ্র তার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করলেন। রলাঁর বাগান থেকে কিছু গাছড়া তুলিয়ে এনে উদ্ভিদের সংবেদনশীলতার প্রকৃতি বর্ণনা করলেন। তাঁর মতে বাগানের ফ্রেঞ্চবিন আর গৃহপালিত হাঁস মুরগির মধ্যে সংবেদনশীলতার প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। তিনি রলাঁকে 'লজ্জাবতীর একটা ডগার চারটে স্নায়ু দেখালেন, কেমন করে প্রত্যেকে একটা পাতাকে চালাচ্ছে—এবং যে-কোনো পাতায় রোদের স্পর্শে সৃষ্টি-হওয়া উপরের ও নীচের সঙ্কোচ-প্রসারণের অবিরাম নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করছে।'

জগদীশচন্দ্র যে ভারতীয় ধরনে গভীরভাবে ধর্মপ্রবণ ছিলেন সে কথা তিনি রলাঁর কাছে একটুও গোপন করেন নি। তিনি নিঃসন্দেহ যে জীবন এক এবং গতিশীল ; আর আমাদের অস্তিত্বের চক্র জৈব ও অজৈব (বলে কথিত) পদার্থের সমস্ত রাজত্বের মধ্যে দিয়ে এক রূপ থেকে অন্য রূপে নিয়ে যায়। তিনি বললেন, 'আমি যদি উদ্ভিদ না হতাম—তাকে বুঝবার জন্যে যদি আবার উদ্ভিদ না হয়ে যেতাম, তা হলে তার মন আবিষ্কার করতে পারতাম না।' তারই ফলস্বরূপ মানবতার ঐক্য তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ বস্তু, মানুষের নির্বোধ অহংকার তাকে অন্ধ করে রেখেছে।—মাত্রা থেকে মাত্রায় মানুষকে

বিচ্ছিন্ন করেছে, প্রথমে করেছে জীবনের অন্য শ্রেণী (ordre) থেকে তার পর মানুষের অন্যান্য জাত থেকে, তার পর অন্যান্য ব্যক্তি থেকে এবং অবশেষে তার মধ্যে বানিয়েছে মরুভূমি।

সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র যে স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন তা রলাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নি। কারা রাজনীতির কলকাঠি নাড়ে তা তিনি সহজেই ধরতে পারেন; মিথ্যার মুখোশের আড়ালে লীগ অব্ নেশনসের প্রকৃত রূপটি চিনে নিতে তাঁর অসুবিধে হয় নি। মুসোলিনি বারংবার বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে নিমন্ত্রণ জানালেও তিনি কখনও কর্ণপাত করেন নি। মুসোলিনির নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে দুইজন ভারতীয় তাঁদের একজন জগদীশচন্দ্র, অপর জন জহরলাল নেহরু। রলাঁ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, রাজনৈতিক দিক থেকে 'তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি দূরদর্শী'।

সেদিনকার আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রশ্ন উঠল। সেই পর্বে রলাঁ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের তথ্য সংগ্রহে মনোযোগী হয়েছিলেন। দুমাস আগে এসেছিলেন মিস ম্যাকলিঅড্; তাঁর কাছ থেকে বিবেকানন্দ সম্পর্কে অনেক অন্তরঙ্গ কথা জানতে পেরেছিলেন, মায়াবতীর স্বামী অশোকানন্দের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ চলছিল। বিজ্ঞান সম্পর্কে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা কী ছিল তা জানার জন্যে রলাঁর প্রবল কৌতূহল। তাঁর আগ্রহ বশী সেনের সঙ্গে পরিচিত হবার, প্রবল আকর্ষণ জগদীশচন্দ্রের প্রতি। জগদীশচন্দ্র বিবেকানন্দকে খুবই ভালো করে জানতেন, তাঁকে ভালোবাসতেন। তাঁর মধ্যে জাতীয়তাবাদী প্রবণতা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে বিবেকানন্দ তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন, 'তিনি যেন ভারতীয় মনের বৈজ্ঞানিক মূল্যের দাবি নিয়ে কেবলমাত্র বিজ্ঞানেই জাতীয়তাবাদকে দেখান'। বিবেকানন্দের মতোই অলৌকিকতা, তুচ্ছতাকে তিনি বিশ্বাস করেন না, থিওসফির প্রতিও তাঁর একই রকম অবজ্ঞা। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা থেকে রলাঁ এই সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, 'ভারতীয় ধর্মীয় মহৎ স্বতঃলব্ধ বোধের (যা তুরীয় আনন্দ পর্যন্ত যেতে পারে) অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত হচ্ছে সব সময়েই যুক্তির নিয়ন্ত্রণ; এবং সাময়িক হলেও, যা যুক্তিকে বিসর্জন দেওয়ায়, তার প্রতিই তার বিতৃষ্ণা'।

জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের কর্মপদ্ধতি বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিজ্ঞান-মন্দিরকে দান করেছেন। তা থেকে শিক্ষানবিশ ছাত্রদের দশ বছরের জন্যে বৃত্তি দেওয়া হয়। 'তিনি চান সারা জীবনের জন্যে তাদের এমন ভাবে পর্যাপ্ত বৃত্তির নিশ্চয়তা দিতে, যাতে বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো বৈষয়িক উদ্বেগ তাদের না থাকে—কিন্তু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিটি আবিষ্কার জগতকে দিতে হবে। কোনোটিরই গোপনতা থাকবে না

বা পেটেণ্ট রাখা হবে না। কারণ বিজ্ঞানের তা-ই একমাত্র ভালো যা সবাইকে দেওয়া যায়, যা গোপন করতে হয় তা মন্দ, যেমন বিস্ফোরক পদার্থ, মারণ যন্ত্রাদি...'

জগদীশচন্দ্রকে প্রচণ্ড লড়াই করতে হয়েছে মানসিক ভীরুতা, অবিশ্বাস এবং সংস্কারের বিরুদ্ধে। তাঁর পেশার সকলেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। মানুষের বাইরেও যে আবেগময় জীবন আছে, তাঁর এই আবিষ্কারে প্রথম দিকে লর্ড কেলভিন তাঁকে বলেছিলেন: 'না, এটা সম্ভব নয়। এটা হবে ঈশ্বর সম্পর্কে শ্রদ্ধার একটা অভাব, তিনি চেয়েছেন মানুষকে বিশেষ অধিকার দিতে।' জগদীশচন্দ্র তার প্রতিবাদে জানিয়েছিলেন, ঈশ্বরকে গণ্ডিবদ্ধ করার দাবিটাই তো শ্রদ্ধার অভাব। বিজ্ঞানী হিসেবে জগদীশচন্দ্র প্রতি মুহূর্তেই লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত। তিনি নিজেকে মনে করেন প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয়ের মতো মনের জগতের ক্ষত্রিয়। এই ক্ষত্রিয়োচিত লড়াইয়ের প্রসঙ্গে গান্ধীর কথা উঠল। রলাঁ লিখেছেন:

> জগদীশচন্দ্র গান্ধীকে ভালো করেই জানেন এবং গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। কিন্তু তাঁর বিচারে গান্ধী বড়োই সঙ্কীর্ণ, তিনি শিল্প-বিজ্ঞানের প্রতি বড়োই উদাসীন বা খড়্গহস্ত, মনের এই স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় ঐশ্বর্যের তাঁর বড়োই অভাব। ঠিক এর বিপরীত, জগদীশচন্দ্র চান, মনের সৃষ্টির সমস্ত শক্তিগুলোকে তরুণদের মধ্যে উদ্দীপ্ত করা হোক—এই শক্তিগুলো সর্বজনীন প্রকৃতির স্বর্গীয় পরিকল্পনার অঙ্গ—অপরিহার্য অঙ্গ। তরুণ বংশধরদের মাধ্যমে সৃষ্টির এই অবিশ্রান্ত উৎসার ছাড়া প্রকৃতি ঝিমিয়ে যায়, ঘুমিয়ে পড়ে এবং অসাড় হয়ে পড়ার ভয় থাকে। শেষ দিন পর্যন্ত তাকে তরুণ থাকতে হবে এবং চিরকাল থাকতে হবে নব তারুণ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে।

ভারতের তরুণদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র বললেন, ভারতীয় তরুণদের মধ্যে বাঙালি তরুণদের কল্পনাশক্তির আগুন আছে, স্বতঃলব্ধ বোধের প্রতিভা আছে, কিন্তু তাদের অভাব দীর্ঘকাল ধরে কাজে রূপায়িত করার ধৈর্যের। এবং তার কারণ মুখ্যত দৈহিক। কম প্রতিভাসম্পন্ন হলেও অন্যান্য প্রদেশের তরুণ নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালাতে বাঙালির চেয়ে অনেক বেশি পটু।

সেদিনকার আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল—প্রকৃতির লড়াই, উদ্ভিদ্ জগতের সংগ্রাম। অরণ্য জগৎ সম্পর্কে রলাঁর আজন্ম এক রহস্যময় কৌতূহল ছিল। যৌবনে ফ্রবুর্গে জুরা (Jura) পাহাড়ের অরণ্য তাঁর মনে যে ছাপ ফেলেছিল তার পরিচয় আছে তাঁর 'বুইসঁনারদাঁ' উপন্যাসে। জগদীশচন্দ্র তাঁকে শোনালেন উদ্ভিদ্ জগতের নিদারুণ নিষ্ঠুর সংগ্রামের রোমাঞ্চকর কাহিনী। তাল গাছে বটের চারা গজায়, সেই বট শেকড়ে জড়িয়ে তাল

গাছকে জ্যান্ত গিলে খায়। আবার প্রকৃতির সংগ্রাম মানবপ্রজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামেরও যেন প্রতীক। জঙ্গলে বা বাগানে বিভিন্ন গাছের মধ্যে ভারসাম্য আছে, নতুন কোনো জাতকে ঢোকালে সকলেই জোট বেঁধে তাকে মারে। নতুন জাতের গাছটি মরে, কিন্তু তার দেহাংশ থেকে আবার মাথা তোলে নতুন গাছ। মরা গাছ তার জীবনীশক্তি দিয়ে যায় নতুন গাছকে, তিলে তিলে সংগৃহীত জীবনীশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে পরবর্তী বংশধর।

এই দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন আলোচনায় স্বামীর পাশে ঠায় বসে ছিলেন লেডি বসু, একবারের জন্যেও মুখ খোলেন নি। রলাঁ তাঁর সেদিনের চিত্রটি এঁকে রেখেছেন দিনপঞ্জীর পাতায়:

> লেডি বসু বয়স্কা মহিলা, মোটেই সুন্দরী নন, গায়ের রঙ কালো, মুখখানা বড়সড়, একটু ভারী, কিন্তু মনে হয় (আমি জানি তিনি), ভালো মানুষ ও বুদ্ধিমতী। স্বামীর প্রতি আশ্চর্যরকম অনুগত, প্রথম থেকে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন, স্বামীকে উৎসাহ দিয়েছেন; তিনি কদাচিৎ মুখ খোলেন—স্বামীই যখন সব সময় কথা বলছেন, তিনি কেমন করেই বা বলতে পারেন? —চোখ দুটো অর্ধেক বুঁজে, এক হাসিমাখা ক্লান্ত ধৈর্যের ভাব ফুটিয়ে তিনি শুনে যান তাঁর বৃদ্ধ শিশুটি বলে চলেছেন—একই উৎফুল্ল কাহিনী আবার নতুন করে বলে চলতেও যাঁর ক্লান্তি নেই।

সেদিন বিদায় নেবার সময় জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্যে রলাঁর স্বাক্ষরিত কয়েকখানি বই চেয়ে নিলেন আর চাইলেন তাঁর একখানি চিঠি যা তিনি সাক্ষ্য হিসেবে তরুণদের হাতে দিতে পারেন।

ভিলন্যুভ থেকে জেনেভায় ফিরে পরদিনই জগদীশচন্দ্র রলাঁকে চিঠি লিখলেন:

> প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু—আপনার সুন্দর বাড়িটিতে আপনার সঙ্গে দেখা করা এবং যা-কিছু সত্য ও সুন্দর তার সংস্পর্শে আসা এক বিরাটসুখ; একমাত্র এরাই টিকবে…

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রলাঁর আবার দেখা হল দুমাস পরেই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। এই সম্মেলনে রলাঁর উপস্থিতিও ঘোষণা করা হয়েছিল, শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন কেবলমাত্র জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শোনার লোভে (৬ সেপ্টেম্বর)। সেখানে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা ছিল 'শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায় জাতিদের মধ্যেকার সম্পর্কের ব্যাপার নিয়ে'। বক্তৃতামঞ্চে কেবলমাত্র মানবীয় ঐক্য নয়, প্রাণজগতের ঐক্যও জগদীশচন্দ্র হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেখালেন। তিনি হাজির করলেন তাঁর পরীক্ষিত উদ্ভিদের চিত্রলেখগুলো, যাদের তিনি নাম দিয়েছেন 'হস্তলেখ'। তিনি দেখালেন উদ্ভিদের স্নায়ুযন্ত্র, প্রাণরসসঞ্চালনের পথ,

প্রমাণ দিলেন সংবেদনশীলতার। তিরিশ বছরের কঠোর বৈজ্ঞানিক গবেষণার পর তিনি স্বীকার করলেন, 'শাশ্বত ঐক্যে তাঁর ভারতীয় বিশ্বাসই' তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছেন। এই বিশ্বাসই তাঁর গোপন করা যাত্রারম্ভের বিন্দু এবং তাঁর সমস্ত আবিষ্কারের প্রকাশ্য করা সিদ্ধান্ত। উদ্ভিদ্ জগৎ থেকে তিনি মানুষের জন্যে এই আশ্চর্য শিক্ষাটি নিষ্কাশন করেছেন ; যন্ত্রণা হচ্ছে সেই পথ যার মাধ্যমে সত্তা উন্নীত হয় এবং এক উচ্চ স্তরের অস্তিত্বে পৌঁছয়। আর এইটি তিনি অনুরূপভাবে খুঁজে পেয়েছেন রমঁ্যা রলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর মধ্যে এবং তার মধ্যে দিয়েই তিনি রলাঁর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে শুনতে রলাঁর মনে হয়েছিল তিনি যেন দা ভিঞ্চির চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনছেন।

বক্তৃতা চলা কালেই শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। আলো মিলিয়ে গেল, বৃষ্টির তোড় আর শিলের সঙ্গে চার ধারে বাজ পড়তে লাগল। সভা ভাঙল ১০টার কাছাকাছি। মোটরে লিনিয়ের-এর এক সালেয় পৌঁছতে জলে গাড়ি ডুবে গেল। সেই ঝড়ের মধ্যে রাস্তায় নেমে টেলিফোন করে নতুন গাড়ি আনিয়ে তাঁরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছলেন। ঝড়ে সারারাত কাঠের পলকা বাড়িটার জানালা আর দেয়াল কাঁপতে লাগল। রাতে কারুরই তেমন ঘুম হল না। পরদিন সকাল ৯টায় বসু-দম্পতি যাত্রা করলেন জেনেভা, সেখান থেকে যাবেন মার্সেই, তার পর ভারতবর্ষ।

দুই বন্ধুর আবার সাক্ষাৎ হল ভিলন্যভেই এক বছর পরে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। তখন রলাঁ 'বিবেকানন্দ' লিখছেন। এই এক বছরের মধ্যে অনেকেই ভিলন্যভে এসেছেন দেখা করতে। দিলীপ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে (অক্টোবর ১৯২৭) তিনি অরবিন্দ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন, শ্রদ্ধা সত্ত্বেও অরবিন্দের দর্শন যে তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে নি সে কথা তিনি অসংকোচে লিখে রেখেছেন। গান্ধীর সঙ্গে বিতর্ক শুরু হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধে গৃহীত ভূমিকা এবং বের্তালঁ (Bertalon) ভাইদের নিয়ে। গান্ধীর প্রথম মহাযুদ্ধ সমর্থনের যুক্তি রলাঁ একেবারেই মানতে পারেন নি। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের মে মাসেই 'রামকৃষ্ণ' লেখা শেষ হয়ে গেছে। ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত যুদ্ধবিরোধী লীগের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ফ্যাসিস্ট হামলায় আহত রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে (৭ আগস্ট)। তার পর এসেছেন বশী সেন, যাঁর কথা তিনি জানতে চেয়েছিলেন মায়াবতীর অশোকানন্দের কাছে। সম্প্রতি বশী সেন প্রোটোপ্লাজমের উপরে তাপের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক বশী সেনের মুখে রাজযোগের মাহাত্ম্যের কথা শুনেছেন। তার পরেই আবার এলেন জগদীশচন্দ্র ও শ্রীমতী বসু।

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্রের নবম ইউরোপ অভিযান। মিউনিক

ভিয়েনা প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দেওয়ার পর জেনেভায় এসেছিলেন লীগ অব্ নেশনসের 'কমিটি অন ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন'-এর অধিবেশনে যোগ দিতে। জেনেভায় স্কুল অব্ ইনটারন্যাশনাল স্টাডিজ-এ 'সংবেদনশীল সত্তা হিসেবে উদ্ভিদ' নামে তিনি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার পরেই অসুস্থ হয়ে সামান্য কিছুদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন কলিনে। সেই বছরেই নভেম্বরে জগদীশচন্দ্রের সত্তর বছর পূর্ণ হবে, কিন্তু তখনও তিনি কর্মতৎপর এবং প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তাঁর উদ্যম ও তৎপরতা যেন আরও বেড়েছে। সেবারের সাক্ষাৎকারের প্রথমেই রলাঁ লিখেছেন :

> আগের চেয়ে তিনি অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও উচ্ছল। আমার বোন তাঁর কথাগুলো যাতে তর্জমা করতে পারেন তার জন্যে একটু একটু থামতে না হলে, এক নিশ্বাসে দু ঘণ্টা কথা বলে যেতে থামতেন না।

আলোচনা প্রসঙ্গে নিজের কর্মতৎপরতাকে জগদীশচন্দ্র ভারতীয় ক্ষত্রিয়ের বৈশিষ্ট্য বলে গর্ব প্রকাশ করলেন, এবং বললেন : 'কর্মতৎপরতায় আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে আমি দশটি ইউরোপীয়কে চ্যালেঞ্জ করি'। বিবেকানন্দকেও তিনি ক্ষত্রিয় হিসেবে দাবি করলেন। জগদীশচন্দ্র জীবনে রাজসিকতার সমর্থক। তিনি বললেন, বিবেকানন্দও রাজসিকতার সমর্থক ছিলেন। বিবেকানন্দ বলতেন, দারিদ্র্য ও ত্যাগের সমর্থন করাটা যেমন ভালো, ঐশ্বর্য ও রাজকীয় জীবনযাত্রার সমর্থন করাটাও।…জগদীশচন্দ্র উচ্চকণ্ঠে ঐশ্বর্য, ভোগ, জয়, সক্রিয় ও উচ্ছল সমস্ত শক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করলেন,—কিন্তু সে সব নিজের জন্যে নয়, ভারতের সমস্ত মানুষের জন্যে। গান্ধীর তপশ্চর্যায় ও প্রকৃতিতে বা সরল জীবনে ফিরে যাবার বাণীর প্রতি তাঁর কোনোই সহানুভূতি নেই।— তিনি সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার অতি শক্তিশালী মূর্ত প্রকাশ, সেইজন্যে প্রগতির, পিছনে না ফিরে কেবলই—কেবলই সামনে এগিয়ে চলার ঘোষিত প্রবক্তা না হয়ে পারেন না।— তিনি ভারতবর্ষের বৃহৎ-শিল্প-বিকাশের পক্ষে ; বললেন, একে আটকাতে ব্যর্থ হয়ে গান্ধীর খদ্দর কেবল জাপানী মাল ডেকে আনার কাজে লাগছে ; জাপান এরই মধ্যে পাকা হাতে তৈরি-করা মেকি 'মেড ইন টোকিও' খদ্দরে ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেলেছে।'

বাঙালি হিসেবে জগদীশচন্দ্র যে গর্বিত তা কখনও তিনি গোপন করতেন না। রলাঁ লিখেছেন :

> জাতীয় গর্ব—কিন্তু শুধু ভারতীয় নয়, বাঙালি গর্ব—তাঁর মধ্যে থেকে বিদ্যুতের মতো ঝলসে ঝলসে ওঠে। বুঝতে পারা যায় যে, তাঁর মনের মধ্যে আছে বাঙালি চরিত্রের বীর্যহীনতা এবং অবশ্যই, তথাকথিত ভীরুতা সম্পর্কে ইংলণ্ডের (বিশেষ করে কিপলিঙের)- দারুণ অপমান।

জাতি হিসেবে বাঙালি যে দুর্বল ও ভীরু নয় তার যে বিপুল দৈহিক ও মানসিক ঘুমন্ত শক্তি আছে সে সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝালেন। বাংলাদেশে রাজনৈতিক কারণে ফাঁসির আসামীদের আনন্দ প্রকাশ ও মানসিক স্থৈর্যের ঘটনা বললেন। বিপুল দৈহিক ও মানসিক শক্তির দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করলেন শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের (পরবর্তী কালের সোঽহং স্বামী) নাম। এই বাঙালি হারকিউলিসের কাহিনী তিনি রলাঁদের সবিস্তারে শোনালেন।

এর পর রলাঁ তাঁকে প্রশ্ন করলেন 'রাজযোগ' সম্পর্কে। এ ব্যাপারে জগদীশচন্দ্রের ধারণা অনেকটা তাঁর নিজের মতো জেনে খুশি হলেন। জগদীশচন্দ্রের বিশ্বাস রাজযোগে বিরাট শক্তি লাভ হয়, কিন্তু এক সীমার বাইরে নয়। অরবিন্দের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধা জানিয়েও বিশ বছরের নির্জন বাসে ভারতের মুক্তির জন্যে তাঁর অলৌকিক ফলপ্রাপ্তির আশা সম্পর্কে তিনি সংশয় প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, 'যোগের মাধ্যমে যদি এমন ব্যাপার সম্ভব হত, তা হলে প্রাচীন ঋষিরা কেন তার ব্যবহার করতেন না বোঝা যায় না।'

উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের আত্মীয়তার উপলব্ধি থেকে সে সময়ে জগদীশ-চন্দ্র একমাত্র উদ্ভিজ্জ বস্তু দিয়ে দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিষেধ আবিষ্কারের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। তাঁর উদ্ভিজ্জ সিরাম ও টিকা বেশি শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছিল, আশা করছিলেন ক্যানসারের প্রতিষেধ আবিষ্কার করবেন। উৎসাহী দুই শ্রোতার সামনে জগদীশচন্দ্র তাঁর সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলে চললেন। এদিনকার আলাপচারি সম্পর্কে রলাঁ লিখেছেন :

> তাঁর উচ্ছ্বসিত একালাপের মুখ্য বিষয় হচ্ছে—আর সেইটেই তাঁর কাছে নিরন্তর আনন্দ—সেইটেই স্বাভাবিক—তাঁর বিপুল বৈজ্ঞানিক কর্ম।...এবং জগদীশচন্দ্র ফিরে আসেন মহাজাগতিক ঐক্যের মূল-গত বিশ্বাসে—এই ঐক্যকে প্রমাণ করেন জগতের প্রতিটি কোষে, কোনো কোনো শৃঙ্খলার (order) সঙ্গে—যার মধ্যে এ অন্তর্ভুক্ত ; সমস্ত কিছুরই সাধারণ লক্ষণ : সংকোচনতা, সঞ্চারণতা ...এবং ছন্দ। এবং এরা আদিম উৎস মাটির যত বেশি কাছাকাছি, এদের শক্তি তত বেশি সম্পূর্ণ, তত বেশি বিশুদ্ধ।

তার পর দু বছর কেটে গেল। রলাঁর 'বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্বজনীন ভগবদ্বাণী' প্রকাশিত হল, লাহোর কংগ্রেসে (২৯ ডিসেম্বর ১৯২৯) পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হল। জগদীশচন্দ্র দশমবার এসেছিলেন ইউরোপ অভিযানে, জেনেভায় এসেছিলেন কমিটি অন ইনটেলেকচুয়াল কো-অপা-রেশন-এর অধিবেশনে যোগ দিতে, কিন্তু কাজের চাপে রলাঁর সঙ্গে দেখা

করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। ভারতে গান্ধী গ্রেপ্তার হয়েছেন, স্বভাবতই রলাঁ ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত। রাশিয়া যাবার পথে আগস্ট মাসে জেনেভায় উপস্থিত হলেন রবীন্দ্রনাথ, সঙ্গে এণ্ড্রুজও আছেন। রলাঁর ডাক পড়ল জেনেভায়। এবার রলাঁর মনে হল, রবীন্দ্রনাথ যেন অনেক পালটে গেছেন। সেদিনকার সাক্ষাৎকারে কালীপূজোয় পশুবলি, রাশিয়ার 'ভক্‌স', রবীন্দ্রনাথের ছবি ইত্যাদি অনেক কিছু নিয়েই আলোচনা হল, শুধু আলোচিত হল না ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা। ক্ষুব্ধ রলাঁ লিখেছেন: 'তিনি এক অন্য জগতে চলে গেছেন।' অবশেষে যখন এণ্ড্রুজ ঘরে ঢুকলেন, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি গান্ধীর নামটি সেই আসরে উচ্চারণ করলেন, রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে এই নামটি শোনার জন্যে রলাঁ অপেক্ষা করছিলেন, নামটি আলোচনায় অনুপস্থিত ছিল। স্পষ্টই বোঝা গেল এণ্ড্রুজ ইচ্ছে করেই নামটির উল্লেখ করলেন যাতে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যরা তাঁর কথা ভাবতে বাধ্য হন।' রবীন্দ্র-নাথের সেদিনকার আচরণে রলাঁর ক্ষোভ ও অভিমান একটুও চাপা থাকে নি। কিন্তু তাঁর সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়ে গেল মাত্র কয়েক দিন পরেই সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্রের আগমনে।

১৯ সেপ্টেম্বর জগদীশচন্দ্র ও লেডি বসু রলাঁর বাড়িতে এলেন চা খেতে। কয়েক দিন তিনি চিকিৎসা করিয়েছেন তেরিতে-য়, এবার ভারতে ফিরে যাবেন। রলাঁ লিখেছেন:

> জগদীশচন্দ্র একটুও পাল্টান নি; তাঁর তরুণ-সুলভ প্রাণশক্তি তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু পুরোপুরি মন জুড়ে আছে ভারতবর্ষ ও তার সংগ্রামের চিন্তা, তাতে তিনি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন। আর কিছুই তিনি ভাবতে পারছেন না। তাঁর সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে গেছে।

সেদিন জগদীশচন্দ্র ছিলেন মাত্র ঘণ্টা দুয়েক। এই সময়টুকুর মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ছাড়া তিনি অন্য কোনো কিছু সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নি। কয়েক দিন আগে দেখা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করে রলাঁ অকপটে লিখেছেন: 'তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অন্য ধাতুতে গড়া। আমি স্বীকার করছি, তাঁকে আমার বেশি মনে ধরে।'

ভারতের ভবিষ্যতের চিন্তায় জগদীশচন্দ্রের গভীর উদ্বেগ ও নৈরাশ্য। "তিনি ভালোই জানেন যে ভারতবর্ষ জিতবে; কিন্তু তিনি ভাবছেন, অপরিসীম দুঃখভোগের কথা—আজকের দুঃখভোগ, আগামী কালের দুঃখভোগের কথা। তিনি দেখছেন, ইংলণ্ডের হাতে ভারতবর্ষ হয়েছে শিক্ষাহীন, নির্মম নির্যাতিত, বাক্‌রুদ্ধ, অন্ধ; তাঁর জিজ্ঞাসা, যাঁদের উপরে তাঁর আস্থা আছে, মাত্র সেই দুইজন রাজনৈতিক নেতা গান্ধী ও (অত্যন্ত অসুস্থ) মতিলাল নেহরুর মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে কী হবে।'

রলাঁ তাঁকে নানা ভাবে উৎসাহিত করার চেষ্টা করলেন। যে-জাতি

নিজেকে স্বাধীন করে, পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে, তার মধ্যে যে অপ্রত্যাশিত সঞ্চিত শক্তি থাকে তার প্রতি রলাঁ আস্থা জানাবার চেষ্টা করলেন। তিনি মাজিনির ইতালি, বিপ্লবী ফ্রান্স, রাশিয়ার বীরোচিত দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন। অবশেষে বিদায় নেবার সময় জগদীশচন্দ্র গভীর আবেগের সঙ্গে এই কামনা ব্যক্ত করলেন, রলাঁ যেন ভারতের ও জগতের মঙ্গলের জন্যে অনেক দিন বেঁচে থাকেন। রলাঁ ও জগদীশচন্দ্রের এই শেষ দেখা।

তারপর বেশ কিছু বছর কেটে গেছে। রলাঁ কলম ধরেছেন ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের পক্ষে। গান্ধী ভিলন্যুভে অতিথি হয়েছেন, সুভাষচন্দ্র, জহরলাল প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে একাধিক সাক্ষাৎকার হয়েছে। মীরাট মামলার বন্দীদের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। সেইসঙ্গে তিনি সরব হয়ে উঠেছেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন পৃথিবীজোড়া ফ্যাসিস্ট-বিরোধী শিবির গড়ে তোলার জন্যে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝতে পেরেছেন গান্ধীর অহিংস অসহযোগিতার অসম্পূর্ণতা; 'গান্ধী ও লেনিন'—'জল ও আগুন'-কে মেলাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা ত্যাগ করেছেন; গান্ধীর মনের "দিগন্তকে প্রসারিত" করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি লিখেছেন তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি: 'সংগ্রামের পনেরটি বছর' (I Will Not Rest)। তার পর থেকে নির্দ্বিধায় তিনি পক্ষ নিয়েছেন আপসহীন সংগ্রামী মানুষদের; অস্ট্রিয়ার ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থানের নিন্দা করেছেন, ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্টকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন, স্পেনের ফ্যাসিস্ট আক্রমণের প্রতিরোধে আহ্বান করেছেন সকল দেশের মানুষকে।

এমন সময়ে, সাত বছর পরে, ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর খবর এল: জগদীশচন্দ্র পরলোক গমন করেছেন। প্রায় একই সময়ে গুরুতরভাবে পীড়িত হয়েছিলেন রলাঁর সব চেয়ে শ্রদ্ধেয় তিন ভারতীয়—রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী এবং জগদীশচন্দ্র। প্রথম দুজন আরোগ্য লাভ করলেন। অসুস্থ গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের মর্মস্পর্শী বর্ণনা লিখে রাখলেন রলাঁ তাঁর দিনপঞ্জীর পাতায়। আর জগদীশচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কে লিখলেন সংক্ষিপ্ততম ভাষায়:

> কলকাতায় স্যার জগদীশচন্দ্রের মৃত্যু।...তাঁর মধ্যে অনির্বাণ জীবনের এমন এক শিখা জ্বলত যে মৃত্যু তাঁকে দেখা দিতে পারে তা যেন কল্পনাই করা যায় না।

"মহাদেবের জটা হইতে"

রমা চৌধুরী

"আমাদের বাড়ির নিম্নেই গঙ্গা প্রবাহিত। বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল। বৎসরের এক সময়ে কূল প্লাবন করিয়া জল-স্রোত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইত; আবার হেমন্তের শেষে ক্ষীণ কলেবর ধারণ করিয়া প্রতিদিন জোয়ার-ভাঁটায় বারিপ্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতাম। নদীকে আমার একটা গতিপরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত। সন্ধ্যা হইলেও একা একা নদীর তীরে আসিয়া বসিতাম। ছোট ছোট তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে আছড়াইয়া পড়িয়া কুলু কুলু গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত। যখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিত এবং বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত, তখন নদীর সেই কুলু কুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম। তখন মনে হইত, এই যে অজস্র জলধারা প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে, ইহা ত কখনও ফিরে না, তবে এই অনন্ত স্রোত কোথা হইতে আসিল? ইহার কি শেষ নাই?"

"নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম—'তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?' নদী উত্তর করিত—'মহাদেবের জটা হইতে'।"

(আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে', 'অব্যক্ত', পৃ. ৫)

কি অপূর্ব এই লেখা—এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও কবি যেন এক হয়ে মিলে মিশে গেছেন। সত্যই, তা হবেই বা না কেন? কারণ, আমাদের ভারতীয় মতে, "কবি", কেবল মাত্র কবিতারচয়িতা নন, তিনি, তার চেয়েও বড় কথা, প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ। সেজন্য প্রখ্যাত অভিধানকার অমর "কবি" শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—

"বিদ্বান্ বিপশ্চিদ্দোষজ্ঞঃ সন্ সুধী কোবিদঃ বুধঃ।
ধীরো মনীষী জ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান্ পণ্ডিতো কবিঃ।

(অমরকোষ, ২ খণ্ড, ব্রহ্মবর্গ, শ্লোক ১০)

অর্থাৎ, বিদ্বান্, সুধী, ধীর, মনীষী, প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিই "কবি"।

এরূপে যিনি তত্ত্বদর্শী, অথবা সত্যকে সাক্ষাৎ ভাবে উপলব্ধি করেন, এবং সেই নিগূঢ় অনুভূতিকে সুললিত ছন্দে বা বাক্যে প্রকাশিত করেন—তিনিই "কবি"।

আমাদের "বৈজ্ঞানিক কবি" পরমাদরের "দাদামশায়" ছিলেন এই প্রাচীন অর্থেই একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও সমভাবে বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক। আচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন আমার বাবা সুধাংশুমোহন বসুর আপন মামা। জগদীশচন্দ্রের দুই বোন স্বর্ণপ্রভা ও সুবর্ণপ্রভার সঙ্গে যথাক্রমে সুবিখ্যাত গণিতজ্ঞ, প্রথম ভারতীয় Wranglar অথবা সুপ্রসিদ্ধ Cambridge

University-র সর্বোচ্চ গণিত ডিগ্রিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী, —যিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা থেকে এম. এ. পরীক্ষায় সর্বদাই প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন, এবং যিনি উত্তর-জীবনে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার রূপে, তার চেয়েও অনেক অনেক বড় কথা, একজন বরেণ্য দেশনেতা ও সমাজসেবক রূপে আজও জাতির ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন—সেই আনন্দমোহন বসু এবং তাঁর ভ্রাতা মোহিনীমোহন বসুর বিবাহ হয়। পুণ্যশ্লোক আনন্দমোহন বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্রই হলেন আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব ব্যারিস্টার সুধাংশুমোহন বসু (এম. এ. এলএল বি; এবং এম. এল. এ., পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান)। সেই সূত্রে, বর্তমান প্রবন্ধের অধমাধম লেখিকার বাবার আপন মামা রূপে স্যার জগদীশচন্দ্র তার "ঠাকুরদাদা" এবং তাঁরই সুযোগ্যা সহধর্মিণী সুবিখ্যাত সমাজসেবিকা লেডী অবলা বসু তার "ঠাকুরমা" হতেন। কিন্তু কেন জানি না, আমরা তিন বোন উমা, রমা, সুনন্দা স্যার জগদীশচন্দ্রকে "দাদামশায়" এবং লেডী অবলাকে "দিদিমা" বলতাম। মনমোহন বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন স্যার জগদীশচন্দ্রের উত্তরসাধক ও তাঁর পরবর্তী "বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের" সুযোগ্য Director, সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু। অন্তদিকে আমার আপন বড় মামা অমিয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও Wranglar, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রধান এবং উপাচার্য ছিলেন।

এই ভাবে আমাদের পরিবারে বৈজ্ঞানিক হাওয়াই বইত প্রবল বেগে। কিন্তু যা উপরে বললাম—বিজ্ঞান ও দর্শন পরস্পর-বিরোধী তো নয়ই, উপরন্তু একটি সাধারণ বিন্দুতেই উভয়ে এসে মিলিত হয়েছে সেই "Unknown It"-এর এক সার্বজনীন মহাশক্তির পদতলে।

সেজন্য আমাদের অতি নিকট জন দাদামশায় স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর মধ্যে আমরা অতি নিকট থেকে, প্রাত্যহিক জীবনের আলো-ছায়ার মধ্যেও এই বৈজ্ঞানিক তথা দার্শনিকসুলভ উদার উত্তুঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গী, স্থির ধীর অবস্থান, সর্বোপরি তথাকথিত উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গেই সমান সহানুভূতিপূর্ণ, মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিপূর্ণ, শ্রদ্ধাপূর্ণ সুমিষ্ট ব্যবহার দেখে একাধারে বিস্মিত ও মুগ্ধ হতাম।

আমাদের তাঁর পরম স্নেহের নাতনীদের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ প্রাণের সম্পর্ক। তখন তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি; বিশ্বের বৃহৎ মহৎ বরিষ্ঠ গরিষ্ঠ, জ্ঞানীগুণীজনদের নিত্য শুভাগমন ঘটত তাঁর নন্দলাল বসুর সুবিখ্যাত ভারত-মাতার সুবৃহৎ ছবি সুশোভিত, সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রথায় শান্তিনিকেতনের ধাঁচে অতি উচ্চ মানের রীতিতে সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমটিতে। তাঁদের মধ্যে আমরা অতি সাধারণ শিশুরা কোথায়? অথচ অত বড় বৈজ্ঞানিক, অত গুরুতর বিজ্ঞান চিন্তায় সদাসর্বদা ভরপুর, অত সর্বপৃথিবীর গুণীজন পরিবৃত আমাদের পরম গৌরবের "দাদামশায়" মুহূর্তের জন্যও সেই শিশুদের হারিয়ে

যেতে দেন নি বাইরের জনসাধারণের ভিড়ে। আমরা শৈশব ও কৈশোরে বহু বৎসরই আমাদের একান্তই নিকট জন "দাদামশায়" ও "দিদিমায়" স্নেহচ্ছায়ায় অতিবাহিত করেছি একই বাড়িতে একেবারে পাশাপাশি ঘরে—তাঁদের সেই প্রাসাদোপম, বৃহৎ চার তলার বাড়িতে।

থাক সে কথা। ফিরে আসি আমাদের শিশুদের "Santa Clause" দাদামশায়ের কথায়। তাঁর শ্রীমুখ থেকে গল্প শোনা ছিল আমাদের নিত্য-প্রাপ্য—কখনই তার ব্যত্যয় হত না শত-সহস্র কাজের মধ্যেও। আর কি সেই গল্প—তাতে ছিল শ্রেষ্ঠ উপদেশ, জীবন পথে চলার অনিবার্য আলোক সম্পাত। কিন্তু কে বলবেন—তা উপদেশ, তা নির্দেশ, তাও তত্ত্বাবলী। কারণ, বলবার গুণে সেইসব গল্প হয়ে উঠত রূপে-রসে গন্ধে-সম্পদে সত্যই গল্প; সরস সুন্দর মধুর মোহন প্রাণস্পর্শী মর্মভেদী গল্প, যা ভাবের ঐশ্বর্যে, ভাষার মাধুর্যে আঙ্গিকের সৌন্দর্যে আমাদের শিশুমনকে একেবারে বিভোর করে দিত নিমেষেই।

আর আমরা কি পেতাম এই সকল শ্রেষ্ঠ কাব্যধর্মী গল্পের মধ্যে? পেতাম একটি মূলীভূত তত্ত্ব—প্রাণের উপাসনা। প্রাণকেই জান সর্বত্র। প্রাণকেই ভালবাস সর্বত্র, প্রাণকেই সেবা কর সর্বত্র। পৃথিবীতে জড়াজড়ের ভেদ নেই কোথাও বিন্দুমাত্রও। চিরপ্রাণবান, নিত্য, নির্বিকার, নিরঞ্জন সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের মূর্তরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড—তার মধ্যে জড়, অচেতন, প্রাণহীন কোনো কিছু থাকতে পারে কিরূপে?

সত্যই বরিষ্ঠ প্রাণোপাসক জগদীশচন্দ্র এই প্রাণকেই সর্বপ্রাণমনজীবন ভরে শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি করতে শিখিয়েছিলেন আমাদের সেই শিশুকাল থেকেই। আমরা শিশুরা কি খাচ্ছি পরছি ভাবছি করছি—সে দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল সর্বদাই—কারণ একটি প্রাণও ফেলার জিনিস নয়,—তা হোক না সে একজন সামান্য সাধারণ শিশুর ক্ষুদ্রতম দীনতম প্রাণ, অথবা বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক Einstien (আইনস্টাইন)-এর মহত্তম বৃহত্তম প্রাণ।

সেজন্য, দেখেছি আমাদের অতি আদর-আবদারের পাত্র দাদামশায়ের অত্যধিক স্নেহের প্রশ্রয়ে আমরাও যেমন বেড়ে উঠেছি, চারিপাশের বয়-বেহারা চাপরাশী-দারোয়ান প্রমুখ ভৃত্য-ঝি-রাঁধুনী-পরিচারক প্রভৃতিরাও ঠিক তেমনি তাঁদের পরমাদরের "বড় সাহেবের" স্নেহচ্ছায়ায় মনিবের বাড়িকেই নিজের গ্রামের বাড়ি বলে মনে করে পুত্রকন্যাবৎ লালিত পালিত হয়েছেন চিরকাল সগৌরবে।

তাঁদের নিজেদের কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না। কিন্তু তাঁদের মাতৃপিতৃ-হৃদয়ের সমস্ত অনাবিল স্নেহই অজস্র ধারায় বর্ষিত হত আমাদের ন্যায় শিশু ও কিশোর নাতি-নাতনীদের প্রতি। আমরা তাঁদের বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেছিলাম, এবং সেজন্য সেইটিই ছিল আমাদের প্রথম পিতৃগৃহ। সুমধুর

স্মৃতিচারণেরও শেষ নেই। কত বৎসরের প্রতি দিনের প্রতি মুহূর্তের সুখস্মৃতি সে যে—তা কি কোনদিন ভুলবার? কেবল একটি কথা বলে, স্মৃতির রত্নপেটিকা বন্ধ করছি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও। তা হল তাঁর আমাদের দিদিমা লেডী অবলা বসুর প্রতি গভীরতম ভালবাসা এবং বিশ্বাস। ভালবাসা তো অবশ্য পতি-পত্নীর মধ্যে থাকেই সর্বদা। কিন্তু পতি পত্নীর প্রতি সর্ববিষয়েই এরূপ আস্থাবান, এরূপ নির্ভরশীল, এরূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন—এরূপ উদাহরণও অধিক নেই নিশ্চয়ই। এই স্বর্গীয় দৃশ্য সেই শিশুকাল থেকেই দেখে দেখেও, দাম্পত্য জীবনের মহিমময় মঙ্গলময় মাধুরিময় দিকটি সম্বন্ধে সেই যে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল আমাদের মনে—কত সৌভাগ্যের কথা যে পুণ্যশ্লোক "দাদামশায়" ও "দিদিমার" অজস্র আশীর্বাদে তারই সার্থকতম রূপায়ণ দেখলাম আমার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবনেও।

পরিশেষে, পুনরায় ফিরে যাই এই সামাতিসামান্য প্রবন্ধের উদ্ধৃতিরূপ শিরোনামাতে—

"মহাদেবের জটা হইতে।"

সত্যই, ভগীরথ যেরূপ শঙ্খনিনাদ পূর্বক শিবজটা-নিরুদ্ধা গঙ্গাকে পৃথিবীতে প্রবাহিত করিয়ে দিয়ে, পৃথিবীকে একটি বিরাট বিশাল পুণ্যভূমিতে পরিণত করেছিলেন, ঠিক তেমনি আমাদের প্রাণপ্রেমিক প্রাণসেবক, প্রাণোপাসক, "দাদামশায়ও" অজ্ঞাত অনাদৃত আপাতদৃষ্টিতে জড়ের আবরণে লুক্কায়িত প্রাণকেই, সেই মহাপ্রাণকেই, সেই সার্বজনীন প্রাণকেই, সেই সর্বকালীন প্রাণকেই, সেই অমর-অজর অজড়-অভয়-অশোক প্রাণকেই মুক্ত করে, স্বীয় সুমধুর শঙ্খধ্বনিতে তার বিজয়গীতি ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত করে, সর্বত্রই ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সাদরে সানন্দে সাগ্রহে সানুগ্রহে, সগৌরবে—জীবে-জড়ে, বৃক্ষে-লতায়, আকাশে-বাতাসে, সর্বত্রই। একি কম অবদান? কারণ প্রাণই আমাদের সব, আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আমাদের বরিষ্ঠ গৌরব, আমাদের গরিষ্ঠ শক্তি। সেই প্রাণকেই ভালবাসতে হবে, সেই বিশ্বপ্রাণকেই আপনজন বলে মনে করতে হবে, সেই সার্বজনীন প্রাণের মধ্যেই দুচোখ ভরে দর্শন করতে হবে মহাপ্রাণকে, যে প্রাণে লীলায়িত হয়ে রয়েছে সর্বপ্রাণ সগৌরবে।

সেজন্য আসুন, আজ আমার এই অতি সামান্য অসম্পূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি সমাপ্ত করি প্রাণরসিক, প্রাণপ্রেমিক, প্রাণপূজক "দাদামশায়ের" পরমপ্রিয় তৈত্তিরীয়োপনিষদের সেই অপূর্ব "প্রাণবন্দনা" দ্বারা :

"প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি।
মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ।
তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে।"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ ২/৩)

অর্থাৎ "দেবতারা প্রাণশক্তি দ্বারাই প্রাণের কর্ম করেন। মনুষ্য এবং পশুরাও ঠিক তাই করে। প্রাণই প্রাণিগণের আয়ু। সেজন্য প্রাণকেই সকলের আয়ু বলা হয়।"

"প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণোদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ ৩/৩)

আবার "তিনি জানতে পারলেন যে, প্রাণই ব্রহ্ম, যেহেতু প্রাণ থেকেই এই জগতের সৃষ্টি, প্রাণেই তার স্থিতি, প্রাণেই তার লয়।"

ওঁ শান্তিঃ।

আক্রান্ত জগদীশচন্দ্র

দিবাকর সেন

একজন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের বিশেষ কোন একটি শাখায় পুরোধা হয়েছেন এটা কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের বহুদিকে পুরোধা হয়েছেন এমন দেখা যায় না। আচার্য জগদীশচন্দ্র কিন্তু তাই ছিলেন।

তাঁর গবেষণা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি Sir William Crookes ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে এক চিঠিতে বলেছিলেন, "I was much impressed by the most ingenious and novel self-recording instruments whereby you are able to make plants automatically record their response to electric and other stimulations....... The means of physiological investigation thereby afforded is of much importance."

প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী Haberlandt ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে এক বক্তৃতায় জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, "The same old Indian spirit which has carried to its utmost limits metaphysical speculation and introspection, wholly withdrawn from the world of sense, has now in its modern representative brought forth an extraordinarily developed faculty of observation and an ectasy in scientific experimentation."

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ২৬-এ এপ্রিল তারিখে রয়্যাল সোসাইটির অন্যতম সদস্য ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান Prof. F. G. Donnan জগদীশচন্দ্রকে এক চিঠিতে বলেছিলেন,"......You have indeed performed already a noble work in the cause of Science in general and of Science in India in particular. ...Even since that time I have personally always regarded you as the chief pioneer of research in India, and I think that future generations will corroborate this view..."

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ই অক্টোবর প্রখ্যাত ইতালীয় বিজ্ঞানী Federico Bassoli লিখেছিলেন, "...the great importance that have historically for me your experiments, as they would be the first radiodynamical experiments in the world and the 'embryo' of the marvellous branch of radio-dynamics..." অন্য এক চিঠিতে Prof. Bassoli বলেছিলেন, "The public demonstration of your experiments referred by Bottone was given in 1894-95 before first Marconi's Experiments." ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে Sir J. J. Thomson

জগদীশচন্দ্রের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, "These papers mark the dawn of the revival in India of interest in researches in Physical Science...."

জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদতাত্ত্বিক গবেষণা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিনিয়ান সোসাইটির সভাপতি ও রয়্যাল সোসাইটির অন্যতম সদস্য Prof. S. H. Vines বলেছিলেন, "It seems that you have revolutionised in some respects, and very much extended in others, our knowledge of the response to plants to stimulus."

ডারউইনের যোগ্য ছাত্র Sir Lauder Brunton জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সম্পর্কে বলেছিলেন, "......All the experiments I have yet seen are crude in comparison with yours in which you show what a marvellous resemblance there is between the reactions of plants and animals..."

জার্মান Encyclopaedia 'Und Menschenwerke' জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদতাত্ত্বিক কাজ সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছিল, "...At that time, too (1894) he was occupied on the technical problem of firing weapons and explosives at a distance by means of wireless waves. This was one of the first experiments,... Advancing further along this path Sir. J. C. Bose established the identity of physiological reactions in plants and animals. In this great Indian Savant the pure passion for truth is allied to the most rare gift of cosmic vision."

রাশিয়ার State University তাসকেণ্ডের Prof. Leno এক চিঠিতে জগদীশচন্দ্রের লেখা বই রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করার অনুমতি চেয়ে লিখেছিলেন, "The great success of 'Comparative Electro-physiology' is indivisibly connected with your name. The translation of your works would be of the greatest help to Russian Physiologists."

প্রখ্যাত রাশিয়ান বিজ্ঞানী Timiriazeff জগদীশচন্দ্রের কাজ সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছিলেন, "A very remarkable example of the application of exact physical methods to the physiology of plant is afforded by the labours of the Indian savant whose very name indicates a new era in the development of Science in general. His work must at once be acknowledged as a classic in the field of physiological research...."

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন জগদীশচন্দ্রের সমস্ত জীবনের সম্পর্কে আলোকপাত

করতে গিয়ে বলেছিলেন,"...Years to come every Capital of Europe would have a statue of Sir J. C. Bose. Men like J. C. Bose while belonging to a particular nation, in reality belong to all Nations. They extend the boundaries of knowledge and enrich the culture of the world"

বর্তমানে জগদীশচন্দ্রের পদার্থবিজ্ঞানের কাজ সম্পর্কে Encyclopaedia Britanica মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছে, His work was so much in advance of his time that the precise evolution of it was not possible। মন্তব্যটি যথাযথ। 'মাইক্রোওয়েভ' আবিষ্কার ছাড়াও জগদীশচন্দ্রের গবেষণার অন্য একটি অবদান P-type and N-type Coherers. পরবর্তী কালে এটি P-type ও N-type Semiconductor নামে চিহ্নিত হয়। নোবেল বিজ্ঞানী Brattain জগদীশচন্দ্রের এই গবেষণা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "Between 1889 and 1902 J. C. Bose pioneered in P-type and N-type Semiconductor which Bose called Coherers" (Proc. I. R. E 1954-58)। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র আলোক-কোষ বা photo-cell (তেজোমিটার) আবিষ্কার করেন। এই গবেষণা জগতের অগ্রজ বিজ্ঞানী ব্রুনো ল্যাঙ্গে (Bruno Lange) সম্প্রতি তাঁর বিখ্যাত 'Photo-Element' গ্রন্থে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "গ্যালেনা, টেলুরিয়াম এবং অন্যান্য খনিজ নির্দেশকের আবিষ্কার হয়েছিল সুদূর পূর্বপ্রাচ্যে কলকাতার জগদীশচন্দ্র বসু কর্তৃক। তথ্যটির সন্ধান পাওয়া যাবে আমেরিকার একটি পেটেন্ট-এ।"

আচার্য জগদীশচন্দ্রের এই বিপুল কর্মকাণ্ডের প্রচার সম্পর্কে আমাদের দেশে কিন্তু দুটি ধারা প্রকট ভাবে চোখে পড়ে। প্রথম ধারাটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে 'শনিবারের চিঠির' সম্পাদক সজনীকান্ত দাস দুঃখ করে বলেছিলেন, "জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন ধারণাই নাই। নিতান্তই কিংবদন্তীর জোরে বেতারের সহিত তাহার একটি সম্পর্ক খাড়া করিয়া অনেককেই দুঃখ করিতে শোনা যায়, নেহাৎ পরাধীন দরিদ্র ভারতবাসী বলিয়াই তিনি তাঁর আবিষ্কারের মূল্য পান নাই। মাঝখান হইতে মার্কনি সাহেব নাম করিয়া ফেলিলেন।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্রের জড় পদার্থের সাড়া ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক গবেষণা সম্পর্কেও নানা অদ্ভুত ধারণা দেখতে পাওয়া যেত। আজও সময়ের ব্যবধানে সজনীকান্তের মন্তব্য বহুলাংশে সত্যি।

সাধারণ মানুষের জানার মাধ্যম নানা বিজ্ঞজনের জনপ্রিয় লেখা। জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে যেসব লেখা চোখে পড়ে তার বেশীর ভাগ লেখাই ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান নিয়ে ও একধরনের আবেগকে সম্বল করে

লেখা। তাতে সঠিক তথ্য পাঠকদের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস খুব কম দেখা যায়।

দ্বিতীয় প্রচারটি বহুধা বিভক্ত হলেও মূল সুর তাতে একটিই। যেন তেন প্রকারে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা। এই সব প্রচার সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র সে সময় মোটামুটি একটি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। জানা যায় পয়লা আগস্ট ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে লেখা জগদীশচন্দ্রেরই একটি চিঠি থেকে। জগদীশচন্দ্র দুঃখ করে অধ্যাপক ভাইনস্‌কে লিখেছিলেন, "It is much easier to raise oneself from obscurity by criticising or appreciating the work of a man who is becoming well known. The object of the propaganda is evidently to discredit my work, and as the Government grant is subject to the vote of Delhi Assembly (House of Commons) it might serve to harm the Institute by the refusal of grant."

জগদীশচন্দ্র নিজের চেষ্টায় গবেষণা শুরু করেছিলেন। এ কথা আজ সবারই জানা। সবসময়ই গবেষণার প্রয়োজনে সরকারী সাহায্য অনিয়মিত ছিল। তিনি তাঁর গবেষণা শুরুর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "What was my equipment and what was my laboratory? There were practically no instruments, and the extent of my laboratory was a small room about 20 ft square with an attached bath-room." তাই হয়তো তিনি তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অপপ্রচারকে সে সময় বহুকষ্টে তৈরি বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের সরকারী অর্থসাহায্য কমানোর অপপ্রয়াস ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন নি। কিন্তু আজ সময়ের ব্যবধানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে সেদিনের অপপ্রচারগুলি কি শুধুই বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের সরকারী সাহায্য কমিয়ে দেওয়ার প্রয়াস? না এর মূল অনেক গভীরে ছিল? জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে অপপ্রচারের ঘটনা প্রবাহকে খুঁটিয়ে যাচাই করলে আশ্চর্য এক ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। তাতে মনে হয় এই অপপ্রচারের উদ্দেশ্য অন্য। ভারতীয়রা নিজের চেষ্টায় বিজ্ঞান গবেষণার পথিকৃৎ হবে—এ সত্য একধরনের আমলা ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল মানুষের কাছে অসহ্য ছিল। সুতরাং অভীষ্ট সিদ্ধির প্রথম সোপান আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণার জনক আচার্য জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা। আর ভাবী-কালের মানুষের কাছে বলা—না, আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা পশ্চিমের আশীর্বাদেই শুরু হয়েছিল। এতে ভারতীয়দের কোন প্রচেষ্টা নেই। এই প্রচেষ্টার দু-একটি নমুনা পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ব্রিটিশ কর্ম-কর্তারা নিজেদের প্রয়োজনে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ খুঁজে বার করার

কাজ শুরু করেন। কাজকে ত্বরান্বিত করতে গেলে প্রয়োজন লোকবল। ভারতের মাটিতে ভারতীয় কর্মী নিয়োগই সুবিধাজনক। তাই এই সব অনুসন্ধানে কিছু ভারতীয় নিয়োগ করা হয়েছিল, তবে বিনা শর্তে নয়। জানা যায়, সে সময়ের সৈন্যবিভাগের একাউণ্ট জেনারেলের গোপন এক নির্দেশ-নামা থেকে। গোপন নির্দেশটি পাঠান হয়েছিল তদানীন্তন সার্ভেয়ার জেনারেলকে। তাতে লেখা, throw cold water on all natives being taught or employed in making Geographical discoveries. তারপর ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে যখন ডাঃ ভোলানাথ বসু প্রথম ভারতীয় হিসেবে লণ্ডন থেকে M. D. পাশ করে দেশে ফেরেন তখন তাঁকে কোন উচ্চ পদ দেওয়া হয় নি। সে সময়ের সরকারী রিপোর্টে লেখা আছে, "যদিও 'কাউন্সিল অব এডুকেশন' উক্ত ব্যক্তিকে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকরূপে নিয়োগ করতে সুপারিশ করেছেন কিন্তু ডাঃ বসুকে ঐ পদ দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ এতে অন্যান্য ভারতবাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষী হবে।" তারপর ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগ দেন তখন একই যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ভারতীয় অধ্যাপকের বেতন ছিল ইয়োরোপীয় অধ্যাপকের দুই-তৃতীয়াংশ আর চাকুরী পাকা না হলে তারও অর্ধেক। এই অসম ব্যবস্থার প্রতিবাদে ও সংগ্রামে জয়ী হতে জগদীশচন্দ্রের তিন বছর লেগেছিল। এ.সময় তদানীন্তন D. P. I. জগদীশচন্দ্রকে বলেছিলেন,... Indians are temperamentally unfit to teach the exact method of modern Science। জগদীশচন্দ্র ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বৈজ্ঞানিক জয়-যাত্রা ও সফর শেষে দেশে ফেরার পর সরকারের কাছে কিছুটা আর্থিক সুবিধার জন্য আবেদন জানালেন। কারণ আর্থিক অসঙ্গতি যেন তাঁর গবেষণার পথে অন্তরায় না হয়। আবেদনপত্রটিতে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের ভাইসরয় কাউন্সিলের ফিনান্স মেম্বার অদ্ভুত এক মন্তব্য করেছিলেন। মন্তব্যের তারিখ ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দ। আবেদনপত্রটির ফুটনোটে লেখা: He (Bose) is now drawing Rs. 500/- and it is simple nonsense on the part of a native gentleman in the services of the Government to talk under such circumstances of 'difficulty in maintaining himself on his small means'. I wonder what any of the Universities in England would say to any of its staff who said, "I am a distinguished man, and you must agree to give me, on that account more than the allowance of my offices. I think Mr. Bose has got his head a bit turned and he can wait a bit for his distinctions and records." অবশ্য ব্রিটিশ সরকারের হোম মেম্বার দার্শনিক J. Woodburn এ ব্যাপারে লিখেছিলেন, "Mr. Bose's distinction is not ordinary

distinction, and as to the adequacy of his salary. I am personally aware that it has not been sufficient to meet the expenses of his experiments and tours."

জগদীশচন্দ্রের যুগান্তকারী (আজকের) পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক কাজগুলো সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক প্রচার কম চোখে পড়ে। কারণ জগদীশচন্দ্রের পদার্থ-বিজ্ঞানের কাজগুলো ছিল পাশ্চাত্ত্য চলমান গবেষণার বিস্ময়কর অগ্রগতি। কিন্তু জগদীশচন্দ্র যখন জড় পদার্থের সাড়া ও উদ্ভিদতত্ত্ব নিয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কার করে নিজের নতুন চিন্তার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে বিশ্ববাসীকে জানাচ্ছেন, ঠিক তখনই অপপ্রচারের পদধ্বনি শোনা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে মাত্র অল্প কয়েকটি বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচারের নমুনা পাঠকদের সামনে উপস্থিত করছি। এই প্রচারগুলো বিস্ময়কর হলেও তখনকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ। জগদীশচন্দ্র সবে ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph) যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন (দশ লক্ষ গুণ বড় করে উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপক যন্ত্র)। গাছের বৃদ্ধির ওপর বিভিন্ন উত্তেজক পদার্থের প্রতিক্রিয়া খতিয়ে দেখছেন। ১৯-এ মে তারিখের 'Daily News' পত্রিকায় খবর বেরুল :

DRUNKEN FLOWERS

Discovery of Famous Indian...

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর তারিখের Popular Science Sifting Vol. LXIIX. No 1774 Tuesday, জগদীশচন্দ্রের "Photosynthetic bubbler Recorder" (গাছের সালোক-সংশ্লেষণ পরিমাপক যন্ত্র) সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখল :

PLANTS THINK AND FEEL

...Recent discoveries by Sir Jagadish Chandra Bose the distinguished Plant Psychologist of Calcutta......এই একই গবেষণা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'Northern Whing' কাগজ ২১.৮.১৯২৫ তারিখে লিখল :

THYROID GLAND ON PLANTS

Indian Doctor's Test...

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্র এই যন্ত্রটির পরীক্ষা বিজ্ঞানী অলিভার লজের আগ্রহে ৭ই ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে বিলেতের 'ইণ্ডিয়া হাউজে' দেখিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতায় বহু প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের সমাবেশ হয়েছিল, বক্তৃতাকক্ষের প্রথম সারিতে বসেছিলেন ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড। পাশে ছিলেন জর্জ বার্নার্ড শ ও ভারতের

প্রাক্তন গভর্নর জেনারেল হার্ডিঞ্জ। সভাশেষে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। বার্নার্ড শ জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করে রামজে ম্যাগডোনাল্ডকে বলেছিলেন, "ডঃ বোস শীঘ্রই হয়তো এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করবেন, যা দিয়ে রাজনীতিবিদ ও অন্যান্যদের কার্যক্ষমতা যন্ত্রলিপির মাধ্যমে এঁকে দেখাবেন এবং বিভিন্ন ধরনের কাজে সবার দক্ষতাও নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করতে সক্ষম হবেন।"

উদ্ভিদের উপর উষ্ণতার প্রভাব সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র গুটিকয়েক সুন্দর গবেষণা করেছিলেন। তবে এ গবেষণায় জগদীশচন্দ্রের অপরাধ (?) একটিই ছিল। কারণ যে-গাছটিকে নিয়ে তিনি তাঁর প্রাথমিক গবেষণাপর্ব শুরু করেছিলেন, ঘটনাচক্রে সেই গাছটির অবস্থিতি ছিল একটি মন্দির প্রাঙ্গণে। স্বাভাবিক কারণেই প্রতি সন্ধ্যায় মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি হতো। এ গবেষণা সম্পর্কে 'Morning Post' কাগজ মূল গবেষণা ও তার ফলাফলকে আড়াল করে ৯ই নভেম্বর ১৯২৫ তারিখে খবরের শিরোনামে লিখল :

TREES' REACTION TO SOUND

কয়েকদিন পর ১২ই নভেম্বর তারিখে 'Glasgow Herald' কাগজ একই কায়দায় লিখল :

...It has been found that plants do react to sound, and that, for example, a certain palm tree bends earthwards as if in obeisance when the temple bells in the vicinity begin to ring, Sir Jagadis Ch. Bose....

জগদীশচন্দ্র বনচণ্ডাল গাছের (Desmodium gyrans) স্বতঃস্পন্দন ও তার বৈদ্যুতিক লিপি নিয়ে কাজ করছেন। সবে তিনি তখন 'Plant Phytograph' যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। ৩০-এ জুন ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের 'West Minster Gazette' জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কার সম্পর্কে বলল :

HEART BEATS OF PLANTS

More emotional than Human beings. The plant SPOKE and wrote its life's history with the leaves। এ বিষয়ে 'Daily News' কাগজ ২৬-এ মে ১৯২৭ তারিখে তাদের সংবাদের শিরোনামে লিখল :

THE PLANT PSYCHOLOGIST !

ঐ একই গবেষণা বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ২২.৫.১৯২৭ তারিখের 'Reference' ও ২৬.৬.১৯২৭ তারিখের 'Observer' পত্রিকা তাদের প্রতিবেদনের শিরোনামে লিখল :

THE PERSONALITY OF PLANTS

এ-জাতীয় অপপ্রচারের সুযোগ নিয়ে জনৈক Mr. Dastur বোম্বের Sir Cowasjee Jahangir Hall-এ এক ভাষণ দিলেন। তিনি বলে বসলেন, জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদতাত্ত্বিক গবেষণা নাকি ঠিক নয়। খবরটি দু'একটি কাগজেও প্রকাশিত হল।

এতদিন সমস্ত অপপ্রচারকে জগদীশচন্দ্র অসীম ধৈর্য সহকারে উপেক্ষা করে এসেছেন। কিন্তু এবার আর তা সম্ভব হলো না। তিনি Mr. Dastur সম্পর্কে মন্তব্য করতে বাধ্য হলেন। তিনি বললেন, "The greatest Scientists in the world have accepted my theory and I cannot condescend to enter into a controversy with a novice in Science" জগদীশচন্দ্রের বক্তব্যটি ৫ই অক্টোবর ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের 'Englishman' কাগজে প্রকাশিত হল। দু'চারদিনের মধ্যেই জগদীশচন্দ্র সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আরও একটি ঘোষণা করলেন। তাতে তিনি বললেন, In answer to the misrepresentation that my work shows a proneness to mysticism, I can do no better than quote the following from a review of one of my recent works that appears in the 'New York Times'. The reviewer unlike many others, taking care to read through the book and stating that, "It is impossible to ignore the relentless logic of his conclusion which are based upon the most modern methods of Scientific laboratory procedure. There is not a trace of mysticism; but it does contain miracles aplenty—modern laboratory miracles..."

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সব অপপ্রচারে বিজ্ঞানী মলিশ (রেক্টর, ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়) মর্মাহত হয়ে চৌঠা আগস্ট তারিখে (১৯২৮) 'Nature' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বলেছিলেন, তিনি বহু বছর ধরে জগদীশচন্দ্রের প্রায় সমস্ত উদ্ভিদতাত্ত্বিক গবেষণা সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল। জগদীশচন্দ্রের সমস্ত উদ্ভিদতাত্ত্বিক গবেষণা নিঃসন্দেহে আধুনিক বিজ্ঞানের নতুন দিশারী।

শুধু বিদেশীরাই নন; কিছু দেশীয় মানুষও জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। এই সব দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ সম্পর্কে ৩০-এ সেপ্টেম্বর ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের 'Forward'-কাগজ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিল, "It is a striking coincidence that at about the time when Sir J. C. Bose has returned to his native land, rich in honour, conscious of the triumphs he has achieved abroad, some of his own countrymen should seek to assail his undisputed position···" এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। জগদীশচন্দ্র যখন সফলতায় দীপ্যমান তখন দেশীয় দু-একজন

মানুষ জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে বিচিত্র এক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, জগদীশচন্দ্র যশাকাঙ্ক্ষী। তাই তিনি তাঁর সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মাতৃভাষায় না লিখে ইংরেজী ভাষায় লিখেছেন। জগদীশচন্দ্র এই অপবাদের উত্তরে ঘৃণাভরে বলেছিলেন, "ইংরেজীভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার যাহা কিছু আবিষ্কার সম্প্রতি বিদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে তাহা সর্বাগ্রে মাতৃভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল।…কিন্তু আমার একান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশের সুধী শ্রেষ্ঠদিগের নিকট তাহা বহুদিন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ও বিদেশের 'হল' মার্কা না দেখিতে পাইলে কোন সত্যের মূল্য সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান হইয়া থাকেন। বাংলাদেশে আবিষ্কৃত, বাংলাভাষায় লিখিত তত্ত্বগুলি যখন বাংলার পণ্ডিতদিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল তখন বিদেশী ডুবুরীগণ এদেশে আসিয়া যে নদীগর্তে পরিত্যক্ত আবর্জনার মধ্যে রত্ন উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইবেন ইহা দুরাশামাত্র।" আচার্য জগদীশচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ ঘটে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩-এ নভেম্বর। তারপর বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের কর্ণধার হন জগদীশচন্দ্রের উত্তরসূরী (ভাগিনেয়) অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু। তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বছর বিজ্ঞান-মন্দিরের কর্ণধার ছিলেন। অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন কর্মজীবন থেকে অবসর নেন ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে প্রায় ৮৭ বছর বয়সে। ১৯২৮ থেকে ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দ। অর্থাৎ জগদীশচন্দ্রের সেই প্রকাশ্য উক্তির পর থেকে দেবেন্দ্রমোহনের কর্মজীবনের শেষদিন পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে অপপ্রচার খুব কম চোখে পড়ে। এরপর আবার নতুন করে কিছু বিদেশী ও দেশী এই দুই অপপ্রচারই শুরু হয়েছে।

১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১০ই অক্টোবর Peter Tompkins নামে এক ভদ্রলোক বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে দর্শনার্থী হয়ে আসেন। তিনি তাঁর নিজের লেখা 'The Secret life of Plants' নামে একটি বই বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রবীণ কর্মীদের উপহার দেন। বর্তমান প্রবন্ধ-লেখককেও এককপি বই উপহার দিয়েছিলেন। বইটির প্রথম পাতায় লেখক-পরিচিতিতে দেখা গেল উনি বিজ্ঞানের ছাত্র কিনা সে বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। শুধু লেখা আছে, "Peter Tompkins…Educated at Harvard College, Columbia University…he became a war correspondent in Europe…was later involved in intelligence work in Europe. He is the author of a number of works of biography…"

বইটির অধিকাংশ রচনাই Plant Psychology-বিষয়ক কথাবার্তায় ভরা। মাঝে জগদীশচন্দ্রের কিছু কাজের উল্লেখ অন্তে চোখে পড়ে। ১৯৭৬

খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে রিজিওন্যাল সেণ্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্‌ম্ সেনসরের অনুমতি নিয়ে Mr. Walon Green নামে এক ভদ্রলোক 'The Secret life of Plants' নামে পূর্ববর্ণিত বইটির চিত্ররূপ দেওয়ার জন্য বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে হাজির হন। বইটির চিত্ররূপ আরও নগ্ন। স্বাভাবিক কারণেই উক্ত ব্যক্তিকে জগদীশচন্দ্রের কোন কিছুর (যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ছবি) ছবি তুলতে অনুমতি দেওয়া হয় নি। ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই মার্চ তারিখে Mr. Marcel Vogel নামে অন্য এক ভদ্রলোক বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে দর্শনার্থী হয়ে আসেন। তিনি জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রপাতি ও তার পরীক্ষা দেখে বলেন, জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ প্রশংসার দাবী রাখে। বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে এসে নিজেকে তিনি ধন্য মনে করছেন। তিনি নাকি জগদীশচন্দ্রের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে ইতিমধ্যে কিছু কাজ করে ফেলেছেন। তিনি দাবী করলেন, বহু পরিশ্রমে ও কঠোর নিষ্ঠায় তিনি ভারতীয় যোগ চর্চা রপ্ত করে গাছের উপর আরও কিছু গবেষণা ইতিমধ্যে শেষ করেছেন। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় প্রমাণ করেছেন, যোগ সাধনায় গাছের বৃদ্ধি ভীষণভাবে বাড়িয়ে দেওয়া যায়। প্রয়োজনে কমানও সম্ভব। বর্তমান প্রবন্ধ লেখক জগদীশচন্দ্রের বিখ্যাত ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রে একটি ছোট্ট ঘাস লাগিয়ে Mr. Vogel-কে তাঁর যোগ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অনুরোধ করেন। বহু প্রবীণ বিজ্ঞানীর উপস্থিতিতে তিনি শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে কিছুটা অসহায়ভাবে বলেন, পরীক্ষাধীন গাছটি আমার যোগ ক্ষমতা থেকে বেশী শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছে। পরের দিন আবার চেষ্টা করবেন এই কথা দিয়ে তিনি সেদিনের মত বিদায় হন। কিন্তু পরে আর কোন দিনই তাঁকে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের কাছে-পিঠে দেখা যায় নি। এজাতীয় নাটকের চূড়ান্ত ঘটনা ঘটে এ ঘটনার প্রায় মাস পাঁচেক পরে। ২২-এ আগস্ট ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে Dr. Novillo Pruli নামে আর একজন ভদ্রলোক বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে এসে দাবী করেন তিনি নাকি জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদতাত্ত্বিক গবেষণার একজন মুগ্ধ ভক্ত। শুধু বসু বিজ্ঞান-মন্দির দর্শনের জন্যই ভারতবর্ষে আসা। জগদীশচন্দ্রের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে তিনি নতুন এক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছেন। একই জমিতে একই সঙ্গে একই রকমের গাছের বীজ পুরুষ ও নারী আলাদা আলাদা বপন করলে, পুরুষদের হাতে লাগানো বীজ অপেক্ষা নারীদের হাতে লাগানো বীজ থেকে আগে গাছ বড় হয়। ভাল ফসল ফলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এজাতীয় কপট বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে 'Science Today' পত্রিকায় ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর সংখ্যায় 'The Not So-Secret life of Plants' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বসু বিজ্ঞান-মন্দির থেকে প্রবন্ধটির সমর্থনে তাঁদের এ জাতীয় অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে 'The Danger of Pseudo Science' নামে একটি চিঠি পত্রিকাটিতে

পাঠান হয়। চিঠিটি ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ তো গেল বিদেশী অপপ্রচারের আধুনিক রূপ।

সম্প্রতি দেশেও জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে বেশ কিছু বিভ্রান্তিমূলক প্রচার শুরু হয়েছে। আশীষ নন্দী নামে দিল্লীর Centre for the Study of Developing Societies-এর জনৈক মনস্তত্ত্ববিদ (?) একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম 'Alternative Sciences'। তাতে তিনি শুধু জগদীশচন্দ্রকেই হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন নি, ভারতের প্রথম F.R S. রামানুজনকেও এক হাত নিয়েছেন।

জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর অভিযোগগুলো বড় মজার। আশীষবাবু বলেছেন, জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক ফলাফল যথাযথ নয়, গোঁজামিলে ভরা। এক কথায় তিনি বলতে চেয়েছেন, জগদীশচন্দ্র তাঁর কাছে ধরা পড়ে গেছেন। জগদীশচন্দ্র নাকি বন্ধু বান্ধব ও সাংবাদিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিজের কাজ সম্পর্কে প্রচার করিয়েছিলেন। তা ছাড়া, জগদীশচন্দ্র অঙ্ক জানতেন না। তাই তিনি নাকি পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা ছেড়ে উদ্ভিদ-চর্চা করেন। বইটির অন্য এক জায়গায় জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন প্রতিভাধর পদার্থবিদ্ পরের জীবনে প্রভাবশালী উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী হয়েছিলেন। ইত্যাদি আরও অনেক কথা। ধন্য তাঁর মনস্তাত্ত্বিক (?) বিশ্লেষণ! কারণ তিনি পৃথিবীর প্রথম সারির সর্বকালের সমস্ত বিজ্ঞানীদের ভুল ধরে দিয়েছেন!

জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও তিনি কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেছেন, জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তিতে ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিলেন। আশ্চর্য কল্পনা শক্তি! রবীন্দ্রনাথের সম্মান প্রাপ্তি উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন,...পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্য ভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর হইল।... চিরকাল শক্তিশালী হও। চিরকাল জয়যুক্ত হও...। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি উপলক্ষে ও রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলার বুদ্ধিজীবী মহল থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে দুটি বিশেষ সম্বর্ধনা জানান হয়েছিল তারও সভাপতি ছিলেন জগদীশচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন,..."আজিকার এই জয়ন্তী উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হোক।..." আর জগদীশচন্দ্রের ৭০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "...ভাবীকালের চিত্তে তোমার স্মৃতির সঙ্গে আমার স্মৃতি জড়িত হয়ে থাকবে এই আমার আনন্দ।..." রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র দুজনেই দুজনের প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহক সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে স্বাভাবিক কারণেই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক কারণে ও নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের নানা গঠনমূলক কাজের প্রয়োজনে উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ কিছুটা কম হত। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত 'The Nervous Mechanism

of Plants' বইটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন, "TO MY LIFE-LONG FRIEND RABINDRA NATH TAGORE"। মৃত্যুর বছর খানেক আগেও জগদীশচন্দ্র বিশ্বভারতীর উন্নতিকল্পে অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু (যিনি কিছুকাল আগে ক্রিকেট নিয়ে ও পরে স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ে লিখেছেন) সম্প্রতি নিবেদিতার উপর গ্রন্থ ও 'দেশ' পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছেন। এই সব লেখাগুলোতে তিনি নানাভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জগদীশচন্দ্রের ভাবমূর্তি ম্লান করার চেষ্টা করেছেন ও নানা মন্তব্যের মধ্য দিয়ে নিজের অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমানে তাঁর লেখা বই ও ধারাবাহিক প্রবন্ধ থেকে সামান্য কয়েকটি বিভ্রান্তিমূলক প্রচার পাঠকদের দরবারে তুলে ধরছি।

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম পরিচয় ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে। স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর নিবেদিতার সঙ্গে বসু পরিবারের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তখনকার সমাজব্যবস্থায় কোন বিদেশী মহিলার সঙ্গে মেলামেশা করার মানসিকতা সাধারণ ভারতীয় জনমানসে গড়ে ওঠে নি। ব্রাহ্ম আন্দোলনের আলোকপ্রাপ্ত বসু পরিবারসহ গুটিকয়েক পরিবার এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। নিবেদিতা সে সময় বসু পরিবারের কয়েকটি ভ্রমণেরও সঙ্গী হন। তা ছাড়া, তিনি জগদীশচন্দ্রের অসীম সংকল্প ও বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করার দৃপ্ত মানসিকতা দেখে মুগ্ধ হন। তারপর থেকে নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রকে বিজ্ঞানের কাজে নানাভাবে উৎসাহ দেন। কিন্তু শঙ্করীবাবু তাঁর লেখার শুরুতেই যুদ্ধ ঘোষণা করে বলেছেন, "নিবেদিতাকে যাঁরা নিছক ধর্মান্দোলনে যুক্ত দেখেন,...তাঁরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভুলে যান জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান সাধনার পিছনে অন্য যে-কোনও ব্যক্তি অপেক্ষা এই নারীর দান অধিক।" এ ধরনের বক্তব্যের অবতারণা নিতান্ত অনুচিত। কারণ মহাপুরুষদের জীবনের গতি খরস্রোতা নদীর মত। আপন নিজস্ব গতিতেই সে চলে। কে বেশী কে কম সাহায্য করেছেন তা দাঁড়িপাল্লায় মাপতে যাওয়া নিছক বিড়ম্বনা মাত্র।

শঙ্করীবাবুর পরবর্তী বক্তব্য নজীরহীন। তিনি বলেছেন, নিবেদিতার 'আশ্চর্যজনক ক্ষমতা' ছিল। তা দিয়ে তিনি জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখে দিয়েছেন ও বইয়ের বৈজ্ঞানিক নক্সা (Scientific Diagram) প্রস্তুত করে দিয়েছেন। জগদীশচন্দ্রের "Plant Response as a means of Physiological Investigation (1906)" গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শঙ্করীবাবু তাঁর 'নিবেদিতা লোকমাতা' (১ম খণ্ড) গ্রন্থের ৬৬০ পাতায় মন্তব্য করেছেন, "আবিষ্কারের অংশ জগদীশচন্দ্রের, প্রেরণার প্রধান অংশ নিবেদিতার, রচনাংশ তাঁরই, নক্সা প্রভৃতিও বহুলাংশে তিনিই করেছেন···।" আশ্চর্য!

১৯০১ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই বইটি লেখার প্রস্তুতি পর্বে জগদীশচন্দ্রের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্রের চিঠিতে। পাঠকদের উদ্দেশে সেই চিঠিগুলো থেকে তিনটি চিঠির অংশবিশেষ তুলে ধরছি।

(১) "লণ্ডন, ৬ই জুলাই ১৯০১, বন্ধু,...সম্মুখে অজ্ঞাত রাজ্য, আমি একাকী পথ খুঁজিয়া একান্ত ক্লান্ত—কখন একটু আলোক পাই তাহারই সন্ধানে চলিতেছি। তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই—সেই মাতৃদেবী ব্যতীত আমার আর কি উপাস্য আছে—তাঁহার বলেই আমি বল পাই—আমার আর কে আছে? তোমাদের স্নেহে আমার অবসন্নতা চলিয়া যায়।...তোমাদের আশাতে আমি আশান্বিত।..."

(২) "১৮ই আগস্ট ১৯০৩, ৯৩ নং আপার সার্কুলার রোড। আমি এত লোকের মধ্যে এখানে সম্পূর্ণ একাকী মনে করি। তুমি কবে আসিবে তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছি। আমি একটা খুব বড় তথ্যের অনুসন্ধান লইয়া ব্যস্ত আছি। কিন্তু তুমি কাছে নাই বলিয়া কার্যে অবসাদ জন্মে।..."

(৩) "২৯. ৬. ১৯০৪ ...ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে কিরূপ বাধার সহিত আমাকে সংগ্রাম করিতে হইতেছে। তোমাকে লিখিয়া বোঝা অনেক দূর হইল, কয়দিন পর পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিব।..." (এই চিঠিতে জগদীশচন্দ্র যে বইটি লেখার কথা উল্লেখ করছেন সেটি হ'ল "Plant Response as a means of Physiological Investigation" ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত)

এই ২৯. ৬. ১৯০৪ চিঠিরই শেষদিকে নিবেদিতার সে সময়ের কর্মব্যস্ততা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র লিখেছেন, "...Sister নিবেদিতা ও Christine তোমার বাড়িতে স্কুল খুলিবার জন্য বিশেষরূপে লাগিয়াছেন। তবে ছাত্রী যোগাড় কি করিয়া করিবেন জানি না—আর টাকারও দরকার মনে হয়। নিবেদিতা আশা করিতেছেন যে, তাঁহার নূতন পুস্তক বিক্রয় দ্বারা এই অভাব কতকটা দূর হইবে।...তোমার বন্ধুদের মধ্যে এই পুস্তক (নিবেদিতার বই) বিক্রয়ের সুবিধা করিও।..."

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্রের "Plant Response as a means of Physiological Investigation" বইটি ৩৮+৭৮১ পাতার। তাতে ২৮৭টি বৈজ্ঞানিক নক্সা (Scientific Diagram) ও ছবি রয়েছে। বইটি রচনা করতে জগদীশচন্দ্রের দু'বছর সময় লেগেছিল।

শঙ্করীবাবু তাঁর 'লোকমাতা নিবেদিতা' (১ম খণ্ড) গ্রন্থের ৫৯২-৫৯৩ পাতায় ছোট্ট আধ পাতার এক পাণ্ডুলিপির (?) প্রতিচ্ছবি হাজির করেছেন। তাতে লেখা "জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ও নিবেদিতার রচনা..." এখানে জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থের (কোন্ গ্রন্থ বলেন নি। যিনি বিচারকে

ইতিহাস অনুসন্ধানকারী বলে প্রচার করেন তাঁর পক্ষে এটি রীতিবিরুদ্ধ কাজ) একটি অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি দেওয়া হল—হস্তাক্ষর নিবেদিতার।" কিন্তু জগদীশচন্দ্রের লেখা গ্রন্থগুলোতে ঐ তথাকথিত পাণ্ডুলিপির কোন অস্তিত্বই নেই। যদি শঙ্করীবাবুর কথামত জগদীশচন্দ্রের কোন এক গ্রন্থের কোন এক পৃষ্ঠায় ঐ তথাকথিত পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত তা হলেই বা ঐ ছোট্ট চিরকুট থেকে কি প্রমাণিত হত ?

সে যুগে যেসব গবেষণা জগদীশচন্দ্র করেছিলেন তা সবই ছিল অগ্রবর্তী মৌলিক গবেষণা। মূল কাজের সঙ্গে আগাগোড়া প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলে কখনো কি কারো পক্ষে সম্ভব (বিশেষত যিনি বিজ্ঞানী নন ; শঙ্করী-বাবুর ভাষায় যিনি "মোটামুটি শিক্ষিত") বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করে রচনা ও নক্সা প্রস্তুত করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্র তাঁর এ পর্যায়ের গবেষণার শুরুতে রবীন্দ্রনাথকে লণ্ডন থেকে ১৫ই অক্টোবর ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে এক চিঠিতে বলেছিলেন, "···তুমি জান না তোমার পত্র পাইয়া আমি কিরূপ আশ্বস্ত হই। আমার পদে পদে কত বিঘ্ন তাহা তুমি মনেও করিতে পার না।.. আর আমার কার্য এরূপ কঠিন যে ইংলণ্ডে ২।৩ জন লোক (বিজ্ঞানী) ব্যতীত আমার শ্রোতামণ্ডলী নাই, তাহারাও পুরাতন মতের অবলম্বী।···"

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে নিবেদিতার পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব নয় তার আরও একটি প্রমাণ চিন্তাশীল পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। শঙ্করীবাবু পরিবেশিত (দেশ পত্রিকার প্রবন্ধে ৪ঠা ডিসেম্বর।) নিবেদিতার ২৪-এ এপ্রিল ১৯০৭ চিঠির একটি লাইন তুলে ধরছি। নিবেদিতা লিখছেন, "···এর পরেই অবিলম্বে সে (জগদীশচন্দ্র) 'সাইকলজিক্যাল ইনফারেন্স' সংক্রান্ত দুটি অধ্যায় জুড়ে দিয়েছেন।" কিন্তু জগদীশচন্দ্র কোনদিনই 'সাইকলজিক্যাল ইনফারেন্স' বলে কোন কাজ করেন নি। উনি কাজ করেছিলেন ও লিখেছিলেন সম্পূর্ণ অন্য এক বিষয়ে, তা'হল 'সাইকোফিজি-ক্যাল ফেনোমেননের' উপর। যিনি অগ্রবর্তী বিজ্ঞান গবেষণা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লেখেন তিনি এ ভুল কখনোই করবেন না। কিন্তু নিবেদিতার পক্ষে এ ভুল খুবই স্বাভাবিক। কারণ তিনি বিজ্ঞানী নন। তিনি ছিলেন জগদীশচন্দ্রের পারিবারিক বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী। জগদীশচন্দ্র সর্বমোট ১৪টি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করেন। নিবেদিতা বেঁচে থাকতে তিনটি। নিবেদিতা হয়তো জগদীশচন্দ্রকে বই লেখার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন তবে সেটি কোন্ ধরনের তা পরিষ্কার নয়। প্রুফ রিডিং, ডিকটেশন নেওয়া ইত্যাদি নানা-ভাবে লেখককে সাহায্য করা যায়। উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্র তাঁর বইগুলোকে উৎসর্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর স্ত্রী অবলাদেবী ও অন্যান্যদের নামে।

শঙ্করীবাবু তাঁর ধারাবাহিক প্রবন্ধের (৮ই ডিসেম্বর ১৯৮২) এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, "১৮১৭ (?) খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে থাকা কালে ভালো চাকরির

প্রস্তাব পেয়েও বসু (জগদীশচন্দ্র) প্রত্যাখ্যান করেন, তার জন্য পশ্চাত্তাপ করতে হয়েছিল তাঁকে। শ্রীমতী বসুরও সেজন্য ক্ষোভ ছিল।" নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয়ের আগে ১৮৯৬-৯৭ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র যখন ইয়োরোপে বৈজ্ঞানিক সফরে যান তখন অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন তাঁকে ইংলণ্ডে অধ্যাপনার কাজ নিতে অনুরোধ করেন। জগদীশচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া জানা যায় অবলা বসুর 'বাঙ্গালী মহিলার পৃথিবী ভ্রমণ' প্রবন্ধে। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "তাহারা দুজনেই (অলিভার লজ ও কেলভিন) আচার্যকে ইংলণ্ডে থাকিয়া অধ্যাপক হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের হাওয়া ছাড়া তিনি কাজ করিতে অসমর্থ বলিয়া আচার্য তাহাদিগকে অসম্মতি জানাইলেন।" দ্বিতীয় আমন্ত্রণ আসে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। অধ্যাপক Barret বলেন, "We had a talk last-night (Lodge was one of them). We thought your time is being wasted in India, and you are hampered there. Can't you come over to England? Suitable chairs fall seldom vacant here, and there are many candidates. But there is just now a very good appointment and should you care to accept it, no one else will get it." এই আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে জগদীশচন্দ্র ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে উপরের আমন্ত্রণলিপি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, "...আমার সমস্ত inspiration-এর মূলে আমার স্বদেশীয় লোকের স্নেহ—সেই স্নেহ বন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল?" জগদীশচন্দ্র সর্বদাই বলতেন, "আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে, যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি তাহা হইলে আমার জীবন ধন্য হইবে।" তা ছাড়া, তিনি ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে একবার বলেছিলেন, "প্রেসিডেন্সী কলেজের সহিত সংস্রব সহজে একেবারে কাটিতে চাই না, কারণ তাহা হইলে আমার কার্যে কোন বাঙ্গালী নিযুক্ত হইবে না।"

জগদীশচন্দ্রের কথা থেকে কি মনে হয় যে তাঁর 'পশ্চাত্তাপের' কারণ ছিল? বরং গর্বভরে বারবার তিনি দেশমাতৃকার কথা উল্লেখ করেছেন। আর যাঁর স্বামীর হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে, যিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতৃব্য দেশপ্রেমিক দুর্গামোহন দাশের কন্যা, রক্তে যাঁর পূর্ণ স্বদেশীয়ানা, যিনি স্বামী বিবেকানন্দের কাছে 'সর্বগুণসম্পন্না গেহেণী', তাঁর কি বিদেশী চাকুরী প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নে ক্ষোভ আসতে পারে?

নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জগদীশচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করেছিলেন। নিবেদিতার মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর বাদে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ৩০-এ নভেম্বর বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শঙ্করীবাবু এ ব্যাপারে জগদীশচন্দ্রের কঠোর পরিশ্রম, দেশবাসী ও

জাতীয় নেতাদের অকুণ্ঠ দান ও সহযোগিতার কথা কার্যত অস্বীকার করে বলেছেন, "ল্যাবরেটরি (বসু বিজ্ঞান-মন্দির) স্থাপনের চেষ্টায় নিবেদিতা নেত্রীত্ব গ্রহণ করেছিলেন।" নিবেদিতা সে যুগে অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু শঙ্করীবাবু তাঁর নিজস্ব সংলাপকে প্রতিষ্ঠা করার অত্যুগ্র আগ্রহে যে অতিরঞ্জিত বক্তব্য রেখেছেন তাতে তিনি পরোক্ষভাবে নিবেদিতাকেও ছোট করেছেন। কারণ নিবেদিতা যা করেন নি তা জোর করে প্রমাণ করতে গেলে নিবেদিতাকেও ছোট করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমান গ্রন্থের অন্যত্র বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ণ ইতিহাস পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হয়েছে।

বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রবেশদ্বারে প্রদীপ হাতে একটি নারীমূর্তির ছবি আছে। জগদীশচন্দ্র এটি প্রতিষ্ঠা করে বলেছিলেন, "Entering the Institute, the visitor finds to his left the lotus fountain with a bas-relief of a woman carrying light to the temple. Without her no light can be kindled in the Sanctuary. She is the true light bearer and no plaything of man." (Is the Plant a Sentient being"—J. C. Bose, The Century Magazine, Feb., 1929. Vol. 117, No 4)। জগদীশচন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন এটিকে জ্ঞানের প্রদীপ হাতে ভারতমাতা দাঁড়িয়ে আছেন—এই কথাই সকলে জানতেন। তখনকার সব পত্র-পত্রিকাতেও এই একই কথা লেখা আছে। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর দু-একজন বলতে আরম্ভ করলেন ঐ মূর্তিটি নিবেদিতার। এই প্রচারের অন্যতম প্রচারক হলেন অমল হোম। তিনি জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী পুস্তিকাটি সম্পাদনা করেন। তাতে উনি বলেছেন মূর্তিটি নিবেদিতার অথচ উনি যখন "Calcutta Municipal Gazette"-এর সম্পাদক ছিলেন (জগদীশচন্দ্রের জীবনকালে) তখন ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর ও ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল জগদীশ সংখ্যায় মূর্তিটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন,—"Above a limpid lotus pool on the wall standing between the residence of Sir Jagadis and the Bose Institute a bronze plaque with the figure of a woman carrying a lamp simbolizes womanhood as the inspirer of idealism and torch bearer of knowledge." এ ছাড়াও অমলবাবু শতবার্ষিকী পুস্তকে আর একটি গুরুতর প্রমাদ ঘটিয়েছেন যা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না। উনি জগদীশচন্দ্রের ১০ই মে ১৯০১ তারিখের রয়্যাল ইনস্‌টিটিউশনের বিখ্যাত বক্তৃতাটি উদ্ধৃতি করতে গিয়ে 'কোটেশনের' ভেতরের কিছু অংশ বাদ দিয়ে অন্য কিছু কথা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তাতে স্বাভাবিকভাবেই বক্তব্যের অর্থ পাল্টে গেছে। ব্যাপারটি কি করে তখন অভ

জ্ঞানীগুণী মানুষের নজর এড়িয়ে গেল বোঝা মুশ্কিল। কিন্তু ইতিহাস বড় নির্মম। বর্তমানে Indian Institute of Technology, খড়্গপুরের "History of Science"-এর অধ্যাপক বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায় এই প্রমাদটি সকলের গোচরে আনেন। তিনি এই প্রমাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে (Indian Journal of History of Science, Vol. 14, No. 2, 1979, pp. 99-100) বলেছেন, "...It is very surprising that in the first page of the Acharya Jagadis Chandra Bose Birth Centenary brochure (1958, edited by A. Hom) a portion of this Friday lecture was quoted with unexplainable 'emendations' among which the following is very glaring,..."

শঙ্করীবাবু আচার্য জগদীশচন্দ্রের উক্তি নস্যাৎ করে পরবর্তী দু-একজন ও অমল হোমের বক্তব্যের জোরে বলীয়ান হয়ে নিজস্ব সংলাপের যুক্তিতে বলেছেন, জগদীশচন্দ্রের কাছে নিবেদিতা শরীরিণী ছিলেন না, 'মনোময়ী' ছিলেন। তাই মূর্তিটি "নিবেদিতার হওয়াই স্বাভাবিক"। অবশ্য এই কথা ক'টি উচ্চারণ করতে তিনি নিজেকে ও অমল হোম মহাশয়কে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে ভরসা পান নি। তাই তিনি তাঁর সংলাপকে আগমার্কা ছাপ দিতে আচার্যপত্নী অবলা বসুকে সাক্ষী দাঁড় করিয়ে ও পাঠক সমাজকে আশ্বস্ত করে ২৩-এ অক্টোবর ১৯৮২ সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় বলেছেন, "জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী (১৯৫৮) স্যুভিনিরে—যা **শ্রীমতী অবলা বসুর জীবনকালে তাঁর সহযোগিতায়** বসু বিজ্ঞান-মন্দির থেকে" আবার ঐ পত্রিকারই ২৫-এ জুন ১৯৮৩ সংখ্যায় বলেছেন, "লেডি অবলা বসুর জীবনকালে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের ঠিকানা থেকে প্রকাশিত অমল হোম সম্পাদিত জগদীশচন্দ্র শতবার্ষিকী পুস্তকে..."। কিন্তু ইতিহাস বলে লেডি অবলা বসু মারা যান ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের ২৫-এ এপ্রিল তারিখে। আর তাঁর মৃত্যুর সাতবছর পরে জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী উৎসব ও শতবার্ষিকী পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পরিশেষে শঙ্করীবাবুর আর একটি বিস্ময়কর 'আবিষ্কার' পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি। নিবেদিতা ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর দার্জিলিং শহরে অধ্যাপক পি. কে. রায় মহাশয়ের বাড়িতে মারা যান। তখন দার্জিলিং শহরে জগদীশচন্দ্রের কোন বাড়ি ছিল না। জগদীশচন্দ্র দার্জিলিং শহরে নিজের বাড়ি তৈরী করেন ১৯২১-২২ খ্রীস্টাব্দে। নিবেদিতার মৃত্যুর প্রায় ১০ বছর বাদে। অথচ উনি বলেছেন, নিবেদিতা 'বসুভবনে' দেহত্যাগ করেন।

এক ধরনের বিদেশী মানুষদের অপপ্রচার ও ভুল তথ্য পরিবেশনের কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু দেশের মানুষদের এই ধরনের প্রবণতার অর্থ কি? শুধুই কি জগদীশচন্দ্রের সেই উক্তি উদ্ধৃতি করে বলতে হয় "It is

much easier to raise oneself from obscurity by criticising or appreciating the work of a man who is becoming well known ?" না, এই প্রবণতার কারণ অন্য ?

নির্দেশিকা

১. NAI Home Education NOS. 26 28, p. 6
২. আচার্য ভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি
৩. Report of the Bose Institute—1929
৪. অব্যক্ত—আচার্য জগদীশচন্দ্র
৫. A Garden of Essays—R. Sahay
৬. প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৩২
৭. Racital discrimination and Science in Nineteenth century India—D. Kumar, Kurukshetra University
৮. বসুধারা—নভেম্বর, ১৯৫৮
৯. Civil and Military Gazette—4. 12. 1922.

জগদীশচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবন-চিত্র

(১৮৫৮-১৯৩৭)

দেবব্রত ভট্টাচার্য

॥ ১ ॥

জগদীশচন্দ্রের পিতৃপুরুষের বাসভূমি ছিল ঢাকা-বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে। আর্থিক অসঙ্গতির জন্যে তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র শৈশব থেকেই নানা বিপরীত অবস্থার ভেতর দিয়ে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হন। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি পূর্ববঙ্গে সমাজ-সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে ময়মনসিংহ শহরে সরকারী অর্থানুকূল্যে ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। ভগবানচন্দ্র সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহ শহরেই ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০-এ নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয়। এর কিছুকাল পরে ভগবানচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করে ফরিদপুর শহরে চলে আসেন। জগদীশচন্দ্রের জ্ঞানোন্মেষ হয় সেখানেই। শৈশবের প্রথম পর্যায় অতিবাহিত হয় ফরিদপুরে। এ সময়ে তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্রও সমাজ-সংস্কার তথা দেশের কাজে নিজেকে নানা ভাবে নিয়োজিত করেন। তা ছাড়া, শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে তিনি ছিলেন একজন অগ্রণী চিন্তাশীল ও কর্মোদ্যোগী ব্যক্তি। শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী নানা প্রক্রিয়া অনুসরণ করতেন। তাঁর ছেলে-মেয়েরা যাতে শিশুকাল থেকেই প্রাকৃতিক পরিবেশের যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে, তার জন্যে নিজের বাংলোতে নানা জাতের পশু-পাখি, পোকা-মাকড় পোষার ব্যবস্থা করেন, গাছপালা, লতাগুল্ম রোপণ করেন। এ সবের সংস্পর্শে জগদীশচন্দ্রের শিশুমন ধীরে ধীরে প্রকৃতি ও জীবজগতের বৈচিত্র্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। তখনকার মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজে নব্য ইংরেজি শিক্ষার প্রতি একটা অদম্য আগ্রহ জেগে ওঠে। স্বভাবত সমাজের মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে বাংলা ভাষা তথা স্বদেশী শিক্ষাধারার প্রতি এক ধরনের অনাগ্রহ এবং উদাসীনতা দেখা দেয়। জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র এটা কখনও সুনজরে দেখেন নি, মেনেও নেন নি। তিনি তাঁর সন্তানদের মাতৃভাষার মাধ্যমে স্বদেশী শিক্ষাধারায় শিক্ষিত করে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। তাই যথাসময়ে জগদীশচন্দ্রকে তিনি ফরিদপুরের বাংলা স্কুলেই ভর্তি করে দেন। সেখানে নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র শ্রেণীর ছেলেরাই পড়াশোনা করত। তাদের সংস্পর্শে জগদীশচন্দ্রের মানবিক বোধ যাতে সহজে ও স্বাভাবিকভাবে জেগে ওঠে এটাই ছিল ভগবানচন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য।

বাংলা স্কুলে ভর্তি হয়ে বালক জগদীশচন্দ্র পারিবারিক জীবনের গণ্ডীর বাইরে সামাজিক জীবন ও দেশজ প্রকৃতির সংস্পর্শে এলেন। ফরিদপুরের

বাংলা স্কুলের দিনগুলো তাঁর ভবিষ্যৎ-জীবনের দিশারীও বলা যায়। কারণ, এ সময়ে বালক জগদীশচন্দ্রের স্পর্শকাতর মনে নিজের দেশ, দেশের মানুষ, দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং তার উদ্ভিদ-প্রাণী প্রভৃতি সম্পর্কে কৌতূহল ও মমতা-বোধ জেগে ওঠে। তাঁর মানবিক বিকাশের প্রথম পর্বের সূচনায় ফরিদপুরের বাংলা স্কুল এবং তার পরিবেশ তাই বিশেষভাবে স্মরণীয়।

জগদীশচন্দ্রের জীবন-গঠনে ফরিদপুরের আরও একটি ঘটনা স্মরণযোগ্য। ভগবানচন্দ্র ফরিদপুরে স্বদেশী মেলার প্রবর্তন করেন। এই মেলাতে দেশজ শিল্প-সংস্কৃতির সমাবেশ ঘটত। গ্রামবাংলার লোকশিক্ষাশ্রয়ী যাবতীয় কর্মকাণ্ডের প্রদর্শনী বালক জগদীশচন্দ্রের মনে গভীর ছাপ রাখে। যাত্রা-কথকতায় রামায়ণ-মহাভারত তথা পৌরাণিক কাহিনীর প্রভাব পড়ে তাঁর মনে। এখানেই একটি সুস্থ সুন্দর জীবনের আদর্শ দানা বাঁধে বালকের মনে।

পিতা ভগবানচন্দ্রও ছেলের মানসিকতা গঠনে সচেতন ছিলেন। ছেলের লেখাপড়ার প্রাত্যহিক চর্চায় তিনি তাঁর হাজারো কর্মব্যস্ততার মধ্যেও নিয়মিত মনঃসংযোগ করতেন। বালকের নানা কৌতূহলের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে তাঁর কোনও উদাসীনতা ছিল না।

দশ বছর বয়সে ফরিদপুর ছাড়তে হয় জগদীশচন্দ্রকে। ভগবানচন্দ্র বদলি হয়েছেন বর্ধমানে। কলকাতায় ছেলের পড়াশোনার ব্যবস্থা হল। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দ। কলকাতার হেয়ার স্কুলের তখন খুব নাম। জগদীশচন্দ্রকে ভর্তি করা হল সেখানে। তিন মাস পরে সেখান থেকে এলেন সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। জেস্যুট পাদ্রীদের পরিচালিত এ স্কুলটিই বেশি পছন্দ হল ভগবানচন্দ্রের। এ স্কুলের প্রথম দিনের একটি ঘটনা পরবর্তী পরিণত জগদীশচন্দ্রের চারিত্রিক প্রেক্ষাপটের ইঙ্গিত দেয়। আবার এ ঘটনার সঙ্গে ফরিদপুরে থাকাকালীন শিশু জগদীশের জীবনের আর একটি ঘটনারও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে প্রথম দিনের ক্লাশের শেষে গেঁয়ো বাঙ্গাল নিরীহ নতুন সহপাঠীকে ছেঁকে ধরল শহুরে চালাক-চতুর বুদ্ধিমান সহপাঠী ছাত্ররা। তাদের দলের সেরা লড়িয়ের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। জগদীশকে নাকাল করাই তাদের উদ্দেশ্য। নিরীহ হলে কি হবে, জগদীশচন্দ্রের নির্ভীকতার কথা তো তারা জানে না। পাঁচ বছর বয়সে ফরিদপুরের ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার মাঠে জগদীশচন্দ্রের টাট্টু ঘোড়ায় চেপে সেয়ানা প্রতিযোগীদের পেছনে সমানে ছুটে চলার কথা তো তারা জানে না। শিশুর সেই অনাড়ম্বর নির্ভীকতা যে অকৃত্রিম এবং অনমনীয় এ কথা শহুরে তামাশা-লোলুপ বালকেরা বুঝবে কি করে।

লড়াই শুরু হল। বালক জগদীশ আনাড়ি। সুতরাং তাঁকে এলো-

পাথাড়ি আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হল একমাত্র নির্ভীক মানসিকতা দিয়ে। দেখা গেল, লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ ধরাশায়ী। এক দঙ্গল প্রতিপক্ষের সামনে একাকী জগদীশ সে দিন ক্ষতবিক্ষত বিজয়ী বীর। সহপাঠীরা বুঝলে, গেঁয়ো-বাঙ্গাল-নিরীহ হলেও নির্ভীকতায় তাদের নতুন সহপাঠী অদ্বিতীয়।

ফরিদপুরে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে ছিল একজন জেল-ফেরত ডাকাত সর্দার। তাকে সমাজের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যেই ভগবানচন্দ্র তাঁর স্বগৃহে পুত্রের তদারকিতে নিয়োগ করেন। সেই ডাকাত-সর্দারের অষ্টপ্রহরের সঙ্গী শিশু জগদীশচন্দ্র। তার মুখে শুনতেন নানা দুর্ধর্ষ রোমাঞ্চকর ডাকাতির কাহিনী।

হয়তো বা তার থেকেই জগদীশচন্দ্রের জীবনে নির্ভীকতা এবং অন্বেষণের স্পৃহা প্রথম অনুপ্রেরিত হয়ে থাকবে।

পড়েন সেণ্ট জেভিয়ার্স ইংরেজি স্কুলে, থাকার জায়গা হল মির্জাপুর স্ট্রীটের ব্রাহ্ম-ছাত্রবাসে। এই ছাত্রাবাসের অন্য ছাত্ররা প্রায় সকলেই ছিলেন জগদীশচন্দ্রের চেয়ে বয়সে বড়। তাঁরা ছিলেন তখনকার দিনের উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ প্রগতিবাদী। তাঁদের সংস্পর্শে জগদীশচন্দ্রের মন যেমন প্রভাবিত হয় তেমনি আবার তাঁদের সঙ্গে তাঁর বয়সের ব্যবধান তাঁকে করে তোলে নিঃসঙ্গ একাকী। হয়তো তাই ছাত্রাবাসের উঠানে একটি ছোট বাগিচা তৈরি করে এবং কয়েকটি প্রাণী পুষে তাদের নিয়ে মগ্ন থাকতেন জগদীশচন্দ্র। হয়তো ফরিদপুরের অজ্ঞান-অভিনিবেশ কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রীটের ছাত্রাবাসের নিঃসঙ্গতায় অভিজ্ঞ ও প্রকাশিত হতে থাকল।

মফঃস্বলের বাংলা স্কুলের ছেলের কলকাতা শহরের ইঙ্গবঙ্গীয় সমাজের প্রথম শ্রেণীর ইংরেজি স্কুল সেণ্ট জেভিয়ার্সে হালে পানি না পাওয়ারই কথা। বালক জগদীশচন্দ্র ইংরেজি তত জানেন না, বোঝেনও না। এখানে ইংরেজি ভাষা এবং ইংরেজিয়ানা না জানলে পদে পদে বিপর্যয়। বালক জগদীশ অবিচল। অল্প সময়ে মোটামুটি সব মানিয়ে নেবার মতো বুদ্ধি এবং মেধা তাঁর আছে। তাই কিছুতেই আর আটকে যান না। এ স্কুল থেকে ষোলো বছর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন একটি বৃত্তি নিয়ে। সেটা ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দ। উচ্চতর শিক্ষাও আরম্ভ করেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে। বিষয় বিজ্ঞান। পদার্থবিজ্ঞানের তখনকার প্রখ্যাত অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ এ কলেজেই অধ্যাপনা করেন। তখন তাঁর ক্লাশ করতে ছাত্রদের মধ্যে খুবই আগ্রহ দেখা যেত। পদার্থবিদ্যার দুরূহ তথ্যকে সহজে বোঝাতে তাঁর জুড়ি কেউ ছিলেন না। তা ছাড়া, নবীন ছাত্রদের মনে পদার্থবিদ্যা-বিষয়ে আগ্রহ ও কৌতূহল জাগাতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কলেজে পড়ার শুরুতেই পদার্থবিদ্যায় জগদীশের আকর্ষণ বাড়ে এই অধ্যাপকের প্রভাবে। অধ্যাপক লাফোঁ

কেবল কলেজের গণ্ডীতেই নয়, বাইরের মানুষের কাছেও সুপরিচিত ছিলেন তাঁর বিষয়-তত্ত্ব-কুশলতার জন্যে। পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর স্বকীয় চিন্তা-ভাবনা এবং উদ্ভাবনের অঙ্কুরে জলসিঞ্চন ঘটেছিল অধ্যাপক লাফোঁর সংস্পর্শেই— পরবর্তী কালে আচার্য জগদীশচন্দ্র সে কথা বলেছেন অনাবিলভাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা ধরা পড়ে নি। কিন্তু অধ্যাপক লাফোঁ তাঁর প্রিয় ছাত্রের ভেতরে প্রতিভার অঙ্কুর লক্ষ্য করেছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে এফ. এ. পাশ করলেন জগদীশচন্দ্র। সাধারণ ফল। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. পাশও করলেন। কিন্তু পরীক্ষার ফল লক্ষ্য করার মতো নয়। অধ্যাপক লাফোঁ ছাত্রকে তার জন্যে ভুল বোঝেন নি। বরঞ্চ, উত্তর-কালে যাতে তাঁর ছাত্রটি বিজ্ঞানচর্চায় নিরুৎসাহ না হয় সে দিকেই নজর রেখেছিলেন বরাবর।

বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা নিতে ইংলণ্ড যাবেন ইচ্ছা। কিন্তু বাধা অনেক। পিতা ভগবানচন্দ্র ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে কর্ম-বিরতিতে আছেন। দেশের কাজে তাঁর যথাসর্বস্ব ব্যয় হয়েছে। উপরন্তু ঋণভারে জর্জর। জগদীশ-চন্দ্রের ছোট ভাই মারা গেছে। একমাত্র ছেলেকে বিদেশে পাঠাতে জগদীশচন্দ্রের মা গররাজী। আবার জগদীশচন্দ্র লক্ষ্য করছেন পারিবারিক প্রয়োজনে তাঁর অর্থোপার্জনের উপযোগী কোন শিক্ষা নেওয়া দরকার। মনে হল, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে সরকারী উচ্চপদ গ্রহণ করলে আর্থিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু পিতার অমত। নিজের জীবন দিয়ে তিনি অনুভব করেছেন সরকারী উচ্চপদ জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের পরিপন্থী। নিজের সন্তান সে পথে যাক এ তাঁর ইচ্ছা নয়। স্থির হল ডাক্তার হবেন। ডাক্তারি পড়তে বিলেত যাবেন। কিন্তু মায়ের আপত্তি। দূর বিদেশে ছেলেকে নিজের কাছছাড়া করতে তাঁর ভয়। কাজেই দেশেই টাকা রোজগারের মতো কোন কাজ দেখার কথা ভাবলেন জগদীশচন্দ্র। কিন্তু মাতৃহৃদয়ের আবেগ কাটিয়ে ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই হয়তো জগদীশচন্দ্রের মায়ের মতপরিবর্তন হল। তাঁর সব অলঙ্কার বিক্রয় করে ছেলের পড়াশোনার ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ সময়ে ভগবানচন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠে ফের সরকারী চাকুরিতে যোগ দেওয়ায় আর্থিক অসুবিধা দূর হল। মায়ের অলঙ্কার বিক্রয়ের দরকার হল না। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ডাক্তারি পড়তে বিলেত যাত্রা করেন।

সমুদ্র-যাত্রা সুখের হল না। বি. এ পড়ার সময়ে আসামের জঙ্গলে গিয়েছিলেন শিকার করে বেড়াতে। শিকারের সখ তাঁর আরো কম বয়সেই জেগেছিল। পিতার অধীনস্থ এক বৃদ্ধ রাজপুত কর্মীর কাছে তিনি বন্দুক চালনা শেখেন। সেই থেকে শিকারের আগ্রহ। বি. এ. পড়ার সময়ে সহপাঠী বন্ধুর আসামের বাড়িতে বেড়াতে যাবার এবং শিকার করার আমন্ত্রণ

তাই তিনি লুফে নিয়েছিলেন সাগ্রহে। কিন্তু শিকারীকেই শিকার করে বসল আসামের কালাজ্বর। তখন এই ব্যাধির কোনও প্রতিষেধক ছিল না। তাই তাঁকে ভয়ঙ্কর ভুগতে হয়েছিল আর ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল পরবর্তী দীর্ঘকাল। বিলাত অভিমুখে সমুদ্র-যাত্রার সময়ে জাহাজে এই জ্বরে আবার আক্রান্ত হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় পড়েন। সহযাত্রীরা তাঁর অবস্থা দেখে ভেবেছিলেন, হয়তো শেষ পর্যন্ত মাঝপথেই জগদীশচন্দ্রকে যাত্রা শেষ করতে হবে। বিলেত যাওয়া হবে না তাঁর। কিন্তু এই অসুস্থতা নিয়েই তিনি সমুদ্র-পাড়ি দিয়ে বিলেতে চলে এলেন।

লণ্ডনে এলেন। সেখানকার এক হাসপাতালে চিকিৎসা-বিজ্ঞান পড়াশোনা করবেন স্থির হল। ভর্তি হবার জন্যে প্রাথমিক পরীক্ষায় খুব সহজেই উতরে গেলেন। শারীর-বিজ্ঞানের ক্লাশের শব-ব্যবচ্ছেদ পর্যায়টি তাঁর ভাল লাগল না। তা ছাড়া, জ্বরের প্রকোপে এসময়ে তিনি এমনিতেই কাহিল হয়ে আছেন। হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে চিকিৎসা করেও রোগমুক্ত করতে পারলেন না। তখনকার বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ্ ডক্টর রিঙ্গার সে হাসপাতালের চিকিৎসক। তিনি জগদীশচন্দ্রকে অন্য বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে পরামর্শ দিলেন। ডাক্তারি পড়ার খাটা-খাটুনি তাঁর ভগ্ন-স্বাস্থ্যে সম্ভব হবে না বলে তাঁর ধারণা। ডাক্তারী ছেড়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করাই ঠিক হবে ভাবলেন জগদীশচন্দ্র। আনুষঙ্গিক কিছুটা সুযোগও এসে গেল। প্রকৃতিবিজ্ঞানে একটি বৃত্তি পেলেন।

কেম্ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে যোগ দিলেন জগদীশচন্দ্র। সেটা ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাস। এখানে এসে তাঁর স্বাস্থ্যও কিছুটা ফিরে পেলেন। ওষুধের পরিবর্তে শরীরচর্চায় তিনি ধীরে ধীরে রোগমুক্ত এবং সবল হয়ে উঠতে থাকলেন।

ফাদার লাফোঁ কলকাতায়, আর কেম্ব্রিজে লর্ড র‍্যালে—ছাত্র জগদীশের ভেতরে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের সন্ধান পেয়েছিলেন মনে হয়। কেম্ব্রিজে অধ্যাপক র‍্যালের সান্নিধ্যে প্রকৃতিবিজ্ঞানে অনুপ্রেরিত হন জগদীশচন্দ্র। তিন বছর পড়াশোনা করে প্রকৃতিবিজ্ঞানে তিনি ট্রাইপোস পাশ করেন। তারপরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস্‌সি. ডিগ্রী লাভ করেন।

কেম্ব্রিজের অধ্যাপকগণ এবং লর্ড র‍্যালে ও ভাইনস্-এর যে স্নেহ-প্রীতি লাভ করেন জগদীশচন্দ্র, ভবিষ্যতে তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার পথে তা হয়ে ওঠে বড় পাথেয়। এঁদের সহানুভূতি এবং প্রচেষ্টাতেই লণ্ডনে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-গবেষণার অনেক বাধা-বিঘ্ন দূর হয়েছিল পরবর্তী কালে।

পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে এলেন জগদীশচন্দ্র। আনন্দমোহন বসুর বিশিষ্ট বন্ধু বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ এবং লণ্ডনের পোস্ট-মাস্টার জেনারেল ফসেট সাহেব। লণ্ডনে তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন জগদীশচন্দ্র।

দেশে ফেরার মুখে ফসেট সাহেব তাঁকে একখানা পরিচয়-পত্র লিখে দিলেন। ইতিপূর্বে অবশ্য তিনি খোঁজ নিয়েছিলেন, ভারতের শিক্ষা-বিভাগে জগদীশচন্দ্রের উপযুক্ত কোন পদ খালি আছে কিনা। ভারত-সচিব কিম্‌বার্লি ফসেটের বন্ধু। তাঁর কাছ থেকে সঠিক কোনও খবর না পেয়ে তাঁর দেওয়া পরিচয়পত্র নিয়ে ভাইসরয় লর্ড রিপনের সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলেন ফসেট সাহেব। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতে এসে লর্ড রিপনের সঙ্গে সিমলায় দেখা করেন জগদীশচন্দ্র। লর্ড রিপন তাঁকে শিক্ষা-বিভাগে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেন।

স্যার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট তখন শিক্ষাবিভাগের প্রধান। লর্ড রিপনের নির্দেশ সত্ত্বেও প্রথমে তিনি বিজ্ঞান-অধ্যাপনায় জগদীশচন্দ্রকে নিয়োগ করতে রাজি হন নি। আসলে পরাধীন ভারতীয়দের সম্পর্কে তিনি ছিলেন বিরূপ। শেষপর্যন্ত লর্ড রিপনের আগ্রহে অস্থায়ীভাবে জগদীশচন্দ্রকে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে নিয়োগ করেন আলফ্রেড ক্রফ্‌ট্। পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপনায় ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন জগদীশচন্দ্র। ছাত্র-শিক্ষক বিরোধ নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের তখন বড় দুর্নাম। জগদীশচন্দ্র সে সময়ে তাঁর নিজের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, "ভীরু মেষকে হিংস্র নেকড়ে বাঘের খপ্পরে ফেলে আলফ্রেড ক্রফ্‌ট্ সেদিন নিশ্চয়ই বেশ কৌতুক ও আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।"

ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে ভারতীয়দের প্রতি এক অদ্ভুত বৈষম্যমূলক নীতি ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের। একজন ইউরোপীয় অধ্যাপকের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ পেতেন একজন ভারতীয় অধ্যাপক। জগদীশচন্দ্র এটা মেনে নিলেন না। তিনি এ নীতি অগ্রাহ্য করলেন। তাঁর প্রতিবাদ দেখা দিল বেতন বয়কটে। তিন বছর ধরে তিনি বিনা বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করে গেলেন। ভারতীয় এবং ইউরোপীয় অধ্যাপকদের মধ্যে ব্যবধান না ঘোচা পর্যন্ত তিনি নির্বিকার। এ সময়ে তাঁর পারিবারিক জীবনে ভয়ানক অর্থকষ্ট চলছে। তিনি দৃঢ়পণ। এ বৈষম্য ঘোচাতেই হবে। শেষ পর্যন্ত জয় হল তাঁরই। তিন বছর বাদে সরকার তাঁর যুক্তি মেনে নিলেন। তাঁর বাকি বকেয়া মাইনেপত্র এক সঙ্গে মিটিয়ে দেওয়া হল। তিন বছরের অদৃশ্য লড়াইয়ে নীরবে যে আর্থিক ঋণভার মেনে নিতে হয়েছিল জগদীশচন্দ্রকে, এবার তিনি তা থেকে মুক্ত হলেন সসম্মানে।

বিক্রমপুরের দুর্গামোহন দাশ কলকাতা হাইকোর্টের নামকরা এ্যাড্‌ভোকেট। ব্রাহ্ম-সমাজের একজন সক্রিয় পুরোধা ব্যক্তি। তিনি ভগবানচন্দ্র বসুর সহযোগী বন্ধু। ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের কাজে তখন তিনি সুপরিচিত মানুষ। তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা অবলার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের বিয়ে হল ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। অবলা দাশ তখন মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজের

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছেন প্রবেশিকা এবং এফ. এ. পরীক্ষা।

বিয়ের পরে বর-বধূর মাস ছয়েকের জন্যে আলাদা থাকার ব্যবস্থা হল চন্দননগরে। এটা দুর্গামোহন দাশের পরিকল্পনা। অবলা গৃহস্থালীতে আনাড়ি। ছেলেবেলা থেকে পড়াশোনা নিয়েই থেকেছেন, সংসারের অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু পিতার আদর্শজীবন ও কর্মপন্থায় প্রভাবিত হয়েছেন স্বভাবত। বিয়ের পরে তাই সকলের অবাক হবার কথা। সংসারের যাবতীয় কাজে সুনিপুণা হয়ে উঠতে তাঁর সময় লাগে নি। বিজ্ঞান ভাব-উন্মনা স্বামীর সুযোগ্যা সহধর্মিণী পরবর্তী কালের লেডি অবলা বসুর কথা অনেকেই জানেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর রন্ধনপটুতার উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করেছিলেন একসময়ে।

তাঁদের সঙ্গে অল্প কিছুদিনের জন্যে চন্দননগরে এসে বাস করেছিলেন জগদীশচন্দ্রের পিতা-মাতা। পরে চন্দননগরের পাট গুটিয়ে সবাই চলে আসেন কলকাতার বৌবাজারের স্কট লেনে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রমহলের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের প্রীতির সম্পর্ক ছিল গাঢ়। এ সময়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সির ছাত্র হিসেবে জগদীশচন্দ্রের স্নেহ-সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। এদিকে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ভারতে নব্য-রসায়নের প্রথম আচার্য দেশে ফিরে এসে বেকার। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব সায়েন্স হয়েও এদেশের শিক্ষা-বিভাগে তাঁর ঠাঁই হচ্ছে না। বিলেত গিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্রের দু'বছর পরে। জগদীশচন্দ্র বিলেতে প্রফুল্ল রায়কে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। সেই সুবাদে দেশে ফিরে প্রফুল্লচন্দ্র যখন বেকার, প্রায়ই অতিথি হতেন জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে একটি বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে স্কট লেন থেকে সপরিবারে চলে এলেন জগদীশচন্দ্র মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে। এ বাড়ির এক অংশে থাকতেন তাঁর ভগ্নীপতি মোহিনীমোহন বসু। এ সময়ে তিনি ফটোগ্রাফি এবং কণ্ঠস্বর রেকর্ডিং নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন।

॥ ২ ॥

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৩০-এ নভেম্বর জগদীশচন্দ্র ছত্রিশ বছর বয়সে উপনীত হলেন। এ দিনই তিনি প্রথম অনুভব করেন প্রাকৃতিক রহস্য অনুধাবন ও উন্মোচন করাই হবে তাঁর প্রধান কাজ। এতে মানুষের সঙ্কীর্ণতা ও অজ্ঞানতা অনেকটা দূর হতে পারে এবং মানুষের জ্ঞান-জগতের অন্বেষাও প্রেরণা পেতে পারে নব নব আবিষ্কারে। এই অনুভূতি থেকে তিনি তাঁর কাজে নিযুক্ত হলেন। ইতিপূর্বে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে নানা চিন্তাভাবনা দেখা দিয়েছিল। ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্পর্কে তত্ত্ব, হাৎ'স-এর গবেষণা, তাঁদের তত্ত্ব ও গবেষণা নিয়ে লজ-এর রচনা জগদীশচন্দ্রকে প্রভাবিত করে।

এসব নিয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা এবং তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার আয়োজনে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন তিনি। সারাদিন অধ্যাপনার কাজ সেরে শ্রান্ত-ক্লান্ত একজন অধ্যাপকের পক্ষে সে-সব করে ওঠা প্রায় দুঃসাধ্য কাজ। তা ছাড়া, এ সবের জন্যে পরিবেশ প্রতিকূল। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন বিজ্ঞান-গবেষণার জন্যে না ঘর, না যন্ত্রপাতি—কিছুই ছিল না। শৌচাগারের পাশে একটি ছোট ঘর, সেখানেই গবেষণাগার তৈরি করে নিলেন। আর যন্ত্রপাতি? বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির অভাবও দূর করলেন নিজের চেষ্টা ও উদ্ভাবনী প্রতিভায়। টিনের পাত, লোহার চাকৃতি, কাঠের টুকরো ইত্যাদি অব্যবহৃত অকাজের বস্তু-সামগ্রী হয়ে উঠল তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার যন্ত্র তৈরীর উপাদান। নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দেশের সাধারণ কামার-মিস্ত্রীদের দিয়ে তৈরি করিয়ে নিতে থাকলেন বিজ্ঞান-গবেষণার যন্ত্রপাতি।

দু'বছরের সাধনায় 'দৃশ্য আলোক-তরঙ্গ ও হার্ৎস-উদ্ভাবিত অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সমধর্মিতা' প্রমাণ করলেন। সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানী সমাজ বিস্মিত। শুধু জগদীশচন্দ্রের তথ্য-প্রমাণেই নয়, মহাবিস্ময় তাঁর গবেষণার যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও নির্মাণকুশলতায়ও। বিজ্ঞান-জগতের প্রথম সারিতে নাম উঠল। দেশে-বিদেশে কৌতূহল আর প্রশংসা তাঁর সম্পর্কে। অধ্যাপক হিসেবে কলকাতার ছাত্র-শিক্ষক সমাজে সুনাম অর্জন করেছিলেন অনেক আগেই। এখন তার সঙ্গে যোগ হল বৈজ্ঞানিক হিসেবে স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা।

১৮৯৫-এর ১লা মে। এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠ করলেন 'বিদ্যুৎ-রশ্মির সমবর্তন' নিবন্ধ। সভাপতি ডক্টর রুডল্ফ্ হর্নলে। প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীও উপস্থিত ছিলেন সভায়। এশিয়াটিক সোসাইটির তৎকালীন সভাপতি ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার পেড্লার। তিনি ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে ভূয়সী প্রশংসা করেন জগদীশচন্দ্রের গবেষণার। তাঁর নিবন্ধটি সোসাইটির কার্যবিবরণীতে প্রকাশ করা হয়। এর পরে লণ্ডনে লর্ড র‍্যালের কাছে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠান জগদীশচন্দ্র। লর্ড র‍্যালের অনুমোদন-ক্রমে সে সব প্রবন্ধ লণ্ডনের 'ইলেক্ট্রিসিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৯৫-এর ২৭-এ ডিসেম্বর সংখ্যায়। পরবর্তী নিবন্ধ বিদ্যুৎ-রশ্মির পথ-পরিবর্তন সম্পর্কিত। লর্ড র‍্যালে রয়াল সোসাইটিতে এটি পাঠান। সোসাইটির ১৩ই ডিসেম্বরের অধিবেশনে নিবন্ধটি পাঠ করা হয় এবং পরে তাদের মুখপত্রে প্রকাশিত হয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে জগদীশচন্দ্র রঞ্জন-রশ্মি নিয়েও গবেষণা করেন। এই রশ্মি আবিষ্কার হয় ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে। তিনি এই রশ্মির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে উৎসাহী হন। বিশেষ করে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এ রশ্মি যে বড় সহায়ক হতে পারে সে সম্পর্কে তিনি প্রায় নিশ্চিত ছিলেন। অদৃশ্য-বিদ্যুৎ-

তরঙ্গ মারফৎ সঙ্কেত-বার্তা প্রেরণের চেষ্টাও তিনি এ সময়েই শুরু করেন। এ সময়ে তিনি থাকতেন কনভেন্ট রোডের বাসায়। সেখানে এই নিয়ে তিনি গবেষণা-রত থাকতেন।

তাঁর এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা পৃথিবীর বিজ্ঞানী সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় তাঁর গবেষণা নিয়ে নানা রকমের প্রশস্তি প্রকাশিত হয়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় চাই অর্থ, চাই উপযোগী উপকরণ। পরাধীন দেশের একজন বিজ্ঞানী, তা তিনি যত প্রতিভাধরই হোন, বিদেশী সরকার তাঁর সহায়ক নয়। অর্থ ও উপকরণের অভাবে তাঁর গবেষণা গতি পাচ্ছে না, উদ্ভাবনা ব্যাহত হচ্ছে। লর্ড র‍্যালে তখন রয়াল সোসাইটির যুগ্ম-সম্পাদক। তিনি তাঁর এই ভারতীয় ছাত্রটি সম্পর্কে অনেক আশা পোষণ করেন। তাঁর ছাত্রের গবেষণায় তিনি মুগ্ধ। তাঁর কানে গেল সব। রয়াল সোসাইটি থেকে বিজ্ঞানের গবেষণার জন্যে অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করলেন তিনি। বিলেতের রয়াল সোসাইটির গভর্নমেণ্ট গ্র্যাণ্ট ফাণ্ড থেকে অর্থ-সাহায্য পেলেন সেই প্রথম একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী, জগদীশচন্দ্র বসু।

বিজ্ঞান-গবেষণার বিষয় যাতে দেশবাসীও বুঝতে পারে সে কথা ভেবে তিনি জনসমক্ষে বক্তৃতা সহযোগে তাঁর আবিষ্কারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখাবার ব্যবস্থা করেন। ফাদার লাফোঁ ছিলেন এ প্রক্রিয়ার জনক। সেণ্ট জেভিয়ার্সে ছাত্র অবস্থায় জগদীশচন্দ্র দেখেছেন তাঁকে জনসমক্ষে দুরূহ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রদর্শন করতে। প্রেসিডেন্সি কলেজে এক পরীক্ষা-প্রদর্শনের আয়োজন হল। অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠানো হল প্রফুল্লচন্দ্রের ঘর থেকে অধ্যাপক পেড্‌লারের ঘরে। পৃথিবীতে বেতার-সঙ্কেতের এটাই প্রথম সূচনা। এর পরের বছর ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে বাংলার ছোটলাট আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জির সামনে টাউন হলে জগদীশচন্দ্র এ বিষয়ে নানা রকম আশ্চর্য পরীক্ষা প্রদর্শন করেন।

টাউন হলের ঘটনায় সরকার মনোযোগী হলেন। ছোটলাট ম্যাকেঞ্জি অভিভূত। জগদীশচন্দ্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেল তড়িৎ-বিজ্ঞান গবেষণার জন্যে সরকারের পক্ষ থেকে এককালীন এক হাজার টাকা মঞ্জুর করায়।

প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে গবেষণা করে যেসব বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র, এ সময়ে সে সবের একটি সংকলন পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকা পাঠ করে পদার্থবিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন তাঁর একখানি নিবন্ধ-সংকলন গ্রন্থ জগদীশচন্দ্রকে উপহার পাঠিয়ে অভিনন্দিত করেন। এ সময়ে আরো একটি ঘটনা স্মরণীয়। বিদ্যুৎ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ণয়-বিষয়ে গবেষণার জন্যে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এসসি. উপাধি পান (১৮৯৬)।

এ সবের জন্যে তাঁর যেমন চারদিকে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে তেমনি এক শ্রেণীর মানুষের ঈর্ষাকাতরতায় বাধাবিঘ্নও দেখা দেয়। তাদের বক্তব্য, বিজ্ঞান-গবেষণার জন্যে জগদীশচন্দ্রের অধ্যাপনার কাজে গাফিলতি হচ্ছে। বাংলার লাট ম্যাকেঞ্জি সাহেব অবস্থাটা সহানুভূতির সঙ্গে অনুধাবন করেন। জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-কাজে যাতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি না হয় তার জন্যে শিক্ষা-বিভাগে একটি নতুন পদে তাঁকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের বিরোধিতায় তা কার্যকরী হল না। জগদীশচন্দ্র ছিলেন দৃঢ়চেতা। শিক্ষাদপ্তর এ জন্যে তাঁর ওপরে বিরূপ ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার-মনোনীত সদস্য হিসেবে তিনি শিক্ষা-বিভাগের হুকুম বিনা বিচারে মানতে রাজি হন নি কখনো। তাই তাঁর অপরাধ। কিন্তু ম্যাকেঞ্জি সাহেব বরাবরই তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের গবেষণার জন্যে ব্যক্তিগত খরচপত্র সব সরকার দেবে বলে তাঁকে জানানো হয়। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। সরকার এ অর্থ তখন তাঁর গবেষণার জন্যে সাহায্য হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজকে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সাহায্যের পরিমাণ ছিল বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা।

॥ ৩ ॥

পরবর্তী পর্যায়ের গবেষণার জন্যে বিদেশ-যাত্রা একান্ত দরকার। প্রথমত, উচ্চ পর্যায়ের গবেষণায় দেশের হাওয়ায় নানা বাধাবিপত্তি এবং উদ্বেগ। দ্বিতীয়ত, গবেষণার মূল্যায়ন সঠিকভাবে করতে হলে প্রতিভাধর বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে আসা দরকার, তাঁদের চোখের সামনে সত্যের প্রতিফলন দরকার। যেহেতু বিদেশ তথা ইংল্যাণ্ড তখন বিজ্ঞান চর্চার শীর্ষস্থানে, দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের সমাবেশ ও সমাদরও সেখানেই। তাই, জগদীশচন্দ্র বিদেশ-যাত্রার জন্যে ব্যাকুল। লর্ড র‍্যালেকে মনের কথা জানালেন। র‍্যালে তাঁর সঙ্কল্পকে সমর্থন করেই ক্ষান্ত থাকলেন না, ভারত সচিব জর্জ হ্যামিণ্টনকে জগদীশচন্দ্রের বিদেশ পর্যটনের জন্য সাহায্য করার অনুরোধ করে চিঠিও দিলেন।

ঠিক এ সময়ে লর্ড র‍্যালে কলকাতা আসেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা এবং তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি দেখে তিনি মুগ্ধ হন। বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্রের মৌলিক গবেষণা যে বিদেশে প্রদর্শন করা দরকার সে কথা বার বার বলে উৎসাহিত করেন। জগদীশচন্দ্র মন স্থির করে সরকারের কাছে ছুটির দরখাস্ত করেন।

ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়শনের সম্মেলনে নিজের গবেষণা-নিবন্ধ পাঠ এবং ইউরোপের প্রধান গবেষণাগারগুলো পরিদর্শন করাই ছিল তাঁর এ সময়ে বিদেশ-যাত্রার মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষা-বিভাগ তাঁকে সমর্থন করল। শিক্ষা-অধিকর্তা স্যার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট তাঁর বিদেশ সফর সমর্থন করে সরকারের

সেক্রেটারিকে চিঠি দেন। ছোট লাট স্যার ম্যাকেঞ্জি শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে একমত হয়ে ভারত সরকারের সহযোগিতার জন্যে অনুরোধ করেন। সব শেষে তাঁর বিদেশ-যাত্রা স্থির হল। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২৪-এ জুলাই তিনি বোম্বে থেকে জাহাজ যোগে বিলেত যাত্রা করেন।

ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের লিভারপুল অধিবেশনে বক্তৃতা দেন ২১-এ সেপ্টেম্বর। বিষয়, বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সমবর্তন। তাঁর বক্তৃতা শুনে সমবেত বিজ্ঞানীরা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী বৃদ্ধ লর্ড কেলভিন এমন আবেগকম্পিত হন যে, মেয়েদের গ্যালারিতে গিয়ে লেডি অবলা বসুকে পর্যন্ত অভিনন্দন জানিয়ে আসেন। তিনি ভারত সচিবকে অনুরোধ করে চিঠি লেখেন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজে আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার জন্যে একটি সুসজ্জিত গবেষণাগার জগদীশচন্দ্রের পরিচালনাধীন থাকলে দেশের এবং সরকারের খ্যাতি বাড়বে।

জগদীশচন্দ্রের গবেষণার মৌলিকতায় বিদেশের মানুষ অভিভূত এবং মুগ্ধ হয়ে ওঠে। তার প্রতিফলনও দেখা গেছে সমকালীন পত্র-পত্রিকায় জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে অকুণ্ঠ প্রশংসায়। রয়াল ইনস্টিটিউশনে শুক্রবাসরীয় সান্ধ্য-বক্তৃতায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র তখন এই ইন্‌স্টিটিউশন। ১৮৯৭-এর ২৯-এ জানুয়ারি তিনি এখানে প্রথম বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতায় উপস্থিত দিকপাল বিজ্ঞানীগণ বিস্মিত। জেম্‌স্ ডেওয়ার, লর্ড র‍্যালে জগদীশচন্দ্রের নির্ভুল পরীক্ষা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। ভারত-বিদ্বেষী Spectator পত্রিকা পর্যন্ত সেদিন রয়াল ইনস্টিটিউশনের বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে প্রশস্তিসূচক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করে।

তারপরে আমন্ত্রণ আসে ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটে বক্তৃতা দেবার জন্যে। তখন লণ্ডন থেকে বিদায় নেবার পালা। ৮ই ফেব্রুয়ারি এই সভায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ এবং বোম্বাইয়ের পূর্বতন লাট সাহেব লর্ড রিয়ে এই সভায় জগদীশচন্দ্রের গবেষণা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং সুযোগ-সুবিধা দেবার কথা তোলেন। তাঁদের অভিমত, বিজ্ঞানের দেশ-কাল নেই, তা সর্বদেশীয় এবং সর্বকালের। কাজেই জগদীশ-চন্দ্রের বিজ্ঞান-গবেষণার সহায়তায় এগিয়ে আসতে হবে সব দেশের মানব সমাজকে।

ইংল্যাণ্ডের বেশ কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীর এক প্রতিনিধিদল ভারত সচিবের সঙ্গে দেখা করেন। দলনেতা ছিলেন রয়াল সোসাইটির সভাপতি লর্ড লিস্টার। তাঁদের স্মারকলিপিতে বলা হয় যে, জগদীশচন্দ্রের পরিচালনায় পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার উন্নতির জন্যে কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপন দরকার। এই স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন লর্ড লিস্টার, লর্ড কেলভিন, স্যার হেনরি রস্‌কো, স্যার উইলিয়াম র‍্যামজে, স্যার জি. জি.

স্টোক্‌স্‌ এবং আরও অনেক বিজ্ঞানী। পার্লামেন্টের প্রভাবশালী সদস্যদের অনেকে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

এই স্মারকলিপি অনুসারে ভারত সচিব ভারত সরকারের কাছে সুপারিশ করেন যে, চল্লিশ হাজার পাউণ্ড ব্যয়ে কলকাতায় একটি বিজ্ঞান-গবেষণাগার স্থাপন করা হোক। এর ফলে, বাংলা সরকার এবং ভারত সরকার একযোগে আংশিকভাবে সাড়া দেয়। জগদীশচন্দ্রের গবেষণার জন্যে বাংলা সরকার আড়াই হাজার টাকা এবং ভারত সরকার দু'হাজার টাকা বার্ষিক সাহায্য মঞ্জুর করে।

ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্স এবং জার্মেনির বিভিন্ন শিক্ষায়তন এবং বিজ্ঞান সংস্থা পরিদর্শনে যাবার দিন-তারিখ ঠিক। আয়ারল্যাণ্ডের বেলফাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এভারেট আমন্ত্রণ জানালেন সেখানে এক বিজ্ঞান-সমিতিতে বক্তৃতা দেবার জন্যে। সময় নেই, আমন্ত্রণ রক্ষা হল না। বার্লিনের বিজ্ঞান-পরিষদে বক্তৃতা দিলেন ৫ই মার্চ। এপ্রিলে বিজ্ঞান-পরিষদের মুখপত্রে তাঁর গবেষণার সার-সংক্ষেপ প্রকাশিত হল। তাঁর বক্তৃতা তখনকার ইয়োরোপীয় জ্ঞানী-গুণী সমাজকে খুবই আকৃষ্ট করে। বার্লিনে তাঁর বক্তৃতা শুনতে হাইডেলবার্গ থেকে এসেছিলেন বৃদ্ধ অধ্যাপক কুইংকে। তাঁর আমন্ত্রণে জগদীশচন্দ্র হাইডেলবার্গ যান। অধ্যাপক কুইংকের গবেষণাগার পরিদর্শন করেন জগদীশচন্দ্র। পরিচয় হয় লেপার্ড এবং আরও কয়েকজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে। সরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানীদের সামনে বক্তৃতা দেন ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ৭ই মার্চ। বিদ্যুৎ-তরঙ্গের প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও সমবর্তন সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা এমন আকর্ষণীয় হয় যে, ২২-এ মার্চ পদার্থবিজ্ঞান সমিতিতেও একই বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হয়। এই বক্তৃতা শুনতে অধ্যাপক কর্ন্যু, লিপম্যান, পোঁয়াকারে, কেইলেটেট, বেকেরেল-এর মতো আরও বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। এঁরা সকলে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ফল দেখে মুগ্ধ, প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হন। Socie´te´ de Physique-এর সদস্যপদ দিয়ে সম্মানিত করা হয় জগদীশচন্দ্রকে।

প্রথমবারের পরিভ্রমণ এখানেই শেষ। মার্শাই হয়ে দেশে ফিরে এলেন। নিয়ে এলেন আশাতীত সাফল্য। ভারতের বিজ্ঞান সাধনা সম্পর্কে ইয়োরোপের ভ্রান্ত ধারণাকে সমূলে উৎপাটিত করেই এলেন না শুধু, জড়বিজ্ঞান চর্চায় ভারতের ভ্রান্তিও অপনোদন করলেন।

॥ ৪ ॥

দেশে ফিরে এলেন ১৮৯৭-এর এপ্রিলে। সারা দেশের মানুষের মনে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে তখন ব্যাপক বিস্ময় আর নিবিড় শ্রদ্ধা। রবীন্দ্রনাথ এলেন বিজ্ঞানীকে অভিনন্দন জানাতে। জগদীশচন্দ্র তাঁর বাসগৃহে অনুপস্থিত। কবি তাঁর প্রীতির স্মারক একটি ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুল রেখে যান

বিজ্ঞানীর টেবিলে। বিজ্ঞানীর সঙ্গে কবির হৃদ্যতার সূচনা হল। তারপর দীর্ঘকাল সে-হৃদ্যতা ঘনীভূত থেকেছে, বিচিত্র হয়ে ফুটেছে। দুঃখের দিনে বিজ্ঞানীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন কবি। প্রতিকূল অবস্থায় দিশাহারা বিজ্ঞানী চেয়েছেন কবির নির্দেশ।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় (১৮৯৭) জগদীশচন্দ্র থাকতেন ধর্মতলা স্ট্রীটে আনন্দমোহন বসুর বাড়িতে। তারপরে কিছুদিনের জন্যে যখন আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে বাস করেন তখন কবির সঙ্গে বিজ্ঞানীর বন্ধুত্ব হয়ে ওঠে নিবিড়। রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, লোকেন পালিত, নীলরতন সরকার প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ নিয়মিত আসতেন সার্কুলার রোডের বাড়িতে। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে বিবেকানন্দের বিদেশিনী শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা এবং মিসেস ওলেবুলের সঙ্গে পরিচয় ঘটে জগদীশ-চন্দ্রের। এ পরিচয় পরবর্তী কালে পারিবারিক অন্তরঙ্গতায় পরিণতি লাভ করে। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও পরিচয় ঘটে ভগিনী নিবেদিতার। জগদীশচন্দ্রের গবেষণা বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সব জানাতেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে যখন নিবেদিতা অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন বসু-দম্পতি তাঁর সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব নেন। ১৯১০-এর অক্টোবর মাসে দার্জিলিংয়ে নিবেদিতার অন্তিম মুহূর্তেও শয্যাপার্শ্বে ছিলেন বসু-দম্পতি। ভগিনী নিবেদিতা গবেষণা-বিষয়ে জগদীশচন্দ্রকে উৎসাহিত করেছেন নানাভাবে।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে বিপুল উদ্যমে গবেষণা চলছে। ইয়োরোপ-আমেরিকার খ্যাতিমান বিজ্ঞানীগণ জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতূহল প্রকাশ করে চলেছেন। এ সময়ে ধারা-বদল হওয়ার সূচনা ঘটল ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে আকস্মিক-ভাবে লক্ষ্য করলেন জড়বস্তুতে প্রাণস্পন্দনের মতো সাড়া। এ এক অভূতপূর্ব বিস্ময়। প্রাণীদের মতো জড়বস্তুতেও উত্তেজনায় সাড়া দেবার ধর্ম নিহিত, সংবেদনশীলতা ও ক্লান্তিবোধ—প্রাণীর মতো জড়বস্তুতেও আছে, ভাবা যায় না। অথচ দেখছেন, আছে। অভাবিত ব্যাপার। বিজ্ঞানের এক অভিনব নতুন পরিমণ্ডলের সন্ধান পেলেন জগদীশচন্দ্র। জড় ও জীবের মধ্যবর্তী সম্পর্কের প্রতিভাস তাঁকে গবেষণার এক নতুন পর্বে উপনীত করল।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দের প্যারিস-প্রদর্শনীতে আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞান কংগ্রেস-এর আয়োজন করা হয়েছে। আমন্ত্রণ এল। জগদীশচন্দ্রও জড় ও জীবের আভ্যন্তর সম্পর্ক নিয়ে তাঁর নতুন আবিষ্কার পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানজগতে প্রকাশের জন্যে উদ্বেল ছিলেন। দেখা করলেন বাংলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর স্যার জন উড্‌বার্নের সঙ্গে। প্যারিস আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসে তাঁর যোগদানের ইচ্ছার কথা বললেন। উড্‌বার্ন আশ্বাস দিলেন, তিনি চেষ্টা

করবেন। কিন্তু সবটাই নির্ভর করবে ভারত সচিবের বিবেচনার ওপরে। এই নিয়ে শিক্ষা-অধিকর্তার সঙ্গে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। জগদীশ-চন্দ্র সরাসরি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করায় শিক্ষা-অধিকর্তা কিছুটা ক্ষুব্ধ হলেন। গভর্নর উডবার্ন ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগার পরিদর্শন করে খুশি হয়ে গবেষণার জন্যে কয়েকটি বৃত্তি মঞ্জুরের কথা দেন। এ ঘটনায় শিক্ষা-অধিকর্তার মনোভাব বদলে যায়। আরো কিছু বাধা-বিঘ্ন উৎরে শেষ পর্যন্ত প্যারিস-কংগ্রেসে যাবার অনুমোদন আসে ভারত সচিবের কাছ থেকে। 'জড়ের প্রাণস্পন্দন' নিয়ে তাঁর গবেষণা প্যারিস কংগ্রেসে প্রদর্শনের প্রয়োজনের কথা মেনে নেয় সরকার।

এত ঘটনার পিছনে আর্থিক সঙ্গতির একটা বড় প্রশ্ন থেকে যায়। বিদেশে ঘোরাঘুরি করতে প্রচুর টাকা পয়সার দরকার। আবার টাকা-পয়সার অভাবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সব ব্যর্থ হয়ে যাবার যোগাড়। প্যারিস কংগ্রেসে যোগ দেবার পূর্বে তাই রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর দেবমাণিক্য পনেরো হাজার টাকা দিলেন জগদীশ-চন্দ্রকে। সে টাকা সম্বল করে প্যারিস-পাড়ি।

১৯০০-এর জুলাই মাসে প্যারিস কংগ্রেসে যোগ দিতে রওনা হলেন। যাবার আগে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর আশা-নিরাশার দোদুল্যমান মনোভাবের কথা জানালেন এক চিঠিতে। আগস্ট মাসে প্যারিসে পৌঁছে বাংলা ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে প্যারিস কংগ্রেসে যোগ দেন। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-জগৎ তাঁর কাছে প্রথম শুনতে পেল জড়ের চেতনার কথা। কেবল শোনা নয়, যন্ত্রযোগে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সত্যের নির্ধারণ পর্যন্ত দেখতে পেল সকলে। জগদীশচন্দ্রের এই অভূতপূর্ব আবিষ্কারে বিজ্ঞান-জগতে মহা আলোড়ন দেখা দিল। এ সভাতে স্বামী বিবেকানন্দও উপস্থিত ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক উপলব্ধিতে সকলের সঙ্গে তিনিও কেবল আলোড়িত হয়েছিলেন, তাই নয়, বাংলার গর্বে, ভারতের সুনামে তাঁরও যে গর্ব, তাঁরও যে সুনাম সে কথা বলেছেন তাঁর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে উচ্ছ্বসিত ভাষায়।

সরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং প্যারিসে পদার্থ ও প্রাণী-বিজ্ঞান সভাতেও বক্তৃতা দিতে হল তাঁকে। তারপরে ফ্রান্স থেকে বিদায় নিয়ে ইংল্যাণ্ডে এলেন।

প্যারিস কংগ্রেসে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী মহলে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের এক অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। জড়ের প্রাণ-স্পন্দন-এর কথা দেখতে না দেখতে ছড়িয়ে পড়েছিল পাশ্চাত্যের সর্বত্র। সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই, বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত। এ-ও কি সম্ভব? এ-ও কি বিশ্বাস করতে হবে? অসম্ভব কিংবা অবিশ্বাস্য কিনা প্যারিস

কংগ্রেসে তা প্রমাণ হলেও দ্বিধা যায় না। তাই প্যারিসেও যেমন, লণ্ডনেও তেমনি নানা বিপরীত পরিস্থিতির সামনে আসতে হয়েছে জগদীশচন্দ্রকে। সে সব বিচিত্র অবস্থার কথা রবীন্দ্রনাথকে লিখে জানিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ প্রবল উৎসাহ দিয়ে তাঁর উত্তর দিয়েছেন, 'যুদ্ধ ঘোষণা করে দিন'।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধরার যন্ত্রের কাজ নিয়ে বিজ্ঞানী লজ-এর সঙ্গে কিছুটা মত-দ্বৈধতা ছিল। ব্র্যাডফোর্ডে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে (সেপ্টেম্বর, ১৯০০) যে নিবন্ধ পাঠ করেন জগদীশচন্দ্র তাতে লজ-এর ভ্রান্তি দূর হয়। তিনি সপ্রশংস-ভাবে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে একমত হন। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে যথেষ্ট অর্থের দরকার। বিজ্ঞানী লজ আগ্রহ নিয়ে জানতে চান, জগদীশচন্দ্রের যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি আছে কিনা।

এর কিছু দিন বাদে অধ্যাপক ব্যারেট এক পত্রে জগদীশচন্দ্রকে ইংল্যাণ্ডে থেকে তাঁর গবেষণার কাজ চালাবার প্রস্তাব দেন। এ জন্যে তাঁরা তাঁর উপযুক্ত একটি অধ্যাপনার চাকুরিরও ব্যবস্থা করবেন। জগদীশচন্দ্র অধ্যাপক ব্যারেট-এর প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর এক বন্ধুকে এ বিষয়ে লেখেন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। যদিও, তিনিও মনে করেন তাঁর গবেষণার কাজ অনেক সাবলীল হতে পারে যদি তিনি ইংল্যাণ্ডে থেকে যান। রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন, 'আমার সমস্ত **inspiration**-এর মূলে আমার স্বদেশীয় লোকের স্নেহ। সেই স্নেহবন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল?'

ব্র্যাডফোর্ডের ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে পঠিত জড় পদার্থের স্পন্দন নিয়ে লেখা নিবন্ধটি 'ইলেকট্রিসিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং এ পত্রিকায় তাঁর গবেষণা বিষয়ে প্রশংসাও সংযোজিত করা হয়। কিন্তু জড়পদার্থের স্পন্দন সম্পর্কে জীববিজ্ঞানীরা তাঁর মত সমর্থন করতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি এ নিয়ে আরও জোরদার প্রমাণ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এ সময়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রায় দু' মাস তাঁকে বিশ্রাম নিতে হয়। ডাক্তার ক্রম্‌বি তাঁকে পরীক্ষা করে বলেন, আভ্যন্তরীণ কঠিন রোগ। অস্ত্রোপচার ছাড়া গতি নেই। মিসেস ওলেবুলে তখন উইরোপে ভ্রমণ করছিলেন। জগদীশচন্দ্রের অসুস্থতার খবর পেয়ে ইংল্যাণ্ডে এসে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ১১ই ডিসেম্বর অস্ত্রোপচার হয়। মিসেস ওলেবুলে এবং লেডি অবলা বসুর সেবাশুশ্রূষায় জগদীশচন্দ্র সুস্থ হয়ে ওঠেন। তাঁর শারীরিক অসুস্থতার সময়ে রয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে এবং রয়াল সোসাইটি অব আর্টস থেকে তাঁর আমন্ত্রণ আসে। তিনি স্থির করেন 'ভারতবর্ষের বিজ্ঞান চর্চা' বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন।

এপ্রিলের শেষে রয়াল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের ছুটি তার আগেই শেষ হবে। ইণ্ডিয়া অফিসে আবেদন করতে

হল। ছ'মাসের ছুটি মঞ্জুরও হয়ে গেল। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তাই পূর্বপরিকল্পিত কাজে মন দিলেন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারিতে লর্ড র‍্যালে এবং স্যার জেমস্ ডেওয়ার তাঁকে বিখ্যাত ডেভি-ফ্যারাডে পরীক্ষাগারে কাজ করতে আহ্বান করেন। শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী ছাড়া এরূপ আহ্বান কাউকে করা হত না। এখানে তিনি নিশ্চিত প্রমাণ করেন যে, বাইরের উত্তেজনায় প্রাণী ও জড় পদার্থের সাড়া মূলত একই।

এবার নতুন চিন্তা এল উদ্ভিদ সম্পর্কে। জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাড়া-লিপিতে তিনি আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন (এপ্রিল, ১৯০১)। রয়াল ইন-স্টিটিউশনের শুক্রবাসরীয় সান্ধ্য বক্তৃতায় জগদীশচন্দ্র পরীক্ষার সাহায্যে দেখান যে, প্রাণী ও জড়ের সাড়া-লিপির ভঙ্গী একই। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মে তারিখের এই বক্তৃতা সহযোগে পরীক্ষায় প্রাণী ও জড়ের ওপরে বিষক্রিয়ায় বা ক্লান্তিতে, বা উত্তেজনায় যে একই রকমের অভিব্যক্তির সাড়ালিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল তা দেখে পাশ্চাত্তের বিজ্ঞানীগণ হতবাক। জগদীশচন্দ্রের জিজ্ঞাসা ছিল, 'প্রাণী ও জড়ের প্রকৃতির মধ্যে যে একটা অন্তর্নিহিত ঐক্য রয়েছে, যন্ত্রের সাড়ালিপি কি তারই আভাস দেয় না?'

ধাতুবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ব্রিটিশ মিন্টের প্রধান স্যার রবার্ট অস্টেন রয়াল ইনস্টিটিউশনে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। বৈজ্ঞানিক ব্যাফেল মেনডোলা, 'ইলেকট্রিশিয়ান' পত্রিকা প্রভৃতি জগদীশচন্দ্রের এই নতুন আবিষ্কারের জন্য স্মরণীয় অভিমত জ্ঞাপন করেন।

॥ ৫ ॥

৬ জুন, ১৯০১ খ্রীস্টাব্দ। রয়াল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্র তাঁর আবিষ্কার নিয়ে পরীক্ষাসহ বক্তৃতা দেবেন। অক্সফোর্ড থেকে স্যার বার্ডন স্যান্ডারসন উপস্থিত। ডক্টর ওয়ালার এবং তাঁর সমর্থকরাও সঙ্গে আছেন। ডক্টর ওয়ালার পূর্বেই জগদীশচন্দ্রের তত্ত্ব সম্পর্কে দ্বিমত ছিলেন। আর স্যান্ডারসন তো বক্তৃতা সভায় বলেই ফেললেন যে, পদার্থের অনুভূতি ব্যাপারটা শারীর-বিজ্ঞানের বিষয়। জগদীশচন্দ্র তাতে অনধিকারী।

ঐ সময়ে ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা শ্রেণী-বিরোধে অন্ধ। তাঁরা বিজ্ঞানকে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত করে যার যার এক্তিয়ারে সীমাবদ্ধ। তাই পদার্থবিদ্ শারীরবিজ্ঞান বুঝবেন, বা রসায়নবিদ পদার্থবিজ্ঞান বুঝবেন, অথবা বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার সঙ্গে প্রতি শাখার একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে এ তাঁরা মানতে বা বুঝতে চাইতেন না। সম্ভবত এসব কারণেই জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারকে তাঁরা অনেকে খোলা মনে সহজে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। স্যান্ডারসন স্পষ্ট করেই বললেন যে, জগদীশচন্দ্রের নিবন্ধের শেষে উদ্ভিদের সাড়া

সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা অবিশ্বাস্য। কিন্তু বক্তৃতা সভায় যখন জগদীশচন্দ্র তাঁর পরীক্ষা দেখাতে থাকলেন, তখন দেখা গেল, স্যার বার্ডন স্যান্ডারসন প্রশংসামুখর হয়ে উঠেছেন। হলে কি হবে, স্যান্ডারসন আর ওয়ালার-এর অভিমান যাবে কোথায়! জগদীশচন্দ্র স্পষ্ট অনুভব করলেন, তিনি যে সত্য নিশ্চিতরূপে আবিষ্কার করেছেন, এই দুই খ্যাতিমান্ শারীরতত্ত্ববিদ্ তাকে সহজে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। জগদীশচন্দ্র এ প্রসঙ্গে তাঁর কোনও বন্ধুকে লিখেছিলেন, "এবার শারীরবিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমার প্রকৃত সংগ্রাম শুরু হবে। কিন্তু সব সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজন দীর্ঘদিনের অনলস প্রয়াস। স্যান্ডারসন শারীরবিজ্ঞানীদের মধ্যে অগ্রগণ্য—সবাই তাঁর কথা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে। কিন্তু একাকী সংগ্রাম করার জন্যে, যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন, তারও অভাব হবে না।"

"বাধা যতই গুরুতর হউক তুমি যে ভার গ্রহণ করিয়াছ তাহা সমাধা না করিয়া তোমার নিষ্কৃতি নাই; সে জন্য যে কোন প্রকার ত্যাগস্বীকার প্রয়োজন তাহা তোমাকে করিতে হইবে।"—লণ্ডনে থাকতে যখন নানা প্রতিকূল অবস্থায় জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়, বিষণ্ণতা ও উদ্বিগ্নতা যখন তাঁকে প্রায় গ্রাস করতে চাইছে, রবীন্দ্রনাথ তখন দেশ থেকে অনবরত তাঁকে উজ্জীবিত ও উৎসাহিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কেবল পত্রের মারফৎ কথার প্রেরণাই নয়, স্বদেশে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে নিয়মিত প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশ করছেন, যাতে স্বদেশের মানুষ তাঁর কথা ভাবে, তাঁর বিজ্ঞান-গবেষণার গুরুত্ব বোঝে।

জগদীশচন্দ্র এ সময়ের কথা চিঠিপত্রে একের পর এক যেমন রবীন্দ্রনাথকে লিখেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি তাঁকে সব বাধা সব হতাশা কাটিয়ে উঠে নিজের কর্তব্য সাধনের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেন। কবির বিবেক প্রসূত বোধ এটা উপলব্ধি করেছিল যে, জগদীশচন্দ্র যে সত্য প্রমাণ করতে চাইছেন তা কোনও ব্যক্তিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিষ্ঠার বিষয় নয়, তা সর্বমানবের একান্ত জ্ঞানের বিষয়। সে সত্য উদ্ঘাটনে ব্যক্তির চাইতে দেশের মহিমা অনেক বেশি প্রকট হবে। কেননা, "তুমি যাহা দেখিতে পাইয়াছ তাহা বৈজ্ঞানিক মায়া-মরীচিকা নহে তাহাতে আমার সন্দেহমাত্র, দ্বিধামাত্র নাই। তোমার উদ্ভাবিত সত্য একদিন বৈজ্ঞানিক সিংহাসনে অভিসিক্ত হইবে।" রবীন্দ্রনাথ এভাবে বুঝেছিলেন জগদীশচন্দ্রকে। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন, বিশ্বে ভারতের উপলব্ধি প্রকাশের যে সুযোগ জগদীশচন্দ্র মারফৎ এসেছে তার সার্থক রূপায়ণে হেলাফেলা বা ভয়ভীতি, কোনটাই চলবে না। তাই জগদীশচন্দ্রকে ক্রমাগত উৎসাহ-উদ্বোধনের কথা লিখতে থাকেন।

জগদীশচন্দ্রের তখনকার মনের অবস্থা রবীন্দ্রনাথকে লেখা এক চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে। লিখেছেন, "...এই বিদেশে থাকিয়া, দিন-রাত্রি পরিশ্রম

করিয়া আমার মন কিরূপ অবসন্ন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? সম্মুখে অজ্ঞাত রাজ্য। আমি একাকী পথ খুঁজিয়া একান্ত ক্লান্ত···। তোমার স্নেহে আমার অবসন্নতা চলিয়া যায়···মাঝে মাঝে তোমাদের উৎসাহবাক্যে আমাকে পুনর্জীবিত করিও।"

রয়াল সোসাইটি জগদীশচন্দ্রের নিবন্ধ গ্রহণ করেও প্রকাশ করল না। কারণ, শারীরতত্ত্ববিদ্ সদস্যগণের অনেকেই তাঁর আবিষ্কারকে মেনে নিতে পারেন নি। এতে তাঁর মন ভেঙ্গে পড়ল। ইয়োরোপীয় কতিপয় জীব-বিজ্ঞানীর বিরোধিতা তাঁর গবেষণার সব পরিকল্পনা প্রায় বানচাল করে দিতে উদ্যত। তাঁর খ্যাতি, তাঁর আশা সব যেন ম্লান হয়ে যাবার পথে। গবেষণার যে সামান্য সুযোগ-সুবিধা তাঁর জুটেছিল তাও আর জুটবে না, ডেপুটেশনের সময়ও সীমিত হয়ে এসেছে। তিনি কী করবেন তাই ভেবে ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠলেন। এখন ইংলণ্ডে থাকলে প্রেসিডেন্সি কলেজের চাকরি ছাড়তে হবে, অথবা তাঁর কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখেই দেশে ফিরে যেতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ বার বার তাঁকে দ্বিধা কাটিয়ে উঠে মন স্থির করতে লিখতে থাকেন। তাঁর সংকল্পিত কাজ শেষ না করে দেশে ফেরা চলবে না—এই অভিমত নানা ভাবে বুঝিয়ে লিখতে থাকেন বিভিন্ন চিঠি-পত্রে।

ডেপুটেশনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্যে আবেদন মঞ্জুর হল না। অগত্যা কর্তৃপক্ষের কাছে ফার্লোর জন্যে আবেদন করলেন। এবার ফার্লোর আবেদন মঞ্জুর হল। কিন্তু আর্থিক সমস্যার সমাধান কি করে হবে? রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজার কাছে জগদীশচন্দ্রকে আর্থিক সহায়তার জন্যে অনুরোধ করেন। মহারাজার আনুকূল্যে জগদীশচন্দ্র বিদেশ-বিভুঁইয়ে স্বনির্ভরতা লাভ করে তাঁর সংকল্প সফল করে তুলতে নতুন করে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন।

লিনিয়ান সোসাইটিতে বক্তৃতার আমন্ত্রণ এল। খ্যাতনামা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ভাইন্‌স্‌ তখন লিনিয়ান সোসাইটির সভাপতি, আর অধ্যাপক হাউয়েস সম্পাদক। এঁরা দু'জনেই ইতিপূর্বে জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগার দেখে গেছেন। রয়াল সোসাইটি জগদীশচন্দ্রের যে প্রবন্ধ প্রকাশ করে নি, তাঁরা লিনিয়ান সোসাইটিতে তা পাঠাতে অনুরোধ করেন।

অধ্যাপক ভাইন্‌স্‌ জগদীশচন্দ্রের গবেষণায় মুগ্ধ। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ২০-এ মার্চ লিনিয়ান সোসাইটিতে যখন জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দেন, তখন পশ্চিমের বিজ্ঞানীগণ শুধু বিস্ময়াভিভূতই হন নি, জগদীশচন্দ্রকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছেন, সহায়তা ও সহযোগিতায় বিমুখ থাকেন নি। লিনিয়ান সোসাইটিতে বক্তৃতা দিয়ে জগদীশচন্দ্র নতুন উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। লিনিয়ান সোসাইটির সম্মেলন রয়াল সোসাইটির সম্মেলনের তুলনায় অনেক ব্যাপক। জগদীশচন্দ্র এখানে তাঁর মৌলিক গবেষণা প্রদর্শন করে বিজ্ঞান-জগতে আশাতীত স্বীকৃতি লাভ করেন।

অধ্যাপক ভাইন্‌স্ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। উদ্ভিদ-দেহের সংবেদনশীলতা নিয়ে তাঁর আর কোনও দ্বিধা নেই। কিন্তু লিনিয়ান সোসাইটির জার্নালে জগদীশচন্দ্রের নিবন্ধ প্রকাশে তবুও বিঘ্ন দেখা দিল। রয়াল সোসাইটিতে নিবন্ধটি পাঠ করার আট মাস বাদে ডক্টর ওয়ালার-এর নামে সেটি লণ্ডনের এক বিজ্ঞান-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাই লিনিয়ান সোসাইটির পত্রিকায় তাঁর নিবন্ধটি প্রকাশে ডক্টর ওয়ালার-এর সমর্থক বিজ্ঞানীরা বাধা দেন। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হয় এবং জগদীশচন্দ্রের নিবন্ধ লিনিয়ান সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ ব্যাপারে অধ্যাপক ভাইন্‌স্-এর বিজ্ঞানী-সুলভ সহৃদয়তাই জগদীশচন্দ্রকে পাশ্চাত্যের বহু বিজ্ঞানীর বিরোধিতা ও বিরূপ মনোভাবকে উপেক্ষা করার দুঃসাহস যুগিয়েছিল।

জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণার কথা আর কোন বিজ্ঞান-পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের চেষ্টা না করে সরাসরি গ্রন্থাকারে প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। তাতে আর কারও বিরোধিতা বা বিরূপ মনোভাব বাধা হয়ে উঠবে না। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম গবেষণা-গ্রন্থ 'Response in the Living and Non-Living'। প্রকাশক লংম্যান, গ্রীন এ্যাণ্ড কোম্পানি। এ গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানী মহলে নতুন সাড়া উঠল, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা অযাচিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করল বিজ্ঞানীর উদ্দেশ্যে। দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার, প্রিন্স ক্রোপেটকিন, অধ্যাপক কারভেল রিড তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে সম্মানিত করলেন জগদীশচন্দ্রকে।

একে একে বেলফাস্ট, জার্মেনী প্রভৃতি স্থান থেকেও জগদীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এসব স্থানেও তিনি তাঁর গবেষণামূলক বক্তৃতা দিয়ে জ্ঞানী-গুণী-বিজ্ঞানী মহলকে চমকে দেন। কারণ তাঁর আবিষ্কার অভাবিত, সম্পূর্ণ নতুন এক বিজ্ঞান-সত্যের সংবাদবহ। রয়াল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির কাগজে তাঁর এক নিবন্ধ প্রকাশের পর ফটোগ্রাফির নতুন তত্ত্ব নিয়ে এ সোসাইটিতেও পরে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়। এই সময় রয়াল সোসাইটি এবং লিনিয়ান সোসাইটি জগদীশচন্দ্রের বিতর্কিত ও উপেক্ষিত সব প্রবন্ধ প্রকাশের অভিমত জানায়।

অবশেষে ইয়োরোপে নিজের জয়পতাকা উড়িয়ে জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরে এলেন ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে।

॥ ৬ ॥

"আজ কাগজে এক সংবাদ দেখিয়া চক্ষুস্থির। আমার একটি পুচ্ছ সংযোগ হইয়াছে।"—রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন জগদীশচন্দ্র। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে ভারত সরকার বিজ্ঞানে

মৌলিক অবদানের জন্যে জগদীশচন্দ্রকে সি. আই. ই. উপাধি দেন। জগদীশ-চন্দ্রের ভাষায় সেটি 'পুচ্ছ' ছাড়া আর কিছু নয়।

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারিতে ভারত সরকার, ফেব্রুয়ারিতে ভারত সঙ্গীত সমাজ জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দিত করে। ডিসেম্বরে জগদীশচন্দ্র তাঁর নতুন গবেষণা-লব্ধ ফলাফল কয়েকটি নিবন্ধাকারে লিখে রয়াল সোসাইটিতে পাঠান। সোসাইটি সেগুলো প্রকাশ করবে বলে জানায়। কিন্তু কিছুকাল পরে রয়াল সোসাইটির কর্তৃপক্ষ অভিমত দেয় যে, যেহেতু জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ফলাফল অপ্রত্যাশিত, এবং প্রচলিত ধারণার বিরোধী, জীববিজ্ঞানীরা তা মেনে নিতে পারছেন না, সুতরাং তাঁর নিবন্ধ সব আপাতত প্রকাশ করা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ সময়ে জগদীশচন্দ্রের উনিশটি গবেষণামূলক নিবন্ধ তৈরী। প্রকাশের পথ নেই। তাঁর গবেষণা-তত্ত্ব যে-সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত, সে-সত্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন কোন বিজ্ঞানী তখনও সন্দিহান, আর কেউ কেউ অস্বীকার করতে না পারলেও মেনে নেবে না—এমনি অবস্থা। বুঝি বা তাঁর আত্ম-প্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়, এই আশঙ্কায় জগদীশচন্দ্র বিচলিত। এর মধ্যেই বুদ্ধগয়া ভ্রমণ করে এলেন ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। সঙ্গে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, আচার্য যদুনাথ সরকার, স্বামী শঙ্করানন্দ প্রভৃতি তখনকার বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান ব্যক্তি।

বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা-গবেষণা নিয়ে অষ্টপ্রহর নিমগ্ন থাকলেও দেশের বর্তমান কালের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজের যোগ বিচ্ছিন্ন করেন নি কখনও জগদীশচন্দ্র। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে 'কার্লাইল সার্কুলার' ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হওয়া নিষিদ্ধ করল। প্রতিবাদ এল দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে। পরিকল্পনা হল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। জগদীশচন্দ্র প্রস্তাব দিলেন ফেডারেশন হলের। সেখানে দেশের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশ হবে। স্বদেশের শিল্প-বিজ্ঞান-সাহিত্য-রাজনীতি-দর্শন-ইতিহাস—সব কিছু নিয়ে চর্চা হবে। সেটি হবে বঙ্গসংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল, জ্ঞানের আন্তর্জাতিক মিলনভূমি। এ পরিকল্পনা জগদীশচন্দ্রের। বোঝা যায়, শুধু বিজ্ঞানের আবিষ্কার নয়, দেশকেও নতুন দৃষ্টিতে আবিষ্কারের কথা ভেবেছেন জগদীশচন্দ্র।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হল ***Plants Response as a means of Physiological Investigation*** এবং ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ***Comperative Electrophysiology***। প্রকাশক বিলাতের লংম্যান কোম্পানি। উদ্ভিদ-জীবনের অদৃশ্য-অব্যক্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বিচিত্র বার্তাবহ এ বই দু'খানি বিশ্ব-বিজ্ঞান সমাজকে আলোড়িত করে তুলল।

ইয়োরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিজ্ঞান-গবেষণাগারে জগদীশচন্দ্র-

উদ্ভাবিত যন্ত্রে, তাঁরই উদ্ভাবিত প্রক্রিয়ায় শুরু হয়ে গেল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রুশ, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় গ্রন্থ দু'খানি অনুবাদের প্রস্তাব এল। 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকা লিখল, "রাজনৈতিক আন্দোলনের নায়ক হিসেবে বাংলাদেশ যখন মানুষের কাছে পরিচিত, তখন অধ্যাপক বসুর দু খানি গ্রন্থ আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, বাঙ্গালীর প্রতিভা মহৎ কাজে ব্রতী।"

এ বছরই রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উৎসর্গপত্রে কবি বিজ্ঞানীকে লিখলেন, 'সত্যরত্ন তুমি দিলে, পরিবর্তে তার / কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।'

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে আবার পশ্চিম-যাত্রা। ইতিমধ্যে জগদীশচন্দ্র যেসব নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন সেগুলোর সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ওদেশে না গেলে অবহেলিত অপাংক্তেয় হয়ে সে সবের কথা মানুষ ভুলে যাবে। তাতে ক্ষতি কেবল বিজ্ঞান-জগতেরই নয়, ক্ষতি সমগ্র মানব জাতির। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার আমন্ত্রণে সেখানেও গিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। সেখানকার বিজ্ঞানীগণ তাঁর আবিষ্কারের খবর জানতেন। এবার চাক্ষুষ স্বয়ং বিজ্ঞানীর হাতে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সত্য-বিচার দেখে তাঁরা কেবল মুগ্ধ নন, তাঁরা বিজ্ঞানীকে নিজেদের একজন হিসেবেই গ্রহণ করলেন। আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে জগদীশচন্দ্রের প্রদর্শনী-বক্তৃতারও সুযোগ এবং ব্যবস্থা করলেন তাঁরা।

মিসেস ওলি বুল আমেরিকার এক ধনী মহিলা। তিনি ছিলেন বিবেকানন্দের ভক্ত। জগদীশচন্দ্রকে ·তিনি আমেরিকা সফরে সহায়তা করেন। আমেরিকাতে এই বৃদ্ধার গৃহেই জগদীশচন্দ্র অতিথি হন। আর সে অতিথি সন্তান-বাৎসল্যের আতিথেয়তা লাভ করেন।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে এলেন জগদীশচন্দ্র। এবারের প্রত্যাগমনের পথে সঙ্গে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। বোম্বাই এসে তিনি চলে যান মাদ্রাজে আর জগদীশচন্দ্র তাঁর সহধর্মিণী অবলা বসুকে নিয়ে চলে আসেন কলকাতা।

এবারের বিদেশ ভ্রমণ জগদীশচন্দ্রের জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই ভ্রমণকালেই বিজ্ঞানে তাঁর স্বকীয় অবদান ইয়োরোপ তথা আমেরিকাতে সর্বজন-স্বীকৃতি লাভ করে। এ যাত্রাতেই তিনি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জগতে একজন সত্যদ্রষ্টা বিজ্ঞানীর সম্মান লাভ করেন। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়, বিজ্ঞান-সংস্থা, বিজ্ঞানী এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এ সময়ে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারে শুধু বিস্ময়াবিষ্ট হন নি, তাঁকে যথোপযুক্ত সম্বর্ধনা ও অভিনন্দন দিয়ে সম্মানিতও করেন।

দেশে ফিরে এবার নিজের দেশকে চেনার কথা ভাবলেন বিজ্ঞানী। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে গ্রীষ্মের ছুটিতে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে সস্ত্রীক যাত্রা করেন

কেদার-বদরী দর্শনে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, দেশকে বুঝতে হলে দেশের তীর্থ-স্থান, জনপদ এবং দেশের মানুষের সঙ্গে একান্ত পরিচয় দরকার। এ বিষয়ে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

ময়মনসিংহ শহর জগদীশচন্দ্রের জন্মস্থান। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ১৪ই এপ্রিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন হবে সেখানে। সভাপতি জগদীশচন্দ্র বসু। সাহিত্য-সভার সভাপতি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র, এটাতে একটা আপাতবিরোধ লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান এবং সাহিত্যে কোনও বিরোধ স্বীকার করেন নি। বরঞ্চ বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সাধনাকে তিনি মানুষের সাধনার দুইটি পথ হিসেবেই গ্রহণ করে-ছিলেন। সে কথা তিনি তাঁর 'অব্যক্ত' গ্রন্থের কয়েক জায়গাতেই ব্যাখ্যা করেছেন। স্থির হয়, সভাপতির ভাষণে জগদীশচন্দ্র তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে বলবেন। ময়মনসিংহ তখন জমিদার-প্রধান অঞ্চল। তিনি প্রস্তাব দেন, অধিবেশনে যেন প্রবেশ-মূল্য নেওয়া না হয়। কারণ সে সময় দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা ব্যাপক কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টি তা এড়ায় নি। তাই অর্থাভাবগ্রস্ত সাধারণ মানুষও যাতে তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে অজ্ঞাত না থাকে, সে জন্যেই প্রবেশ-মূল্য রদের প্রস্তাব। অধিবেশনের উদ্যোক্তাগণ তাঁর প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র দু'দিন ভাষণ দেন, এক দিন বাংলায়, অন্য দিন ইংরেজিতে। তাঁর সে বিখ্যাত ভাষণ 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

এ বছরই (১৯১১) ১৩ই অক্টোবর দার্জিলিঙ-এ ভগিনী নিবেদিতা দেহত্যাগ করেন। সে দিনটি সারা ভারতের শোকের দিন নিশ্চিত। কিন্তু বিজ্ঞানী দম্পতি জগদীশচন্দ্র ও লেডি অবলার জীবনে তা মর্মান্তিক। কেননা, ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন তাঁদের জীবনের সুখ-দুঃখের অন্তরঙ্গ অংশীদার। আবার এ বছরই (১৯১১) পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে সি. এস. আই. উপাধি দেন। এক দিকে নিবেদিতার মৃত্যুতে জাতীয় তথা ব্যক্তিগত শোক, অপরদিকে রাজকীয় সম্মান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অব সায়েন্স উপাধিতে ভূষিত করে ১৯১২-এর ১৬ই মার্চ। এ বছরই রামমোহন লাইব্রেরির সভাপতি নির্বাচিত হন জগদীশচন্দ্র। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত থেকে নানা কর্মোদ্যোগ পরিচালনা করেন। এখানে প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা এবং বক্তৃতার প্রবর্তন করেন। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে যাত্রা গানের ব্যবস্থা, কথকতার আয়োজন ইত্যাদি নানা স্বদেশী সংস্কৃতির উজ্জীবনের প্রচেষ্টা করেন।

এসব সত্ত্বেও তাঁর বিজ্ঞান-চিন্তা এবং আবিষ্কারের কাজ কিন্তু থেমে থাকে নি বা ব্যাহত হয় নি। দেশের সামাজিক দাবী স্বীকার করে নিয়েও

বিজ্ঞানের সাধনায় তাঁর নব নব উদ্ভাবনা চলছিল নিরন্তর। এসব নানা কাজের মধ্যেও তিনি উদ্ভিদ-দেহের স্পন্দন সঠিক পরিমাপের আরও উন্নত যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তৈরি করেন 'রেজোন্যান্ট রেকর্ডার', 'অসিলেটিং রেকর্ডার' প্রভৃতি যন্ত্র। এ সময়েই তিনি প্রাণিদেহের মতো উদ্ভিদ-দেহেও এক ধরনের স্নায়ুতন্ত্রের সন্ধান পান। এ সম্পর্কিত নিবন্ধ রয়াল সোসাইটির 'ফিলজফিক্যাল ট্রানজেকশনস্' পত্রে প্রকাশিত হয় ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে।

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলেন। এতে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হবার কথা জগদীশচন্দ্রের। কারণ, ইতিপূর্বে তিনি যতবার বিদেশে গেছেন, তাঁর বিজ্ঞানের আবিষ্কার প্রচারের সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যের নবীন প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গল্প প্রচারেও সমান প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ক্ষেত্র বিশেষে বিদেশে তিনি নিজে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন, আবার তদ্দেশীয় বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকদের দিয়েও অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে হয় যে, সে সময়ে ভারতের এই দুই দিক্‌পাল প্রতিভা যেন আশ্চর্যভাবে উভয়কে উভয়ে চিনেছিলেন। তাই একে অন্যের পরিপূরকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন। নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হবার পরে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন (১৯১৩, ১৯-এ নভেম্বর), "পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্য ভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর হইল।" নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয় তার সভাপতি ছিলেন স্বয়ং জগদীশচন্দ্র।

জগদীশচন্দ্রের পঞ্চান্ন বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে (১৯১৩)। সরকারী নিয়মে অবসর গ্রহণের বয়স। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতিভা ও অধ্যাপন-কুশলতার কথা ভেবে চাকুরীর মেয়াদ আরও দু'বছর বাড়িয়ে দেন। ইতিমধ্যে লজ্জাবতী-লতার স্নায়ুর স্পন্দন বিষয়ক এক বক্তৃতার আয়োজন হয় কলকাতায়। তার সভাপতিত্ব করেন বাংলার লাটসাহেব লর্ড কারমাইকেল।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকারের উদ্যোগে জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞান-মিশন নিয়ে বেরিয়ে পড়েন পৃথিবী পর্যটনে। এবার সঙ্গে নিয়েছেন ভারতীয় গাছ-গাছড়া—লজ্জাবতী লতা, বনচাঁড়াল প্রভৃতি উদ্ভিদ, আর তাঁর উদ্ভাবিত অধুনাতন যন্ত্রপাতি। এবারের সফরে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, শিকাগো, ক্যালিফোর্নিয়া, টোকিও প্রভৃতি স্থানে জগদীশচন্দ্র তাঁর পরীক্ষা দেখান। জগদীশ-চন্দ্রের ভাষায়, "...আমি সম্পূর্ণ একাকী, অদৃশ্যে কেবল সহায় ছিলেন ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং যাঁহারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁহারা পরে আমার বান্ধব হইলেন।"

বোঝা যায়, এই সফরের সময়ও তাঁকে নানা বিরোধ ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন

হতে হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি জয়ী হয়েই দেশে ফেরেন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে জাপান হয়ে দেশে ফিরলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেণীর মানুষের অকুণ্ঠ অভিনন্দনে ভূষিত হয়ে।

এ বছরই (১৯১৫) তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সমাপ্ত হল একত্রিশ বছরের অধ্যাপনার জীবন। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছাড়লেন না। অবৈতনিক অধ্যাপক হিসেবে সসম্মানে তাঁকে যুক্ত রাখলেন কলেজের সঙ্গে। কলেজের ল্যাবোরেটরিতে অবাধ হল তাঁর গবেষণা। ভারত সরকার বার্ষিক এক লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করল তাঁর গবেষণার জন্য। এ সময়ে লিড্‌স বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বিশেষ সম্মানজনক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে, আর এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় দেয় এল. এল-ডি. উপাধি। তাঁর পৈত্রিক বাসভূমি বিক্রমপুর থেকেও এসময়ে তাঁকে সম্বর্ধিত করা হয় সেখানকার ‘বিক্রমপুর সম্মিলনী’র উদ্যোগে। এই সম্বর্ধনায় তিনি যে অভিভাষণ দেন, তাঁর ‘অব্যক্ত’ গ্রন্থে সেটি সংকলিত হয়েছে ‘বোধন’ নামে।

॥ ৭ ॥

১৫ই জানুয়ারি, ১৯১৬। লক্ষ্ণৌ-এ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন। জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন অদৃশ্য আলোক নিয়ে। এই বক্তৃতাই পরে ‘অব্যক্ত’ গ্রন্থে স্থান পায় ‘অদৃশ্য-আলোক’ রচনা রূপে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানেও ভাষণ দেন জগদীশচন্দ্র। তাঁর বাল্য-স্মৃতিবিজড়িত ফরিদপুর শিল্প প্রদর্শনীতেও বক্তৃতা দেন এ বছর। এ বছরই রাজকীয় সম্মান নাইট উপাধি লাভ করেন। এ উপলক্ষে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররাও তাঁকে অভিনন্দিত করে এই একই বছরে।

সম্মান-খ্যাতির ঊর্ধ্বে দুটি বড় কারণে এ বছরটি স্মরণীয়। বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এবং তাঁর অন্যতম প্রধান আবিষ্কার ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের উদ্ভাবনও ঘটে এ বছরে।

বিজ্ঞান-মন্দিরের স্বপ্ন দীর্ঘদিনের। বিদেশের সুসজ্জিত সুন্দর গবেষণাগার দেখে স্বদেশেও তেমনি একটি গবেষণাগার স্থাপনের ইচ্ছা তিনি পুষে আসছিলেন প্রথমবার বিলাত ঘোরার পর থেকে। এবার সে স্বপ্ন বাস্তবের পথে। কিন্তু তাঁর পরিকল্পিত এ বিরাট কর্মযজ্ঞে বিপুল অর্থের দরকার। অভাব হল না। তাঁর নিজের প্রায় যথাসর্বস্ব তো উৎসর্গ করলেনই, তা ছাড়া, দেশের ধনী-নির্ধন সকলের সহযোগিতাও এল নানা ভাবে নানা দিক থেকে। উপরন্তু তৎকালীন দেশ-বিদেশের বহু গুণী ও ধনীজনদেরও হাত এগিয়ে এল এই যজ্ঞ সমাধা করতে। দেশের সরকারের সময়োচিত সহায়তাও এসেছে।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভাইনস্‌কে একটি চিঠিতে তিনি (১৫ নভেম্বর, ১৯১৬) লেখেন, “……বর্তমান দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে হলে মানুষকে বৃহৎ কর্মসাধনে ব্রতী হতে হবে। একদিন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে প্রীতি-

বন্ধনের একটা সৌন্দর্য ছিল। আমি আশা করি, সে দিন আবার ফিরে আসবে। যেখানে বিজ্ঞানের নামে এক সঙ্কল্প সাধনের জন্যে বহুসংখ্যক কর্মীর সহযোগ ঘটবে, এমন একটি মিলন-প্রাঙ্গণ গড়ে তোলবার মধ্য দিয়েই সে বিশ্বজনীন প্রীতিবন্ধন সম্ভব হবে।" বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত এই চিঠিতে।

বিজ্ঞান-মন্দির হবে কলকাতায় আর উদ্ভিদ-জগৎ নিয়ে ফলিত গবেষণার এক উন্মুক্ত কেন্দ্র হবে ফলতায় এবং দার্জিলিঙে পাহাড় চূড়ায় হবে আরও একটি উদ্ভিদ-বিষয়ক পরীক্ষা-কেন্দ্র। একযোগে এই তিনটি কাজ সমাধার জন্যে তিনি ব্রতী। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ৩০-এ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হল বসু বিজ্ঞান-মন্দির। এ বিজ্ঞান-মন্দিরের স্থাপত্য ভারতীয় শিল্প-চেতনারই প্রতিরূপ। বহিরঙ্গন এবং অভ্যন্তর ভাগের সুবিন্যস্ত ও সুশৃংখল সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনা প্রমাণ করে যে, আচার্য জগদীশচন্দ্র কেবল বিজ্ঞানী নন, কেবল শিল্প-বোধই তাঁকে অনুপ্রেরিত করে নি ; বলা যায়, এক ব্যাপক দেশজ মানবিক অনুভাবনাপ্রসূত বিজ্ঞান-চেতনাকে শিল্পায়নে নিয়োজিত করাই যেন তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁর ব্রত উৎযাপিত হল। দেশ-বিদেশে স্বীকৃত হল যে, একমাত্র ভারতের ইতিহাসেই নয়, বিজ্ঞান-জগতের ইতিহাসেও বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা এক অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। পরে ফলতায় এবং দার্জিলিঙেও তাঁর পরিকল্পিত পরীক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

কিছুদিনের মধ্যে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের মুখপত্র 'ট্রানজেকশন' প্রকাশিত হতে থাকে। এতে বিজ্ঞান-মন্দিরের বিজ্ঞান-সাধনার বিচিত্রমুখী প্রয়াসের কথা প্রকাশিত হয়। আবিষ্কার এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার যাবতীয় অভিজ্ঞতার কথাও প্রকাশিত হতে থাকে। খুব কম সময়ের মধ্যে এই 'ট্রানজেকশন' পত্রিকা পৃথিবীর বিজ্ঞানী-মহলে আগ্রহের সঞ্চার করে এবং সুনাম অর্জন করে।

॥ ৮ ॥

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে পঞ্চমবার ইংল্যাণ্ডে এসেছেন। সমগ্র ইংল্যাণ্ড তাঁর প্রতীক্ষায় ছিল যেন। তাঁর আবিষ্কারে মুগ্ধ-বিস্মিত বিজ্ঞানী ও জ্ঞানী-গুণী মহল কেবল তাঁকে অভিনন্দিত করেই চুপ থাকলেন না, তাঁর অধুনা গবেষণা ও আবিষ্কার সম্পর্কেও তাঁরা সব বুঝতে চাইলেন। রয়াল ইন্স্টিটিউশন, লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে তাঁকে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করা হয়। সকল স্থানেই তাঁর বক্তৃতা সমাদৃত হয়।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হলেন। তখনকার দিনে পৃথিবীর যে-কোনও দেশের যে-কোনও বিজ্ঞানীর এ এক বিরাট স্বীকৃতি। বিশেষ করে পরাধীন ভারতের একজন বিজ্ঞানী, যাঁকে ইতিপূর্বে বহুবার রয়াল সোসাইটির জীববিজ্ঞানীরা কোনও স্বীকৃতি দিতে চান নি, সেই বিজ্ঞানীর

বেলায় এ স্বীকৃতি আরও অর্থবহ। এ সময়ে লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়েও এক বক্তৃতা দেন। স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার সে বক্তৃতা শুনে অভিভূত হন।

বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে সে মন্দিরের কর্মযজ্ঞের সঙ্গে জড়িয়ে থেকেও তাঁর উদ্ভাবনা থেমে যায় নি বা ব্যাহত হয় নি। ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের দ্বারা উদ্ভিদের স্পন্দন কোটিগুণ বর্ধিত আকারে ধরে সে সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি গবেষণা-পত্র রয়াল সোসাইটিতে পাঠান। সেসব মহামূল্যবান বলে বিবেচিত হয়।

এবার তাঁর ডাক পড়ে প্রায় সর্বত্র। অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়, প্যারিস শারীরবিজ্ঞান কংগ্রেস থেকে শুরু করে ইয়োরোপের কোথাও বোধ হয় বাকি ছিল না যেখানে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শোনার জন্যে ডাক পড়ে নি। শুধু ডাক নয়—অভিনন্দন, স্বীকৃতি ও সম্মাননা। তবুও এরই মাঝে ডঃ ওয়ালার কিছুটা বিরোধিতার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে, তাঁর ধারণা যে ভুল জগদীশচন্দ্র তা প্রমাণ করেন। এই সময়ে জগদীশচন্দ্রের জীবনী ***Life & Works of Sir Jagadish Chandra Bose*** প্রকাশ করে লংম্যানস কোম্পানী।

জার্মান উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের অনেকেও জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত এবং বিরূপ ছিলেন। বার্লিনে পরীক্ষা-প্রদর্শনের পরে তাঁদের সব সন্দেহ দূর হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত সত্য মানতে বাধ্য হন। কেননা, অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া চোখের সামনে সে সত্য প্রমাণ করে।

এই ভ্রমণের সময়ে ইণ্ডিয়া অফিসে একবার বক্তৃতা দেন জগদীশচন্দ্র। তখন ভারত-সচিব মণ্টেগুর সঙ্গে পরিচয় ও কথাবার্তা হয়। মণ্টেগু জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। পরবর্তী কালে অনেকটা তাঁরই প্রচেষ্টাতে ভারত সরকার থেকে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্য অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরে এলেন। ২৫-এ জানুয়ারি কলকাতার টাউন হলে দেশের মানুষ তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করল এক জনসভায়।

এবার রবীন্দ্রনাথ ডাক দিলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর ইচ্ছা জগদীশচন্দ্র বিশ্বভারতীর ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ অলঙ্কৃত করুন। জগদীশচন্দ্র সানন্দে সে পদ গ্রহণে সম্মতি দিলেন।

ইতিমধ্যে তাঁর আরও তিনখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সবই তাঁর নব নব আবিষ্কারের অভাবিত অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী সমাজ এসব পাঠ করে তাঁর সম্পর্কে আরও আগ্রহী হয়ে উঠলেন। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে ষষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মিশন নিয়ে ইংল্যাণ্ডে গেলেন

জগদীশচন্দ্র। তাঁর ষষ্ঠ মিশন পূর্বাপেক্ষা আরও চমকপ্রদ। পাশ্চাত্যের জীব-বিজ্ঞানের সমস্ত ধ্যান-ধারণা তচ্‌নচ্‌ করে জগদীশচন্দ্র যে সত্যে উপনীত হয়েছেন তাকে অস্বীকার করা বা সন্দেহ করার আর কোনও অবকাশ নেই। সুতরাং এবারের সফরে জগদীশচন্দ্র কেবল একজন আবিষ্কারক নন, সত্যে উপনীত ঋষি, আচার্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যে নানা দেশের যশস্বী বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী ও জ্ঞানী-গুণীদের নিয়ে একটি সংস্থা গঠিত করে লীগ অব নেশনস্‌ (১৯২২)। এই সংস্থার নাম ইন্‌টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কমিটি। এর কর্তৃপক্ষ ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্রকে এই সংস্থার একজন সদস্য নির্বাচিত করে সম্মান দেন।

এ সময়ে প্যারিসের নানা স্থানে তাঁর নতুন আবিষ্কার নিয়ে বক্তৃতা দিতে হয়। ১৯২৪-এর মার্চ মাসে লীগ অব নেশনস্‌ ব্রুসেল্‌সের বিজ্ঞান কংগ্রেসে আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু সেখানে যাওয়া সম্ভব হয় নি সময়াভাবে। এপ্রিল মাসে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে আমন্ত্রিত হলেন। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ১৯-এ ডিসেম্বর এই উৎসবে তিনি ভাষণ দেন। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের ২১-এ ডিসেম্বর ভাষণ দেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে। এই সময়ের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণের আহ্বান আসে। সে আহ্বানে তিনি সাড়া দিতে পারেন নি। কারণ, তাঁর আশঙ্কা ছিল এ কর্মভার তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর নতুন গবেষণা-গ্রন্থ ***The Nervous Mechanism in Plants*** লংম্যান্‌স্‌ কোম্পানি প্রকাশ করে। এ গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন জগদীশচন্দ্র। এই গ্রন্থের মূল বিষয় হল প্রাণিদেহের মতো উদ্ভিদদেহেও রস-সংবহনতন্ত্র ও স্নায়ুযন্ত্রের সন্ধান এবং পরীক্ষার সাহায্যে তার লক্ষণ আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য করা।

১৯২৬ থেকে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বছর একবার করে ইয়োরোপ যাত্রা করতে হয়েছিল জগদীশচন্দ্রকে। ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কমিটির সদস্য হিসেবে প্রতি বছর এই সংস্থার বার্ষিক অধিবেশনে তাঁকে যোগ দিতে হয়েছে। আর প্রতিবারই তাঁর চিন্তা-ভাবনা-আবিষ্কার সম্পর্কে জানবার আগ্রহ দেখা গেছে সকলের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান-সংস্থা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রতিবারই আয়োজন করেছে তাঁর বক্তৃতা-সভার। এ ছাড়াও তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, খ্যাতিমান বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা, জ্ঞানী-গুণীদের সঙ্গে পরিচয়-পরামর্শ হয়েছে প্রতিবার। ফলে, আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার, ব্যক্তিত্ব এবং সত্যানুসন্ধানের বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সে দেশে। তার প্রমাণ বেলজিয়ামে

রাজকীয় সম্মান লাভ, জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দন। এখানে তাঁর বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এবং লোরেনৎস্। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে যখন ইয়োরোপ যান তখন সাহিত্যিক রঁম্যা রলাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন জগদীশচন্দ্র এবং লেডি বসু। এ সময় লণ্ডনের ডেইলি এক্সপ্রেস পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রকে নিউটন এবং গ্যালিলিওর সঙ্গে তুলনা করা হয়। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হন। সেখানে অধ্যাপক মোলিশ তাঁকে উচ্ছ্বসিতভাবে অভিনন্দিত করেন। এ ছাড়া, মিউনিক, মিশর প্রভৃতি স্থানেও তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে আফ্রিকা থেকে আহ্বান আসে। ফিনল্যাণ্ড বিজ্ঞান-সমিতি তাঁকে সদস্যপদ দিয়ে সম্মানিত করে। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর শেষ ইয়োরোপ যাত্রা। এবার মাদাম কুরি, সাহিত্যের অধ্যাপক গিলবার্ট মারে প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে তাঁর।

॥ ৯ ॥

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে (১৯২৭, জানুয়ারি) মূল সভাপতি নির্বাচিত হন আচার্য জগদীশচন্দ্র। এ সময়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সেখানেও বক্তৃতা দেন। মাদ্রাজ এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও আমন্ত্রিত হন জগদীশচন্দ্র। এ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ভেষজশাস্ত্র বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সময়ে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। বাঙ্গালীর দুই দিকপাল মনীষী—একজন বিজ্ঞান-ঋষি, আর একজন ঋষিকল্প দার্শনিক—উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন নিজেদের স্বভাবগত প্রবণতার গুণে। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই-এর ছাত্র সমাজ এক সম্বর্ধনা দেয় আচার্য জগদীশচন্দ্রকে। তারপরে আহ্বান আসে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সেখানে সমাবর্তন উৎসবে তাঁকে ডি. এসসি. সম্মানে ভূষিত করা হয় (১৭ নভেম্বর, ১৯২৮)।

সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে বিজ্ঞান-মন্দিরে জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন হয় ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে। দেশের সর্বসাধারণের কাছ থেকে আসে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। তা ছাড়া, বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জানায় উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন। বিদেশের মনীষিগণ এবং নানা সংস্থা ও পত্রপত্রিকাও এ উপলক্ষে জ্ঞাপন করে আন্তরিক শুভেচ্ছা। এঁদের মধ্যে বার্নার্ড শ, রঁম্যা রলাঁও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ ছিলেন। তিনি জয়ন্তী উৎসবে যোগ দিতে পারেন নি। তিনি একটি কবিতায় তাঁর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। উৎসব-সভায় সে কবিতা পাঠ করেন ডক্টর কালিদাস নাগ।

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান জগদীশচন্দ্রকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেয়। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উৎসব আয়োজিত হয়। জগদীশচন্দ্র এ উৎসবের আহ্বায়ক এবং সভাপতি।

Golden Book of Tagore প্রকাশিত হয়। জগদীশচন্দ্র তার প্রধান উদ্যোক্তা। কিন্তু এই উৎসবের দিনে (২৭-এ ডিসেম্বর, ১৯৩১) তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি। কারণ তিনি তখন অসুস্থ অবস্থায় গিরিডিতে বাস করছেন।

শ্রীসয়াজীরাও গায়কোয়ার প্রাইজ এ্যাণ্ড অ্যানুইটি নামে একটি বৃত্তি ছিল। প্রতি বছর দেওয়া হত সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং শিল্পে বিশেষ প্রতিভাধর ব্যক্তিদের। এ বৃত্তির পরিমাণ এককালীন এক হাজার টাকা এবং প্রতি বছর বারোশ' টাকা করে। জগদীশচন্দ্রকে এই বৃত্তি দেওয়া হয় ২৮-এ মার্চ, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে। সে উপলক্ষে বরোদায় কয়েকটি ভাষণ দেন ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে।

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের সংযোগের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলার তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হক ছিলেন এ সভার সভাপতি।

শরীর ভেঙ্গে আসছে। কেবল বয়সের ভারে নয়। বয়সোচিত অসুস্থতা তো আছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হল বিজ্ঞান-মন্দিরের কাজ অব্যাহত রাখার দুশ্চিন্তা। কারণ ১৯৩২-৩৩ হিসাব বছরে সরকার থেকে অর্থসাহায্য হ্রাস করা হল। কিন্তু তা পরিপূরণের অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং তার সঙ্গে দুশ্চিন্তা তাঁকে খুবই দুর্বল করে ফেলল। কিছুদিন দার্জিলিঙ-এ বাস করে চলে আসেন গিরিডিতে। সঙ্গে সহধর্মিণী লেডি অবলা বসু।

গিরিডি, ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের ২রা নভেম্বর। আচার্য খুবই অসুস্থ। সে অবস্থাতেও বিজ্ঞান-মন্দিরের মুখপত্র *Transactions*-এর কাজ সারছেন গিরিডিতে বসে। আর কয়েক দিন পরে বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস। কি হবে না-হবে তা নিয়েও ভাবনা আছে।

২৩-এ নভেম্বর সকাল ৮টা। বিজ্ঞান-মন্দিরের তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে আচার্য-পত্নীর আলোচনা হচ্ছে মন্দির প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎযাপন এবং আচার্যের আশি বছর বয়স পূর্তি উৎসব নিয়ে। ঐ একই দিনে উভয় অনুষ্ঠান। তা নিয়ে কথাবার্তা চলছে। তাঁরা লক্ষ্য করেন নি আচার্যদেব তখন স্নানাগারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। মৃতদেহ কলকাতায় নিয়ে আসা হল। অসংখ্য মানুষের নীরব শোকযাত্রা মহানগরের রাজপথ পরিক্রমার পরে থেমে গেল। সমাধা হল শেষকৃত্য।

॥ ১০ ॥

'মুকুল', 'দাসী', 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, রসরচনা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত জগদীশচন্দ্রের বাংলা ভাষণসমূহ সংকলিত করে প্রকাশিত হয় 'অব্যক্ত' গ্রন্থ (১৯২১ খ্রীস্টাব্দ)। এ গ্রন্থে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-চেতনা, কাব্যবোধ এবং সাহিত্য

সংবেদনার পরিচয় মেলে ছত্রে ছত্রে। সর্বোপরি তাঁর স্বাদেশিকতার উদার মানসিকতার স্পষ্ট সন্ধান মেলে এ গ্রন্থে। 'অব্যক্ত' গ্রন্থ প্রকাশও তাই আমাদের কাছে বিজ্ঞানী, ঋষি, আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা বলে গণ্য। বিভিন্ন সময়ে তাঁর আবিষ্কৃত বিচিত্র বিজ্ঞান-সত্যের অনুভবকে তিনি প্রকাশ করেছেন সাহিত্যের ভাষায় পাকা সাহিত্যিকের কলমে। বিজ্ঞানের গভীর অন্বিষ্টা সাহিত্যের রসভাণ্ডারে শিল্পান্বিত করার কুশলী শিল্পী বলে তাঁকে অভিহিত করলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের এ সার্থক রাখীবন্ধনও তাই তাঁর আর এক বিশেষ আবিষ্কার বলে মনে হলে বিস্ময়ের কথা নয়।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রশস্তি

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ঃ জগদীশচন্দ্র যেসব অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন, তার যে-কোনটির জন্য বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।

জর্জ বার্নার্ড শ ঃ তাঁর কয়েকটি বই জগদীশচন্দ্রকে উপহার দিতে গিয়ে লেখেন, 'Least to the greatest Biologist'. লণ্ডনে রয়াল ইনস্টিটিউশনে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে মন্তব্য করেন, 'It certainly makes the world seem even more wonderful than it did before.'

রঁম্যা রলাঁ ঃ 'To the Revealer of a New World.' এটি তাঁর বিখ্যাত 'জঁ। ক্রিস্তফ' ফরাসী উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশে লেখা। এ ছাড়াও তিনি জগদীশচন্দ্রকে লেখেন, 'আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিরা আপনার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা যথার্থ উপলব্ধি করবেন। আমি অভিনন্দন জানাই সেই সত্যদ্রষ্টা তপস্বীকে, যিনি তাঁর কবি-দৃষ্টি দিয়ে বৃক্ষবল্কল ও পাষাণের অন্তরালে সংগোপিত প্রাণ-কণিকার সন্ধান পেয়েছেন। ......আমি আপনার মধ্যে দেখেছি এক অনাবিষ্কৃত মহাদেশের সকল অভিযাত্রীকে।'

মঁসিয়ে ল্যুসার ঃ 'সমস্তরকম প্রাণক্রিয়া যে একই ধরনের তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখে আমরা চমৎকৃত।'

স্যার ফ্রান্সিস ডারউইন ঃ 'They were all filled with admiration, not only for the brilliancy of the work but for the convincing character of the experiments that were demonstrated which conclusively proved his results and justified his theories. They all realised that Dr. Bose they found a most brilliant experimentalist of rare skill and ingenuity......the result of Prof. Bose's researches not merely affect Physiological Botany but are also of the deepest import in various other branches of science and much might be expected from the furtherance of his work.'

অধ্যাপক মোলিশ ঃ 'অধ্যাপক বসুর কাছে আজ ভিয়েনার বৈজ্ঞানিকগণ যে অনুপ্রেরণা পেল সে জন্যে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আমি আজ তাঁকে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এতদিন আমরা নেক্রোলজি বিষয়ে অর্থাৎ মৃতপ্রায় বা মৃত জিনিস নিয়েই গবেষণা করে এসেছি। আমরা এই প্রথম দেখলাম যে, শবব্যবচ্ছেদের টেবিল ছাড়াও জীবন ও তার রহস্য উদ্ভিদ তার আপন হাতে লিখে জানিয়ে দেয়। আজ আমাদের চোখের সামনে গাছের নিজের লেখা রহস্যগুলি যদি অধ্যাপক বসু

তাঁর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে আমাদের রাখতে দেন তা হলে সেই রেখাগুলি আমাদের মিউজিয়ামে বহুমূল্য স্মৃতির অবদানরূপে চিরদিন আমরা রক্ষা করব।'

অধ্যাপক মিলিকান: 'যাঁরা তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ প্রাণীবিদ্ বলে মনে করেন, তাঁদের জানা উচিত যে, তিনি পদার্থবিদ্ হয়ে আর একটি নতুন জ্ঞানের রাজ্য অধিকার করেছেন।'

ডক্টর জে. পিয়ার্স: 'May I attempt to express the grateful appreciation of the members of the department and of the President and other members of this University (Stanford University) of your kindness in coming to us and in delivering such an illuminating address......and to each you gave something which will more be forgotten, can there be any more satisfying reward for a teacher? And can there be any more satisfying reward for an investigator than the feeling that his researches have pushed our ignorance a little further back and brought human betterment a little nearer?'

'লণ্ডন ডেলি নিউজ' পত্রিকার সম্পাদক গার্ডনার: 'Prof. J. C. Bose is giving people shocks in Maida Vale. If you watch his astonishing experiments with plants and flowers you have to leave an old world behind and enter a new one......Prof. Bose makes you take the leap when he demonstrates that plants have a nervous system quite comparable with that of men and makes them write down their life history. So you step into yet another world....'

লর্ড র‍্যালে: 'বাস্তবতার আবহাওয়া সৃষ্টি করার জন্যে অন্তত একটি পরীক্ষাতে বিফল হওয়া উচিত ছিল।'

সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

খ্রীস্টাব্দ

১৮৫৮—	জন্ম ৩০-এ নভেম্বর, ময়মনসিংহ, অধুনা বাংলাদেশ।
১৮৭৫—	স্কলারশিপসহ প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স উত্তীর্ণ।
১৮৮০—	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৮৮০-'৮৪—	বিলাতে পড়াশুনা, ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকৃতি-বিজ্ঞানে ট্রাইপস এবং বি. এসসি. ডিগ্রী লাভ (লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়)।
১৮৮৫—	প্রেসিডেন্সি কলেজ-এ পদার্থবিজ্ঞানের অফিসিয়েটিং প্রফেসর হিসেবে যোগদান।
১৮৯৫—	মাইক্রোওয়েভ সৃষ্টিতে এবং বেতার-সঙ্কেত প্রেরণ-সংক্রান্ত পরীক্ষায় সাফল্য।
১৮৯৬—	লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এসসি. লাভ; ইউরোপে প্রথম বৈজ্ঞানিক সফর।
১৮৯৭—	২৯-এ জানুয়ারিতে রয়াল ইনস্টিটিউটে প্রথম বক্তৃতা।
১৯০০—	পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে প্যারিসের আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে যোগদান।
১৯০২—	প্রথম বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশ। গ্রন্থটির নাম 'Response in the Living and the Non-living; প্রকাশক: Longmans Green and Company, London.
১৯১১—	১৪ই এপ্রিল তারিখে Bengal Literary Conference-এ সভাপতিত্ব।
১৯১৪-১৫—	চতুর্থ বৈজ্ঞানিক সফর (বিশ্ব-ভ্রমণ)।
১৯১৭—	৩০-এ নভেম্বর, বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা।
১৯২০—	রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত এবং এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি. এসসি. লাভ।
১৯২১—	সাহিত্য-কৃতি 'অব্যক্ত' গ্রন্থের প্রকাশ।
১৯২৪—	'League of Nations Committee for Intellectual Co-operation'-এর সভ্য মনোনীত।
১৯২৭—	লাহোর-এ অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস-এ 'প্রেসিডেন্ট' রূপে মনোনীত।
১৯২৮—	এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক এল-এল. ডি. ডিগ্রী লাভ।
১৯৩৩—	কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি. এসসি. লাভ।
১৯৩৬—	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি. এসসি. লাভ।
১৯৩৭—	গিরিডিতে দেহাবসান।

জগদীশচন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহের তালিকা

1. Response in the Living and the Non-living.
2. Plant response as a means of physiological investigation.
3. Comparative Electro-physiology.
4. Researches in irritability of plants.
5. Physiology of photo-synthesis.
6. Nervous mechanism of plants.
7. Collected physical papers.
8. Plant Autographs and their revelations.
9. Motor mechanism of plants.
10. Growth and tropic movements of plants.